ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ

বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

নবপত্র প্রকাশন ◻ কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

সমর্পণ-লিপি

ঊনবিংশ ও বিংশশতকের সন্ধিক্ষণে
পূর্ববাংলার সিলেট জেলার
চরম পশ্চাৎপদ গ্রাম্য পরিবেশে
সকল কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে
জন্মগ্রহণ করে ও তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষাহীন হয়েও
নানা কুসংস্কার ও আচার থেকে
আশ্চর্য রকম মুক্ত

প্রয়াতা আমার মা,

প্রচুর আধুনিক শিক্ষার অধিকারী
অথচ গভীর ধর্মীয় ও শাস্ত্র আচার-নিষ্ঠ,
যুক্তিসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরীয় ভাবনায় অবিচল
অকাল-প্রয়াত আমার মধ্যম অগ্রজ

ব্রজবিহারী পুরকায়স্থ,

আর
নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক্যের পরিশীলিত পরিবেশে
এই কলকাতায় জন্মে ও আজন্ম-লালিত হয়ে
নিছক ভাবাবেগের থেকেই
ঈশ্বর-বিশ্বাসে একাগ্র
আমার একমাত্র কন্যা

শ্রীমতী সুচরিতা পুরকায়স্থ (বসু রায়)

আমার এই তিনজন
একান্ত আত্মীয়জনের বিচিত্র ঈশ্বর-ভাবনার
কথা মনে রেখে এই বইখানি রচনায় প্রেরণা পেয়েছি!

সূচীপত্র

প্রাসঙ্গিক পুস্তকাবলী

১। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর নিম্নলিখিত বইগুলির প্রাসঙ্গিক অধ্যয়ন বর্তমান লেখকের অভিমত গঠনে ব্যাপকভাবে প্রভাব সঞ্চার করেছে

(১) Lokayata (২) Indian Philosophy (৩) Indian Atheism (৪) What is Living and What is Dead in Indian Philosophy (৫) In Defence of Materialism in Ancient India.

2. সমাজ সাহিত্য দর্শন — হেমন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
3. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ — রাহুল সাংকৃত্যায়ন
4. Charavak Philosophy — D.R. Sastri
5. Human Essence — George Thomson
6. History of Indian Philosophy — S.N. Dasgupta
7. ধর্ম ও সমাজ — জর্জ টমসন
8. On Religion — Marx and Engels
9. ন্যায় দর্শন — মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বইপত্রের উল্লেখ পাদটীকাসমূহে যথাস্থানে সযত্নে করা হয়েছে।

পুস্তকটি সম্পর্কে ক'টি অভিমত

"......কোনো দর্শন প্রস্থানই মূলতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না এমন একটা অভিমত অপপ্রচারে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীপুরকায়স্থের বইখানি একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ করেছে।....শ্রীপুরকায়স্থ যেমন প্রাঞ্জল ভাষার এবং যুক্তির পারম্পর্য অক্ষুন্ন রেখে দুরূহ সংস্কৃত অংশের সহজ বাংলা, ব্যাখ্যার মাধ্যমে যুক্তির ধারা অব্যাহত রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।.....এ গ্রন্থখানি বাংলায় লেখার জন্য লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং ভাষা সাবলীল হওয়াতে বাংলায় লেখার ইষ্টসিদ্ধি ঘটেছে।

....বেদান্তদর্শনের নামে যে ধূমাকুলিত দর্শনের মোহজাল নানা স্বার্থ-সন্ধানী সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে নিত্য নিয়ত প্রসারলাভ করছে তাকে খণ্ডন করার যে কোনো প্রয়াসই অভিনন্দনীয়। এ গ্রন্থটি তেমনই একটি প্রয়াস, সেজন্য গ্রন্থকারের এ উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসার্হ।...."

মুখবন্ধের বদলে ক'টি কথা (এক)

প্রথমেই বলে নে'য়া ভালো, এই বইখানি কোনো পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে প্রকাশের প্রচেষ্টা আমি করছি না। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গবেষণাপত্র' সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত, আমি তার ব্যতিক্রম হিসেবেই আমার এই বইটি লিখেছি। কেন বইটি লেখার বা এ-ধরনের একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়নের ইচ্ছে আমার হয়েছিল সে কথা আমার মা, আমার দাদা ও আমার কন্যার বিচিত্র ঈশ্বরানুভূতি সম্পর্কিত 'সমর্পণ-লিপি'তে বলেছি। কিন্তু লিখতে চাইলেই তো হয় না, যে কোনো ব্যাপারে অধিকার অর্জনের প্রশ্ন থেকেই যায়। সে হিসেবে আমাকে ভাগ্যবান বলতে পারেন। বেশ চলে যাচ্ছিল দিন হেসে খেলে; অনুবাদ করেছি অনেক। নিজে নানা সময়ে যা লিখেছি তা সখের সাংবাদিকের লেখা, তার পরিমাণও কম নয়। কিন্তু তাকে মৌলিক রচনা বলি কোন মুখে?

ভারতে এবং ভারতের বাইরে ভারতীয় দর্শনের জীবন্ত ও মৃত উপাদানগুলোর কথা যিনি বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কলেজে পড়ার দিনে যাঁর লেখা, আর কী সে লেখা!, মন প্রাণকে নাড়িয়ে দিয়ে যেত। বলতে পারেন 'ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ' নিয়ে ভাবার প্রেরণা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ই আমার মনে প্রথম উপ্ত করেছেন। গুরুদাস কলেজে অধ্যাপনা করি; হঠাৎ করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপনার সুযোগ এলো 'সমাজতত্ত্ব' বিভাগে। অ-ডক্টর আমার কাজটি জুটেও গেল! কিন্তু সংকোচ কাটলো না। ভাবলাম একটা কিছু 'মৌলিক' গবেষণা করলে কেমন হয়। 'মারো তো গণ্ডার, লুটো তো ভাণ্ডার!' আমরা অনেকেই অল্পেতে খুশি হবার দামোদর শেঠ নই। একটা পেল্লাই বিষয় বেছে নিলাম ঃ Psychological and Sociological Roots of Religiosity. যুক্তিতে ঈশ্বর টেঁকেন না অথচ নানাভাবে ধর্মবোধ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে ভারতের সমাজ-মানসকে। চারদিকে কত 'আনন্দ' আর কত 'স্বামী', হিসেব রাখে কার সাধ্যি! বিরাট, বিশাল ব্যাপার; তাই শিক্ষকেরা কেউ গা করছিলেন না। নিজের থেকে একটা ছক এঁকে কাজ শুরু করে দিলাম।

প্লেখানভ-স্তালিন মাও-টমসন অনুবাদ করছি দিনরাত। ঘটনাচক্রে CAPITALISM AND AFTER নামক জর্জ টমসন সাহেবের সুখ্যাত বইখানির সন্ধান পেলাম। ঐ সূত্রেই একটা গ্রন্থপঞ্জী পেলাম বিলেত থেকে—আর তা নিয়ে হাজির হলাম শ্রদ্ধেয় হেমন্তদার কাছে। যে প্রাজ্ঞ মানুষটির বই পড়ে অনেকে 'ডক্টর' হয়েছেন, জীবনে তাঁর কিন্তু ডক্টর হওয়া হল না। সে এক মজার কথা, সেই চক্রী পণ্ডিতদের কীর্তি! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাছে আমি গেলাম সল্টলেকে। হাসলেন, বললেন—'ভাবনার কী আছে, ডাক্তার হতে চাও, হবে।' দিন দুয়েকের মধ্যে নিজের হাতে একটা ছক এঁকে আমাকে নিয়ে সোজা হাজির হলেন ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের একটা একতলা জীর্ণ বাড়িতে। হেমন্তদার সহযোগী প্রবীণ অধ্যাপক-প্রবর বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার সেই প্রথম দেখা! একান্তে কিছু কথা হ'ল দুজনে।

তারপর থেকে আমি পণ্ডিত মশায়ের ছাত্র! বই যদি নাও লেখা হত তবু সেই মহাজ্ঞানীর কাছে বসে যা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে "ধন্য, ধন্য আমি।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম পঞ্জিকাভুক্ত করা হল যথানিয়মে। মনে পড়ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক প্রয়াত নিরভিমান বিদ্বান ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়কে। আমার আলস্য এবং বহুপথে-ছুটে-বেড়ানোর মধ্যে কাজ রয়ে গেল অসমাপ্ত। নূতন নির্দেশক-এর সন্ধানে গেলাম ডঃ শংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ব্যস্ত লোক। বললেন, 'আপনার নোটগুলো রেখে যান—পড়ে দেখি ; কদিন পরে এলে আমার মতামত দেবো।' যথাসময়ে গেলাম ; হাসি দেখেই বুঝলাম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। মনে মনে হেমন্তদা আর পণ্ডিত মশাইকে নমস্কার করলাম। আমি অকপটে বলছি, আমার দুর্লভ সৌভাগ্য বলেই ডঃ শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার অসমাপ্ত নিবন্ধের নির্দেশক হিসেবে পেয়েছিলাম।

তারপরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আমাকে। এমন দুর্লভ সৌভাগ্য সবার হয় না! হেমন্তদা, পণ্ডিতমশাই, ডঃ চ্যাটার্জি ও ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে রোখে এই মহাসম্মিলনকে! গুরুদাস কলেজে তখন অধ্যাপনা করছি—বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রসন্ন-সৌজন্য ও তৎপরতার সঙ্গে অর্থসাহায্য করলেন ; অনায়াসে বহু বইপত্র সংগ্রহ করে দ্রুত প্রাথমিক কাজ শেষ করলাম। ইংরাজিতে লিখতে হবে—'থিসীস' কিনা! তৈরী হলাম। লেখা শেষ হল। এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলায়তনে লাগল দোলা—স্বার্থবাজদের দ্বারা বহু-নিন্দিত, নবনিযুক্ত 'কাউন্সিল' বাংলা ভাষায় 'বাংলা নয় এমন বিষয়েও গবেষণাপত্র উপস্থাপনের' প্রস্তাব নিলেন।

আমার সামনে তখন বিরাট সমস্যা। বিদেশিনী ইংরাজি ভাষার প্রতি মোহাচ্ছন্ন মহাশয়-মহাশয়ারা যাই বলুন, ইংরাজির চেয়ে বাংলা বোধ হয় একটু বেশী জানি ও সহজে বুঝি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'টি পরীক্ষায় ইংরাজিতে বেশ ভাল নম্বর লাভের সার্টিফিকেট আমার পকেটে থাকলেও এই বিশাল সংস্কৃত-উদ্ধৃতি-কণ্টকিত রচনাকে ইংরাজিতে তথা রোমান হরফে সাজানো রীতিমতো শ্রমসাধ্য মিস্ত্রীর কাজ, বিদ্বানের কাজ তা কস্মিনকালেও নয়। নির্দেশক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠাব্যাপী সম্মতিসূচক অনুমোদন নিয়ে তদানীন্তন শিক্ষাবিষয়ক সহ-উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের মুখোমুখি হলাম। অন্য কাজ ও কথা শেষ হলে বললাম—'শ্রমবিমুখ আমি নই, এই দেখুন পুরো লেখা তৈরী। বলেন তো ইংরাজিতে লিখবো—কিন্তু বাংলায় লিখলে লিখবো অনায়াসে।' মিস্ত্রীর কাজ আর বিদ্বানের কাজের কথাও বললাম—যেমন করে বলে বেপরোয়া ফাঁসির আসামী। ডঃ পোদ্দার একটু হাসলেন এবং কলম হাতে নিয়ে লিখে দিলেন আমার ইংরাজীতে লেখা দরখাস্তের কোণায় ঃ Allowed to write in Bengali according to the resolution of the University Council. দিনটির কথা আমি ভুলিনি ; ভুলবো না। 'ভাষার সমস্যা'র অভাবিতভাবে সমাধান হ'ল। কিন্তু তাতেও সমস্যা ঘুচে গেল না। বাংলা টাইপযন্ত্রের লিপি-কুশলতার

সীমাবদ্ধতা বাস্তবে পরখ করে শেষ পর্যন্ত আবার ডঃ পোদ্দারের শরণাপন্ন হলাম। বললাম—'বাংলায়ই যখন লিখতে দিলেন তখন মুদ্রিত আকারে যথাস্থানে উপস্থাপনের অনুমতিটুকুও দিন।' দিলেন ; ডঃ পোদ্দারের সেই হাসি আমার এখনও মনে আছে। অহেতুক অর্থব্যয়কে মাথা পেতে নিলাম সৌকর্য ও বিচারকদের পক্ষে পড়া সহজ হবে এ কথা ভেবে। এই সিদ্ধান্তকে অবিনয় মনে করলে অযথা পীড়িত হতাম। প্রতিশ্রুতি দিলাম ঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট এবং নিবন্ধ-বিচারের জন্য নির্ধারিত সমূহ শৃঙ্খলাবিধি মেনে চলবো।

বই কিছু ছাপা হল এবং যথাসময়ে জমাও পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সভা হল, সর্বসম্মতিতে আমার নিবন্ধটি 'পি.এইচ.ডি.' থিসীস হিসেবে বিচারের জন্য গৃহীত হল এবং আমার নির্দেশক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য বহু বিশিষ্ট বিচারকের তালিকা থেকে দু'জন বিশ্ববরেণ্য অধ্যাপককে বিচারক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করলেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও তা যাতে পুরোপুরি নিয়ম অনুসারে বিবেচিত ও পরীক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সযত্নে করলেন। একজন হলেন 'লোকায়ত দর্শন'-খ্যাত ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যজন হলেন অক্সফোর্ডের প্রাচ্যদর্শন ও তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। ওঁরা দু'জনে সম্মত হলেন এই নিবন্ধ বিচার করে দেখতে।

এদিকে ঘটনাচক্রে আমার এই নিবন্ধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বাংলায় লিখিত 'পি.এইচ.ডি' ডিগ্রীর জন্য গৃহীত প্রথম নিবন্ধ হয়ে দাঁড়াল। একেবারে প্রথম কি না তা নিশ্চয়ই বিচার-সাপেক্ষ ; কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর যে তা বাংলায় লিখিত প্রথম নিবন্ধ, গবেষণাপত্র—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভার পর উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার সাংবাদিকদের কাছে ব্যাপারটা খানিকটা গর্বভরেই প্রকাশ করলেন। গবেষকের নাম সঙ্গতভাবে অনুল্লেখিত থাকল। এই সূত্রে ১৯১৯ সালের ৩০শে নভেম্বর নানা পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হল। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রথম পৃষ্ঠায় দর্শনীয়ভাবে তা' বিশেষ খবর হিসেবে প্রকাশ করল। আমার নজরেও বিষয়টা পড়ল ; উৎসাহী বন্ধুজনেরা জানতে চাইলেন এই গবেষণা-পত্রটি কি আমার? আমি 'অশ্বত্থামা হত ইতি' ধরনের আরেক যুধিষ্ঠিরের অভিনয় করলাম। ভয় ছিল যদি তা বিচারে প্রত্যাখ্যাত হয়—হেমন্তদার গল্পটা তো আমার জানা! ক'দিন পরে অধ্যক্ষ বন্ধু ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী এলেন আমার তদানীন্তন কাঁকুলিয়া রোডের বাসায় এবং বললেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নাকি ৬ই ডিসেম্বর, '১৯, বিরাট এক সম্পাদকীয় লিখেছে বাংলায় লিখিত বাংলা নয় এমন বিষয়ে প্রথম গবেষণাপত্র সম্বন্ধে। আমরা নজরে পড়েনি, তাই তখনই পত্রিকাটি সংগ্রহ করে রুদ্ধশ্বাসে পড়লাম ; রাজকীয় গাম্ভীর্যে শুরু করে সরস কৌতুকে লেখা দীর্ঘ নিবন্ধ। প্রাসঙ্গিক কথাগুলো উদ্ধৃত করিঃ "সুখের কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি দর্শন শাস্ত্রের উপর বাংলা ভাষায় লিখিত একটি গবেষণাপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ ঘোষণাকালে ডঃ রমেন পোদ্দারের কণ্ঠে যদি একটু গর্বের অনুঝংকার রণিত

হইয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এ যাবৎ একমাত্র বাংলা বিষয়ের উপর গবেষণা করিয়াই বাংলায় থিসিস লিখিলে সরকারীভাবে তাহা বিচারের জন্য গৃহীত হইত। বিষয় অন্য কিছু হইলে ওই ইংরাজির শরণ না নিয়া গতি ছিল না। .... প্রথম যৌবনে না লিখিয়া প্রয়াত সুনীতিকুমার তাঁহার অদ্বিতীয় বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটি যদি দীপ্ত জীবনের পরিণত-পর্বে রচনা করিতেন তবে বোধ করি বাহনটা আর ইংরাজি হইত না।'' তারপর অনেক সরস উক্তি করে সম্পাদক লিখছেন ''যাহারা ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নানা বিষয়ে 'ডাক্তার' খেতাব পাইবেন, তাঁহারা গবেষণা মাতৃভাষায় করিয়াছেন জানিলে কেহ নিশ্চয়ই আতঙ্কিত বোধ করিবেন না, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশও নয়।'' তারপর তড়িঘড়ি ইংরাজি বর্জন সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়ে দীর্ঘ নিবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে।

আমি এর মধ্যে অধ্যক্ষ হয়ে নদীয়া জেলার মাঝদিয়ায় অবস্থিত সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। মনে তখন তোলপাড় তুফান—লেখা তো হ'ল, বিচারের জন্য তা গৃহীতও হ'ল, ঘটনাচক্রে অভাবিতপূর্ব প্রচারও হ'ল। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলে লজ্জাটাও হবে তীব্রতর!

তারপর থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কাটল দিবস শর্বরী! অবশেষে তার ইতিবাচক সমাপ্তি ঘটেছে। বিচারকেরা প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মন্তব্যকে মাথায় তুলে নিচ্ছি। আমার স্মৃতি ও সত্তাকে যে বিশ্ববিদ্যালয় জড়িয়ে রেখেছে তার প্রদত্ত উপাধিকে মাথায় তুলে নিলাম সমস্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বিষয়টি নিয়ে অধ্যয়ন আমি অব্যাহত রাখবো এবং ধর্মবিশ্বাসের সমাজতাত্ত্বিক ও মসস্তাত্ত্বিক উৎস নিয়ে আমার নূতন প্রবন্ধ লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটা 'ডাক্তারী' খেতাবের জন্য আমি হাজির হবো! বর্তমান নিবন্ধটিকেও আরো পরিমার্জিত ও সহজপাঠ্য করে অচিরকালের মধ্যেই বই হিসেবে নূতন করে প্রকাশ করবো। জ্ঞানের অন্বেষণে অকারণ অভিমানের পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে—আমার শুভানুধ্যায়ী সবার কাছে আমি এই অঙ্গীকার করছি।

ভবিষ্যতে যা হবার হবে। কিন্তু বর্তমানই আমাকে বিচলিত করছে সবচেয়ে বেশী। কেন যে আমার মতো ক্ষীণস্বাস্থ্য, শীর্ণদেহ ব্যক্তিটিকে কলকাতার আস্তানা থেকে এতদূরের একটি কর্মস্থলে সুদূর মাঝদিয়ায় কর্তারা পাঠালেন বুঝি না। মাঝদিয়া আমার জীবনে অম্লান হয়ে থাকবে; দীনতা ও অবহেলার মধ্য থেকে কলেজটি এখন হয়তো অগ্রগতির অভিযাত্রী হবার স্বপ্ন দেখছে—ব্যক্তি হিসেবে আমি এখানে অর্থহীন। তবু আজ মাতৃভাষার সম্মাননার এই দুর্লভ গৌরবকে যখন মাথায় করে নিচ্ছি তখন মাঝদিয়ার সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবেই তা করছি!

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দীর্ঘদিন কেটেছে অনধ্যয়নে, কারাবাসে, পরবাসে। তারপর শিলচরের গুরুচরণ কলেজের থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের আনুষ্ঠানিক পর্ব চুকিয়ে যাদবপুরের ঝিলরোডের নবকৃষ্ণপাল আদর্শ শিক্ষায়তনে, দমদমের বাগুইআটির চিত্তরঞ্জন কলোনির হিন্দুবিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা

এবং ত্রিপুরার বিলোনিয়া কলেজে, শিলচরের কাছাড় কলেজে, মেদিনীপুরের ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে, হুগলির মগরা-বাগাটির শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজে, কলকাতার গুরুদাস কলেজে ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপনার সময়ে ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মী বন্ধুদের কাছ থেকে নানাভাবে যে উৎসাহ পেয়েছি, আমার ছন্নছাড়া জীবনে তা চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে। জীবনের ধন কিছুই অবহেলার নয়। আজ বিনীতভাবে সহকর্মী বন্ধুসাথী প্রিয় ছাত্রছাত্রী সবাইকে স্মরণ করছি। নানাভাবে তাদের প্রশংসা, তাদের অতৃপ্তি আর ক্ষোভ সব আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে অধ্যয়নে, জিজ্ঞাসায় এবং অশান্ত-অন্বেষণে। গুরুদাস কলেজে আমার অগ্রজ বন্ধু-প্রতিম সৌম্যদর্শন অধ্যাপক মোহিনীকান্ত চক্রবর্তীর প্রেরণার কথা—শুধু আমি জানি, আর জানেন উনি ; স্বীকার করুন চাই না করুন।

অনেক কথাই বলা হ'ল। হ'ল না নিজের ঘরের কথা বলা। আমার জীবনে যা সবচেয়ে বড় পাওয়া তা' পেয়েছি আমার ঘরের কোণে। অবিরত যন্ত্রণা পেয়েও যার মুখের হাসি কোনোদিন মিলিয়ে যায়নি, পতন-অভ্যুদয়ে-বন্ধুর জীবনে যার স্পর্শ আমাকে অমিত চিত্তবল এনে দিয়েছে, আদর্শে অটল থেকে ঋজু হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে তাকে স্মরণ করবো কেন, বরণ করে নিচ্ছি নূতন করে! আমার জীবনসঙ্গিনী তিনি ; সব অর্থেই আমার সহধর্মিণী। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমিতকুমার ভট্টাচার্য ও সহকর্মীরা এবং ইতিহাস বিভাগের অনুজপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ রাখালচন্দ্র নাথ—এঁরা আমার সহধর্মী, সহমর্মী বন্ধুর মতো আমাকে যা দিয়েছেন তার কথা বলি এমন বাগ্‌বিভূতি আমার নেই। নীরবেই তাঁদের স্মরণ করছি।

*** শেষ কথার তো শেষ নেই। তবু বইখানি যদি পড়া যায়, যদি পড়ে ভালো লাগে তবেই ধন্য হই। ডায়লেকটিক্যাল যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনের সব সমস্যাকে দেখতে শিখেছি, যাঁদের চিরায়ত রচনা বারে বারে পথ দেখিয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা যাঁদের সহায়তায় গড়ে উঠেছে, আমার আত্মীয় ও তত্ত্বগত অধ্যয়নে পথপ্রদর্শক শ্রদ্ধেয় দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও বন্ধুসাথীরা তাঁদের সবাইকে স্মরণ করছি। বইখানি যদি বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিচারের প্রেরণা এনে দেয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

মুখবন্ধের বদলে ক'টি কথা (দুই)

সব ভালো তো শেষটুকু ভালো হলেই! অবশেষে 'নবপত্র প্রকাশন'-এর কর্ণধার বন্ধু প্রসূন বসুর সহৃদয় সহায়তাতেই বেশ খানিকটা কালক্ষেপ করে হলেও ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ, যাই বলুন প্রকাশিত হলো। আমি আনন্দিত এই ভেবে, গবেষণাধর্মী এ ধরনের অ-পাঠ্য বই যে ভাবে প্রথম প্রকাশে সমাদৃত হয়েছিল এবং যে দ্রুততায় তা নিঃশেষিত হয়েছিল, তা আমাকেই অবাক করে দিয়েছিল। নানাভাবে দেশে বিদেশে বন্ধুজন যেভাবে আমাকে প্রশংসায় আর সস্নেহ সমাদরে সংবর্ধিত করেছিলেন, যেভাবে মাঝেমধ্যেই একখানি বইয়ের জন্য ব্যগ্র চিঠিপত্র আজও পাই, তা রীতিমতো চমকে যাবার মতোই ব্যাপার। যাই হোক, অবশেষে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো ; এর মধ্যে এই আলোচ্য এলাকাকে ছুঁয়ে অন্য কিছু বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলাভাষায় বাংলা নয় এমন বিষয়ে প্রথম গবেষণাপত্র' বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্বীকৃতিলাভ, একেবারে যথার্থই প্রথম কিনা জানি না, বাড়তি আনন্দের কারণ হয়েছিল। খ্যাতি যদি বিড়ম্বনার হেতু না হয়, তবে তাতে ক্ষতি কী! প্রথম প্রকাশনার সময় যা বলেছি, তারপরে বিদ্যানগর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ১.৩.১৯ থেকে ৩০.৯.১৯, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন আধিকারিক হিসাবে ১.১০.১৯ থেকে ৩০.৪.১৯ এবং ১.৮.১৯ থেকে ৩১.৩.১৯ এবং মাঝখানে ৩০.৪.১৯ থেকে ৩১.৭.১৯ পর্যন্ত বারুইপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যথাসাধ্য সততার সঙ্গে অবিচলিতভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদন এবং বিদ্যাচর্চা করে চলেছি। ৩১.৩.১৯ অবসর গ্রহণ করে লেখাপড়া নিয়েই রয়েছি। এই মুহূর্তে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি কর্মজীবনে যুক্ত ছিলাম—তাদের সবার উদ্দেশ্যেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি—সমস্ত সহকর্মী, বন্ধুসাথী ও ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করছি।

এই অধ্যয়ন এবং গবেষণামূলক কাজকর্মের সূত্রে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও গভীরতর অধ্যয়নের জন্য যে আমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা, সুযোগ ও সমাদর লাভ করেছি, তাতে কৃতার্থই হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারতীয় দর্শনে ইহ-জাগতিকতা' নিয়ে আমন্ত্রণী বক্তৃতাদানের যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি তা' সম্ভব হয়েছে আমার দুই পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্বান ও হিতাকাঙ্ক্ষী অক্সফোর্ড-এর অকাল-প্রয়াত, বিশ্ববন্দিত অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুগুণালঙ্কৃত প্রাক্তন উপাচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অকৃপণ সহায়তায়। এই দুই মনস্বী বিদ্বানের সান্নিধ্য ও সহমর্মিতা আমার জীবনে স্মরণীয় সম্পদ হয়েই থাকবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নানা সুখ্যাত বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে অধ্যয়নে আমার বন্ধু ও বিশিষ্ট বিদ্বান উপাচার্য পবিত্র সরকারের সহায়তার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করছি। আমার শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতমশাই বিধুভূষণ ভট্টাচার্য গত হয়েছেন, অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল কর্মরত অবস্থায় একান্ত অকালেই চিরবিদায় নিয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিতে আমার বিনত শ্রদ্ধা

নিবেদন করছি। প্রবীণ বিদ্বান হেমন্তদা, অধ্যাপক হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর ভাস্বর, নির্জন জীবনে একান্তে নীরবে রয়েছেন প্রিয়জন সান্নিধ্যে। এই বইখানি তাঁকে পৌঁছিয়ে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো এবং আমার 'ঋষিঋণ' তাতে হয়তো খানিকটা মোচন করা সম্ভব হবে।

ব্যক্তিজীবনে দীর্ঘ কারাবাসের জন্য কোনো অছিলাতেই দীর্ঘায়িত কর্মজীবনের বিন্দুমাত্র প্রয়াস বা প্রশাসনিক আনুকূল্যের চেষ্টা না করে অবসর গ্রহণ করেছি। ফলে বহু বিদ্বান ও মননশীল মানুষের, বহু সহকর্মী ও সহমর্মী বন্ধুজনের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি, বিষণ্ণ বিচ্ছেদের ব্যবধান বেড়েছে। তবে এই তো জীবন! অবসর গ্রহণের পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও পুস্তকাদি রচনার কথা মাথায় রেখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে এবং আমার জন্মভূমি বাঙলাদেশে বিভিন্ন সুযোগে দীর্ঘকাল কাটিয়ে ফিরে ফিরে এসেছি কলকাতার নিজেদের বাড়ীতে। স্বজন ও প্রিয়জন সান্নিধ্যে যে স্নিগ্ধ পরিবেশে স্বতন্ত্র নির্জনতায় রয়েছি কোনো সৃজনশীল মানুষের এর চেয়ে প্রার্থিত আর কী থাকতে পারে! তাছাড়া আমার দুর্লভ সৌভাগ্যই বলতে হয়, সাম্প্রতিককালে বাঙলাদেশের অগ্রগণ্য বিদ্বান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর, অধ্যাপক মইনুল ইসলাম-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও তাঁদের সান্নিধ্য আমাকে নানাভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছে। বাঙলাদেশের জীবিত মহান বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম প্রবীণ অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ-এর মতো দৃঢ়চেতা মানুষ আমাকে বিঘ্নবিপদকে জয় করতে বারে বারে প্রেরণাদান করেছেন। 'সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা' হয়ে বিশ্বাসের শুচিতা ও 'আহ্‌মদ শরীফীয়' দৃঢ়তা নিয়েই বিদ্যাচর্চা করে যেতে চাইছি।

এই মানসিক প্রশান্তি নিয়েই 'ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ' পুনঃপ্রকাশে লিপ্ত হয়েছি। ভেবেছিলাম, আগাগোড়া সহজ-পাঠ্য করে পুরো বইটি ঢেলে সাজাবো। পরে ঠিক করলাম, প্রকাশনা যেভাবে বহুব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, তাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ও লেখালেখিতে বেশী মনঃসংযোগই শ্রেয়ঃতর হবে। তাই বর্তমান বইখানিকে আগাগোড়া সতর্ক পরিমার্জনে ও ভুলভ্রান্তি অপনোদনেই সীমাবদ্ধ থেকেছি এবং বহু সম্মানিতা অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল যে দু'একটি ত্রুটির কথা বলেছেন পত্রিকায় সমালোচনা বা একান্তে আলোচনায় তা-ই মাথায় রেখেছি এই প্রাথমিক পরিমার্জন-কালে। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মীমাংসা দর্শনের ঈশ্বর ও সর্বজ্ঞ খণ্ডনাত্মক অধ্যায়কে আরো নিবিড়তর করার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা' পুরোপুরি করে ওঠা সম্ভব হল না। অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল আমার নিবন্ধটি সম্পর্কে ও ভারতীয় চার্বাক-দর্শনের ভূতচৈতন্যবাদী অবস্থানের 'যান্ত্রিকতাবাদী সীমাবদ্ধতা' সম্পর্কে একটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য তাঁর পত্রে করেছিলেন। বিশ্বখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ ও বিদ্বান ওয়াল্টার রুবেন-এর বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বস্তুবিশ্বের বিকাশের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বাত্মক, ডায়লেকটিক্যাল সংঘাত ও অভিসংঘাত এবং নিয়ত সংশ্লেষণাত্মক অভিব্যক্তির তাৎপর্যবাহী অভিমতের আলোকে চার্বাকীয় জড়বাদ তথা সকল প্রাচীন বস্তুবাদ ও জড়বাদের বিচারের

সীমাবদ্ধতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বাসভবনে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে এই অভিমতটি আমাকে তিনি সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছিলেন। প্রাণঘাতী ক্যান্সারের জন্য 'ক্যামোথেরাপি' চিকিৎসাধীন সেই স্থিতধী বিদ্বান যন্ত্রণাজর্জর দেহে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ভূতচৈতন্যবাদের সীমাবদ্ধতা বিচার করার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আমি এই সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি এই বইয়ের সুধী সকল পাঠকের দৃষ্টি অকপটে আকর্ষণ করছি। এতে সন্দেহ নেই, এই দ্বন্দ্বাত্মক বিচারের অক্ষমতা থেকেই ঐতিহাসিক কারণ থেকে উপজাত পরিস্থিতিতে, ভারতে, গ্রীসে ও পৃথিবীব্যাপী তৎকালীন বস্তুবাদী, জড়বাদী ও ভূতচৈতন্যবাদী সকল ভাবনাকে প্রায় সমূহ পশ্চাদপসরণে ও ব্যর্থতাবরণে বাধ্য করেছিল। এই বক্তব্যটি যে গভীর ভাবে ভাবনীয় তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

আমার বইখানির সমালোচনার সূত্রে মাননীয়া অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য ভাষা ও প্রকাশগত যে কয়টি ত্রুটির কথা বলেছিলেন তা যথাসাধ্য দূর করতে চেষ্টা করেছি বর্তমান পরিমার্জিত প্রকাশনাকালে। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বহু চেষ্টাতে স্থাপন করা সম্ভব হল। কিন্তু তাঁর দু'টি মহামূল্য পরামর্শ সম্পর্কে আমার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিছি। পূর্ণতর গ্রন্থপঞ্জীর কাজ শেষ করা এখনও সম্ভব হল না, এটা প্রথম স্বীকৃতি। দ্বিতীয়তঃ সংক্ষিপ্ত একটি পরিচ্ছেদে 'ঋক-সংহিতা থেকে উপনিষদ পর্যন্ত অংশের নিরীশ্বরবাদের একটি ইতিহাস সংযোজিত করার' যে সুপরামর্শ শ্রীযুক্তা অধ্যাপিকা মহোদয়া দিয়েছেন তা' নিয়ে অধ্যয়ন এখনও শেষ হয়নি। তাই এই মহামূল্য উপদেশটি কার্যকর করা এই প্রকাশনাকালে সম্ভবপর হল না। বইখানির ইংরাজিতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্করণ রচনার কাজে আমি ব্যাপৃত। আগামী ঐ প্রস্তাবিত প্রকাশনায় শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্যের উপদেশ রূপায়িত করবো এবং পরবর্তী বাংলা সংস্করণে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি এই সশ্রদ্ধ প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছি।

বহু মাননীয় বিদ্বান ও গুণীজনের ভাবনা আমার এই পুস্তকে নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্ত সকল অভিমতের দায় ও দায়িত্ব পুরোপুরিই আমার। সকল সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও এই বই খানি বর্তমান আকারেই আগ্রহী পাঠক-পাঠিকার কাছে যথাযোগ্য আদৃত হলে কৃতার্থ হবো।

প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

অবতরণিকা

ভারতীয় দর্শনে জগৎকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ক বিভিন্ন যুক্তিবিচারের একটি নির্মোহ মূল্যায়নই বর্তমান রচনাটির লক্ষ্য। এই বিষয়টির বিপুলতা, জটিলতা ও বৈচিত্র্য এত বেশী যে এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাথমিক কৃতকার্যতা লাভ করাও সহজকর্ম নয়। তবু প্রাসঙ্গিক-বিচারটি আমাকে নানাভাবে আকর্ষণ করেছে। আমার মনে হয়েছে, ভাবতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের খণ্ডনাত্মক যুক্তিসমূহের ব্যাপক আলোচনা করলে তা একদিকে যেমন সমস্ত মুখ্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রাসঙ্গিক মৌল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি-প্রদান করতে আমাদেরকে বাধ্য করবে, তেমনই ঈশ্বর-সিদ্ধি শেষপর্যন্ত যুক্তিবিচারের দ্বারা অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরানুভূতির ব্যাপকতার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উৎস নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায়ও তা আমাদেরকে মনোযোগী ও উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। তাছাড়া ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার খণ্ডনাত্মক যুক্তিবিচারগুলোর নির্মোহ মূল্যায়ন ঐ বিচিত্র বিচার-ধারার নানা সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে তুলবে এবং সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারে তা সহায়ক হবে বলেও আমার মনে হয়েছে। তারই জন্য আলোচ্য রচনাটির অবতারণা।

আলোচ্য এই নিবন্ধের ভূমিকাংশটিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে অগ্রসর হতে চাই। প্রথমভাগে, নিরীশ্বরবাদী যুক্তিসমূহের প্রাচীনতা নিয়ে আমরা আলোচনা করে নিতে চাই এবং চার্বাক দর্শনের স্বভাববাদ ও ভূত-চৈতন্যবাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে চাই ; তার পাশাপাশি ঈশ্বব-সাধক ও ঈশ্বর-বাধক বিভিন্ন মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আমরা এখানে করতে চাই। দ্বিতীয়ভাগে, ঈশ্বর-সাধক যুক্তিসমূহের- মধ্যে আমরা একটা স্তরভেদ নির্দেশ করতে চাই ও এই প্রসঙ্গেই অদ্বৈত-বেদান্তের অবস্থানকে পরমার্থতঃ ঈশ্বরসাধক বলা যায় কি না তা বিচার করে দেখতে চাই। তৃতীয়ভাগে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনার গতিধারাটি নির্দেশ করতে চাই এবং ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর-সাধনের খণ্ডনাত্মক যুক্তিসমূহের মূল্যায়ন করে তার সীমাবদ্ধতাগুলো নির্দেশ করে তার সম্ভাব্য উত্তরণের ইঙ্গিতও আমাদের সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা উপস্থিত করতে চাই।

১

নিরীশ্বরবাদী লোকায়ত বস্তুবাদী চিন্তা ভারতে প্রাক্‌-বৈদিককাল থেকে প্রচলিত এরকম ধারণা করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঈশ্বর স্বীকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের নানা লোকায়ত চিন্তা বৈদিক কালে একটি বিশিষ্ট, চিহ্নিতরূপ লাভ করে। ভারতীয় দার্শনিক ভাবনার উন্মেষকালের 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদের একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় 'ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিবৃন্দ সৃষ্টির মূলরহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য' সমবেত হয়ে সৃষ্টির সম্ভাব্য নানা কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতপদার্থ বা পুরুষ এ জগৎসৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ কি না তা নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ১।৩ মন্ত্র)। অর্থাৎ 'সর্বভূতের পরিণাম সম্পাদক' **কাল**, 'বস্তুর স্ব স্ব শক্তি' **স্বভাব**, 'জীবের কর্মফল' **নিয়তি**, 'আকস্মিক কোনো ঘটনা' যদৃচ্ছা, 'ভূতপদার্থাদি' **ভূত**, অথবা 'বিজ্ঞানাত্মা' **পুরুষ**—এই জগতের কারণ হতে পারে বা পারেন কিনা। যদিও ঋষিকুল কাল, স্বভাব প্রভৃতি লোকসিদ্ধ চিন্তা জগতের কারণ নয়—এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন, তবু এই শ্রুতি-মন্ত্র থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাপারে কাল-কারণবাদ ও স্বভাববাদ ইত্যাদি লোকায়ত ধারণাসমূহ জগতের কারণ হিসাবে ঐ সময়ে অপ্রচলিত বা অপরিচিত ছিল না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদের এই অভিমত-সংঘাত ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। ভারতীয় দর্শনের নিরীশ্বরবাদী যুক্তিসমূহের মূল্যনিরূপণাত্মক আমাদের আলোচনাতেও একান্ত প্রত্যাশিত ও যুক্তিসঙ্গতভাবেই ঈশ্বরবাদের অনুকূল যুক্তিসমূহও আনুপূর্বিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

ভারতে নিরীশ্বরবাদ দার্শনিক একটি মনোভঙ্গী হিসাবে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবেই বিস্তৃত ছিল। ভারতের দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় নানা দৃষ্টিকোণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যক দার্শনিকই নিরীশ্বরবাদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তবে আলোচনাকালে এটাও দেখা যাবে যে ঐ দার্শনিক অবস্থানগত বিভিন্নতা পরবর্তীকালে ঈশ্বরবাদের প্রবল প্রতাপের যুগে তাঁদের দুর্বলতারই অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়ায়।[১] তা সত্ত্বেও

১। INDIAN ATHEISM; D. P. Chattopadhyay, P. 6,;

(

নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের উপস্থাপনে ও বিশ্লেষণে তাঁরা যে নৈয়ায়িক নিশ্চয়তা, সূক্ষ্ম বিচারমনস্কতা প্রদর্শন করেছেন তা তাঁদের সকল যুগগত পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে কোনো শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঐতিহ্যের পক্ষে অত্যন্ত গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় বলে গণ্য হবে।

লোকায়ত নিরীশ্বরবাদী চার্বাক সম্প্রদায় একটি দৃঢ় দার্শনিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে বিচার করে দেখেছেন। মুখ্যতঃ জগতের ও জীবনের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণই ছিল তাঁদের অভিলষিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি। অত্যন্ত প্রত্যাশিত কারণেই সেই আদিম জড়বাদী বিশ্লেষণে নানা সীমাবদ্ধতা রয়ে গিয়েছিল। ফলে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা যাকে 'সৃষ্টি-রহস্যের মূলতত্ত্ব' বলেছেন তার খণ্ডনের ক্ষেত্রে লোকায়ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা দ্বিধা ও মতবৈষম্যও দেখা দিয়েছিল। কালকারণবাদীদের একটা অংশের মধ্যে তা' স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদের বস্তুবাদী অবস্থানের একনিষ্ঠতা সম্পর্কে দ্বিধা সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিল না।

নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বর বা কোনো অলৌকিক পুরুষ-বিশেষকে জগতের উপাদান বা নিমিত্ত এরকম কোনো কারণ হিসেবেই গ্রহণ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। প্রধানতঃ জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে কোনো অলৌকিক পুরুষ বা অতীন্দ্রিয় সত্তার অবতারণার প্রয়োজনের কথা তারা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, বস্তু-জগতের দ্রব্যাদির সাংগঠনিক-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বের স্থান নেই। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি মৌল ভৌতিক পদার্থই জাগতিক সকল বস্তুর মৌল উপাদান। প্রতিটি বস্তুই বিভিন্ন ভৌতপদার্থের পরস্পর অভিঘাত ও সংযোগের নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্থূল বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই এই জগতের সমূহ বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্তা হিসাবে অলৌকিক একজন ঈশ্বরের অনুমিতির কোনোই প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি কার্যদ্রব্যের অর্থাৎ সৃষ্টি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ঐ বস্তুসমূহের উপাদানের প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে যদি জাগতিক বস্তুসমূহের উপাদান-কারণ বলি তবে প্রতিটি বস্তুর উপাদানের প্রত্যেক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দ্রব্যের উৎপাদক রূপে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু তা হয় না ; তাই পৃথিবী, জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট চারটি ভূতপদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই কার্যদ্রব্যের মৌল উপাদানরূপে সিদ্ধ হয় না। এই চারটি মৌল ভূতপদার্থকেই জাগতিক সমূহ কার্যদ্রব্যের একমাত্র সংগঠক

উপাদান-কারণরূপে স্বীকার করা যায়—তারজন্য একজন কল্পিত ঈশ্বর-স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি কার্যদ্রব্য যখন বিনষ্ট হয়ে পুনরায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তখনও তা কোনো অলৌকিক ঈশ্বরে পর্যবসিত হয় না। ঈশ্বরকে তাই জগতের উপাদান-কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে বস্তুবাদী চার্বাক সম্প্রদায় সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ বলেন, যদি মেনেই নেওয়া যায় যে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নন তবু জগতের কর্তা ও জড় উপাদান সমূহের সংগঠক নিমিত্তকারণ হিসেবে ঈশ্বর-স্বীকার না করলে চলে না। তাঁদের মতে, জাগতিক বস্তুর জড়, মৌলিক উপাদানের অপরোক্ষজ্ঞান ও নির্মাণ-কৌশলের কার্যকর অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ-ই কর্তা হতে পারেন না। তাই এই বিপুল জগতের সমূহ কার্যদ্রব্যের একজন প্রযত্নশীল কর্তা হিসেবে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ রূপে অবশ্যই মেনে নিতে হয়। প্রত্যাশিতভাবেই নিরীশ্বরবাদী লোকায়ত চার্বাক দার্শনিকগণকে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই ঈশ্বর-নিমিত্তকারণবাদ, তাঁদের মতো করে, খণ্ডন করতে হয়েছে। এভাবেই চার্বাকিদের স্বভাববাদ ও ভূতচৈতন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম কথা, কোনো কার্যবস্তু নির্মাণ করতে হলে, পূর্বেই ঐ কার্যের মৌল উপাদানের অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্মাণ-কৌশলের অভিজ্ঞতা থাকলেই একজনের পক্ষে কর্তা হওয়া সম্ভব—এই হল ঈশ্বরবাদীদের মূল কথা। কিন্তু সংকল্প, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্তঃকরণ ভিন্ন সম্ভব নয় এবং অন্তঃকরণ একমাত্র দেহধারীরই থাকে। সুতরাং জগতের কর্তা ও নিমিত্তকারণ হিসেবে বর্ণিত ঈশ্বরেরও জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জাগতিক বস্তুর মৌলিক উপাদান-কারণের অপরোক্ষ জ্ঞান ও বস্তু-নির্মাণ কৌশলের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যদি থেকে থাকে তবে জগৎসৃষ্টির পূর্বে তিনি শরীরধারী ছিলেন তা স্বীকার করতেই হয়। শরীর নেই অথচ সংকল্প, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এটা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ঈশ্বর-কারণবাদীরা ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি তাঁর সংকল্প-প্রসূত বলে দাবী করেন—'তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।২।৩) অর্থাৎ 'আমি বহু হব' ঈশ্বরের এ আদি-সঙ্কল্পের কথা এখানে বলা হয়েছে। জগতের স্রষ্টা বা নিমিত্তকারণ রূপে অভিহিত এই ঈশ্বরকে তাহলে একজন শরীরধারী

বলতেই হয়। শরীর একটি সাবয়ব দ্রব্য হওয়ার তার বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও স্বাভাবিক। তাছাড়া এ শরীরধারী ঈশ্বর শরীরধারী হওয়ার জন্যই পর্যায়ক্রমে অন্য ঈশ্বর-প্রজাত এটাও মেনে নিতে হয়। এই যুক্তি অনুসারে শেষ পর্যন্ত প্রথম ও নির্ভরযোগ্য কোনো অবস্থান এক্ষেত্রে নেই বলে যুক্তিটি ন্যায়ের পরিভাষায় 'অনবস্থা' দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাহলে এই যুক্তি দিয়ে কোনো 'আদিভূত, সচেতন, সনাতন' ঈশ্বরকেই পাওয়া যায় না।

তাছাড়া শরীরধারী বলে এই কল্পিত ঈশ্বর একান্তই একটি সসীম সত্তা একথা মেনে নিতে হয়। 'ঘটের কর্তা কুম্ভকার', 'বস্ত্রের কর্তা তন্তুবায়' প্রভৃতি সকলেই সসীম। তাহলে ঈশ্বরও কী তা-ই? তার অর্থ দাঁড়ায় ঈশ্বরও সসীম, এতএব তিনিও নশ্বর। যদি দাবী করা হয় ঈশ্বর স্বয়ম্ভু তাঁর কোনো উৎপাদন-কর্তা নেই তবে সমূহ জাগতিক বস্তু ঈশ্বরের মতো আপন আপন মহিমা ও প্রয়োজন অনুসারে 'স্বয়ম্ভু' হতে পারবে না কেন? তাই জগৎকর্তা রূপে একজন কল্পিত ঈশ্বর স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে যদি ঈশ্বরকে অসীম, অনন্ত ও সর্বজ্ঞ বলে দাবী করা হয় তবে ঈশ্বরের অসীমত্ব ও অপরিমেয়ত্ব নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দেয়। যদি ঈশ্বর অসীম, অনন্ত ও অপরিমেয় হন তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় ঐ কল্পিত ঈশ্বর তাঁর অসীমত্ব, অনন্তত্ব ও অপরিমেয়ত্ব সম্পর্কে অবহিত কিনা। যদি তিনি তাঁর এ আরোপিত গুণগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ হন তবে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা চলে না; আর যদি তিনি তা জানেন বলে দাবী করা হয় তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কী সেই অনন্তত্ব ও অসীমত্ব যাকে জানা যায় এবং কী সেই অপরিমেয়ত্ব যা একটি পরিজ্ঞাত পরিধিতে আবদ্ধ? আর আরোপিত 'সর্বজ্ঞত্ব' একটি অহেতুক কষ্ট-কল্পনা মাত্র কারণ বাস্তবে তা অসম্ভব।

নিরীশ্বরবাদীদের পরবর্তী জিজ্ঞাস্য হল, সৃষ্টির উপাদান-সমূহ ঈশ্বরের নিজেরই সৃষ্টি কি না? না, এই উপকরণসমূহ জগৎসৃষ্টির পূর্ব থেকেই নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান ছিল? যদি বলা হয় যে ঈশ্বরই জগতের মৌল উপাদান-সমূহের স্রষ্টা কেননা, তিনি সর্বকর্তা, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ঈশ্বর কিভাবে সেই উপাদানাদি সৃষ্টি করেছেন। যদি বলা হয় ঈশ্বরের মধ্যেই এ উপাদানসমূহ অন্তর্লীন হয়ে নিহিত ছিল, তবে মানতেই হবে ঈশ্বর স্বীয় প্রচেষ্টায় ঐ উপাদানগুলোকে অভিব্যক্ত করেছেন মাত্র তিনি তার প্রকৃত স্রষ্টা নন। এতে ঈশ্বরের 'সর্বকর্তৃত্ব' সিদ্ধ হয় না। অন্যথায় ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা যদি স্বীকার করে

নিতে হয় তাতে করে ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বময়ত্ব বিঘ্নিত হয়। আবার ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি একটি বিশেষ কার্য বলে সেই কার্যের নির্দিষ্ট স্থান ও কালের প্রশ্নও ওঠে। প্রশ্ন দাঁড়ায় ঈশ্বর ঠিক ঐ নির্দিষ্ট স্থান বা কালকে সৃষ্টির মুহূর্ত বলে মেনে নিলেন কেন? কী অভাব-বোধ তাঁকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করল? এসব প্রশ্নের উত্তরে যদি ঈশ্বরকে স্থান ও কালের অতীত একটি সত্তা বলে গ্রহণ করতে হয় ঈশ্বরবাদীদের পরামর্শ মতো, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া। আবার স্থান ও কালকে যদি স্বভাবসিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয় তবে সমূহ জাগতিক উপাদানসহ সমগ্র জগৎসংসারকে ভৌতপদার্থসমূহের স্বাভাবিক প্রকাশ বলে মেনে নিতে কোনো অসুবিধে থাকে না; ঈশ্বর তাহলে একান্ত নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ান।

এই সমস্ত অসুবিধের সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরকে নিরবয়ব বলে দাবী করেন। কিন্তু নিরবয়ব ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির সংকল্প ও প্রযত্ন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলে অসম্ভব তা এরমাঝেই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই দেখা যায়, জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব চার্বাক দর্শনে যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বস্তুবাদী, ভূতচৈতন্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কালকে জগতের কারণ হিসেবে স্বীকার করেন এমন একটি অভিমতও দেখা যায়। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের' ১।৩ মন্ত্রে এই কালকারণবাদীদের কথাই বলা হয়েছে।

একটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম এবং তার পরবর্তী ক্রমবিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্যে যে পৌর্বাপর্যভাব এবং সামগ্রিকভাবে জগতের যে ক্রমিক অবস্থাগত নিয়ত পরিবর্তন তা-ই 'কাল' নামে প্রসিদ্ধ; বস্তুর ক্রমিক অবস্থান্তরের যা সংগঠক তা-ই এখানে 'কাল' নামে অভিহিত। সুতরাং বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত হয়ে রয়েছে বলে কাল-কারণবাদীদের মতে 'কাল'-কেই জগতের আধার ও মূল কারণ বলা সমীচীন। কাল ছাড়া জগতের অতিরিক্ত কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করার কোনো আবশ্যকতা এঁদের মতে নেই। 'কালকারণবাদী'-দের এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত।

কালকারণবাদকে সমর্থন করে চার্বাকিগণ বলেন, কাল অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা। এই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ক্ষণের নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই কারণ অতিসূক্ষ্ম কালের যদি কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে এই 'বৈশিষ্ট্য' কালের স্বভাবজ না আগন্তুক এই প্রশ্নের সমাধান

প্রয়োজন ; আর যদি তা স্বভাবজই হয় তবে কাল ও কালের বৈশিষ্ট্য কালের অতিরিক্ত বলে কালগত ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণ কখনও কাল নিজে হতে পারে না। সুতরাং ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণ কাল নিজে নয় বলে কালের পক্ষে জগৎসৃষ্টি সম্ভব নয় ; কেননা কাল যদি বৈশিষ্ট্যশূন্য হয় তা হলে ক্ষণধারার একটি বিশেষক্ষণে কোনো বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাহলে নিরবধি কালকেই সমস্ত বস্তুর জনক বলতে হয় কিন্তু সমগ্র ক্ষণধারা সমূহ বস্তুর জনক হতে পারে না, নির্দিষ্টক্ষণেই নির্দিষ্ট বস্তুর জন্ম হয়। অন্যদিকে কালও কালের বৈশিষ্ট্য যদি অভিন্ন হয় তাহলে এই বৈশিষ্ট্য স্বীকারের কোনো সার্থকতাই থাকে না।

জগতের মৌল উপাদান হিসাবে যে চতুর্বিধ ভৌতিক পদার্থের কথা বলা হয়েছে তা যদি 'কাল' থেকে উৎপন্ন বলে স্বীকার করা হয় তবে ঐ পদার্থ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈলক্ষণ্য সাধন করা অসম্ভব। সুতরাং যদি এই চতুর্বিধ ভূতপদার্থের অস্তিত্বকে চিরন্তন বলে স্বীকার করে নিয়ে কালকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অন্যতম হেতুরূপে স্বীকার করা হয় তবে 'কাল' জাগতিক বস্তুর মৌলিক উপাদান চতুর্বিধ ভূতপদার্থের উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রক হবে না। তাই চতুর্বিধ ভৌতপদার্থ নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় নানাবিধ কার্যদ্রব্যে পরিণত হয় এবং 'কাল' শুধু তার সহায়ক মাত্র এ অভিমতকেই স্বভাববাদীরা সমীচীন বলে মনে করেন। অচেতন মৌলিক উপাদান সমূহের পরিণাম দেহ প্রভৃতিতে বিশেষ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ফলেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটে একথা স্বীকার করা হলে ভূতচৈতন্যবাদীদের সিদ্ধান্ত কাল-কারণবাদীদের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য হয়। ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাকিগণের মতে 'কাল' স্বভাবের সাহায্যেই জগতের কারণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। স্বভাব-নিরপেক্ষভাবে কালকে জগতের একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করা চলে না, তাই কাল-কারণবাদ ও স্বভাববাদের সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভূতচৈতন্যবাদই ভারতীয় দর্শনে জগৎসৃষ্টির প্রাচীনতম বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে।

ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাক সম্প্রদায় এই জগৎ চারটি মৌল ভূতপদার্থের দ্বারা গঠিত বলে মনে করেন। জাগতিক বস্তুর স্বভাব অনুসারে এ সংগঠন প্রক্রিয়ায় বস্তুসমূহের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়—তারজন্য তথাকথিত চেতনপুরুষ বা ঈশ্বরের অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই এই হল ভূতচৈতন্যবাদের মূল প্রতিপাদ্য। এই মতবাদ অনুসারে

ভৌতপদার্থের বিন্যাসের তারতম্যের ফলেই জড়বস্তুতে চেতনার সঞ্চার হয়; জড়ত্ব ও চেতনাকে পদার্থের দু'টি অসম্পৃক্ত দিক হিসাবে চিহ্নিত করা কষ্টকল্পনামাত্র; কারণ ভূতচৈতন্যবাদীদের মতে চেতনা আসলে জড়পদার্থেরই পরিণত প্রকাশ; জড়-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চৈতন্য উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। ভূতচৈতন্যবাদীদের মতে জড়ই মুখ্য এবং চেতনা হচ্ছে জড়েরই পরিণাম—এই সিদ্ধান্তের জন্য ভূতচৈতন্যবাদী দার্শনিকগণ প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী দর্শনের প্রথম প্রতিনিধিবৃন্দ।

উপাদান থেকেই সমূহ গুণের উদ্ভব হয়; রক্তবর্ণ তন্তু দিয়ে রক্তাম্বরই প্রস্তুত হয়, শ্বেতবর্ণ তন্তু দিয়ে হয় শ্বেতবস্ত্র। তাই দেহাদির উপাদান ভৌত যে পদার্থসমূহ তা জড় হলেও দেহে যে চৈতন্যের বিকাশ ঘটে তা উপাদান সন্নিবেশেরই সম্মিলিত, নবতর জটিল প্রকাশমাত্র। প্রদত্ত দৃষ্টান্ত ও এই ভূতচৈতন্যবাদী সিদ্ধান্তের দার্শনিক তাৎপর্য বিরাট, একটু লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভূতচৈতন্যবাদীরা বলেন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন উপাদান-কারণে অবিদ্যমান গুণ বিভিন্ন জড় উপাদানসন্নিবেশে গঠিত কার্যদ্রব্যে দৃষ্ট হয়, এমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ নানা দৃষ্টান্ত রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা বলেছেন, মদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও বস্তুসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে মাদকতা শক্তি অনুভূত হয় না; অথচ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রণ ও মিলনের ফলে ঐসব উপাদানের সম্মিলিত পরিণাম হিসাবে মদের মধ্যে মাদকতা শক্তি সৃষ্টি হয়। যেমন, বৃক্ষবিশেষের নির্যাস 'কিণ্বের' মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মাদকতা সৃষ্টির শক্তি নেই, কিন্তু অন্যান্য নানাদ্রব্যের সহযোগে একটা প্রক্রিয়ায় তাতে সুরার মাদকতা সৃষ্টির শক্তি দেখা দেয়।[২] ভূতচৈতন্যবাদীদের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত সমূহে তাদের যুগের চিন্তা ও বিজ্ঞানচেতনার সীমাবদ্ধতার ছাপ সঙ্গতভাবেই পড়েছে। আধুনিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ভৌতবিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ অঙ্গন থেকে এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব; কিন্তু সেই প্রাচীনকালে এই পরম আস্থাশীল প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি গভীর বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠারই প্রকাশ দেখা যায়। তাই ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাকদের মতে জড় উপাদানের নির্মিত দেহে চৈতন্যের সঞ্চার আদৌ যুক্তি-বিরুদ্ধ নয় বরং প্রত্যক্ষসম্মত। এই মৌল সিদ্ধান্ত থেকে চার্বাক দর্শন দেহাতিরিক্ত আত্মা ও জগদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেন।

২। তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারিতত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকার পরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যঃ মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে। (**সর্বদর্শনসংগ্রহঃ চার্বাক দর্শন**; পৃঃ ২; নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে; ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ)।

চার্বাক দার্শনিকদের এই তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশিত হয়। একটি হচ্ছে ভারতীয় দর্শনে সুপরিচিত অন্যতম কার্য-কারণতত্ত্ব 'সৎকার্যবাদ' খণ্ডন এবং দ্বিতীয়টি হ'ল জ্ঞানের একমাত্র উৎস বা প্রমাণ হিসেবে 'প্রত্যক্ষ'-কে গ্রহণ।

দ্রব্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদানের মধ্যে কার্যের সূক্ষ্ম, অনভিব্যক্ত অস্তিত্ব না থাকলে একটি বিশেষ পদার্থ বিশেষ বস্তুর উপাদান হিসেবে অন্বিষ্ট হত না। অসৎকার্যবাদীরা এই অভিমত সমর্থন করেন না। সৎকার্যবাদীরা বলেন, কার্য যদি বিশেষ পদার্থে সূক্ষ্মভাবে না থাকত, তবে অ-সৎকার্যবাদীদের মতের অনুসরণ করে যে কোনো পদার্থ থেকে যে কোনো দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে বলে আশা করা চলত। তাই উৎপত্তির পূর্বে কার্যদ্রব্যটি তার উপাদান-কারণে সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ অনভিব্যক্তরূপে অবস্থান করে একথা মানতেই হয়; সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় তা স্থূলরূপে প্রকটিত হয়। অ-সৎকার্যবাদের প্রতিবাদে এই হল সৎ-কার্যবাদীদের বক্তব্য।[৩] তাই বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদীরা বলেন, জড়ের মধ্যে চৈতন্যের উদয় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া-প্রজাত—এই অভিমত যুক্তিসিদ্ধ নয়। সূক্ষ্মরূপে অনভিব্যক্ত থাকলেই তার প্রকাশ হয় বা হতে পারে। চার্বাকেরাই বা কেন মদ তৈরী করার জন্য তাহলে 'কিণ্ব' খুঁজে বেড়াতেন? তাই, জড়বস্তু থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়—এ চার্বাক-সম্মত সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদীদের কাছে অগ্রাহ্য। ''বাইরের পরিবেশ থেকে যত আঘাত দেওয়া হোক না কেন, শুধুমাত্র বস্তু থেকে জীবনকে বলপূর্বক সৃষ্টি করা যায় না।''[৪] কিন্তু দেখা গেছে ভাববাদী দার্শনিকশ্রেষ্ঠও স্বীকার করেন, বিশ্বের অভ্যন্তরে সর্বত্র বিরোধী-সমাগম রয়েছে; এ তার প্রচণ্ড এক ক্ষমতা, যে ক্ষমতায় অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।[৫] আধুনিক ভৌত-বিজ্ঞানের বহু দৃষ্টান্তের কথা এখানে সহজেই মনে পড়বে।

৩। অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্যশক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম।। **(সাংখ্যকারিকা-৯)**

৪। Dr. S. Radhakrishnan; Indian Philosophy.

৫। **বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ । রাহুল সাংকৃত্যায়ন**; পৃঃ ১১৯

ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাকগণ বলেন, প্রতিবাদীদের সমস্ত যুক্তিই অনুমান-নির্ভর এবং অনুমান সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সন্দেহ নেই, কার্যের পরবর্তী অবস্থা ও গুণাগুণ বিচার করেই উৎপাদনের পূর্বে উপাদানের মধ্যে কার্যের সূক্ষ্মসত্তা অনুমিত হয়। কিন্তু যে অনুমান-প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে এই যুক্তিজাল বিস্তার করা হল—তা নিজেই যে অ-সিদ্ধ। তাই চৈতন্য-বাদীদের এই প্রয়াসকে চার্বাকবাদীরা তুলনা করেছেন "পাষাণে বীজবপনের নিষ্ফল প্রয়াস" হিসেবে।

যে কোনো অনুমানের ক্ষেত্রেই অব্যভিচারী একটি সাধারণ সূত্রের জ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানই সর্বপ্রধান ভিত্তি; কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় দৃঢ় ব্যাপ্তি-নির্ধারণ অসম্ভব। 'ধূম-বহ্নির' প্রসিদ্ধ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের কথাই ধরা যাক। ধূম থেকে বহ্নির দৃষ্টান্ত দেখে দেখে ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্য যে দৃঢ় ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতীতি প্রয়োজন তা নিসংশয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। সর্বসংশয় ও ব্যভিচার নিরসন করতে হলে 'যত্র ধূম তত্র বহ্নি' এ রকম একটা প্রতীতি সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকালের সকল দৃষ্টান্তেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হওয়া চাই—কিন্তু এরকম জ্ঞান কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্য একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা চাই-ই চাই। কিন্তু দেহধারী কোনো মানুষের পক্ষে সর্বকালের সকল দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ দূরে থাক বর্তমান কালের সমূহ দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। তা সম্ভব হয় না বলে নিঃসংশয় শংকামোচনও হয় না। তাই দৃঢ় ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব নয় এবং তারই জন্য অনুমান-প্রমাণ সিদ্ধ নয়—এই হল চার্বাক সম্প্রদায়ের মত।

মনে হয় এখানে চরম এ সিদ্ধান্তে উপনীত চার্বাকগণ যেন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কার্যতঃ নিঃসঙ্গ। এমন কি, নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর-বিরোধী বৌদ্ধরাও মনে হয় এখানে তাঁদের বিরুদ্ধ-পক্ষে।[৬] অনেকেই মনে করেন বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত হল, কার্যকারণভাব বা স্বভাব হেতুর সাহায্যে দৃঢ় ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে না একথা বলা অন্যায্য। তাহলে

৬। কার্যকারণভাবাদ্ধা স্বভাবাদ্ধা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ।।
(**ধর্মকীর্তি**; **প্রমাণবার্তিক**; স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ; ৩১)

জ্ঞানের রথচক্রই যে অচল হয়ে পড়বে। এটা অহেতুক বাড়াবাড়ি ; কিন্তু প্রশ্নটি এত সহজ সরল নয়।[৭]

চার্বাক দার্শনিকেরা তবু অনড়, অবিচলিত। তাঁরা বলেন, যত সহচার-দর্শনই হোক না কেন, শুধু অবাধিত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে অনুরূপ যুক্তির সাহায্যে 'বহ্নি-ধূমের' কার্যকারণভাব সিদ্ধ হবে না। এখানে দৃঢ় ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রত্যাশা মূঢ়তা । তাছাড়া, স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে যাকে একটা বিশেষ বৃক্ষ বলে জানি তারজন্য অহেতুক প্রতিপদে একটা অনুমান করতে যাওয়ার কী দরকার? এ রকম অহেতুক অনুমান-বিলাস অলস-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের পক্ষেই শোভা পায়।

চার্বাক দার্শনিকগণ তাই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত কোনো প্রমাণ স্বীকার করেন না এবং অনুমানের সাহায্যে যে ভাবে ভূতচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত চৈতন্যময় সত্তা ও জগৎস্রষ্টা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চার্বাক সম্প্রদায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ স্বভাব অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয় ; বরং তথাকথিত সকল অনুমানই প্রত্যক্ষ-নির্ভর। অগ্নির উষ্ণতা ও জলের শীতলতা ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে, চার্বাকগণ 'খদ্যোত' অর্থাৎ জোনাকির কথা বলেছেন। জোনাকির শরীরের এক অংশ প্রকাশাত্মক, অন্য অংশ অ-প্রকাশাত্মক। কেন এটা হল, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলা নিরর্থক, কেন না তা হল জোনাকির শরীরের স্বভাব। আমাদের

৭। কার্যকাবণভাব সম্পর্কে ধর্মকীর্তির অভিমত চার্বাক অভিমতের বিরোধী এ ধারণা মূলতঃ 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'-কার মাধবাচার্যের বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধীয় বিচার পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মাধবাচার্য বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান-গুলোকে নিজের অভিলষিত আরোহীক্রম (order of ascendency) অনুসারে সাজিয়েছেন। তিনি চার্বাকদর্শন দিয়ে আলোচনা শুরু করে দ্বিতীয় পর্যায়ে বৌদ্ধদর্শনে পৌঁছেছেন। বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা তিনি যেভাবে আরম্ভ করেছেন তাতে মনে হয়, চার্বাকগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত অনুমান-প্রামাণ্য এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যেন আচার্য ধর্মকীর্তির এই বিখ্যাত কারিকাটি ('কার্যকারণভাবাদ্বা' ইত্যাদি) রচিত হয়েছে। কিন্তু সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় ব্যাপারটি আসলে আদৌ তা নয়। আচার্য ধর্মকীর্তির এই কারিকাটি মূলতঃ ন্যায়বৈশেষিকদের ব্যাপ্তিনিশ্চয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দুর্বলতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে বলে মনে করাই সঙ্গত। 'হেতু ও সাধ্যে সহচার দর্শন এবং ব্যভিচারের অদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি'—এই ন্যায়-বৈশেষিক অভিমত মেনে নিলে চার্বাকগণের যুক্তি অখণ্ডনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মকীর্তি একথাই বলতে চেয়েছেন এবং এই জন্যই ব্যাপ্তিগ্রহ নির্ণয়ের জন্য কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ অথবা স্বভাবহেতু নিরূপণের ওপর জোর দিয়েছেন।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় তাকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

বস্তুর স্বভাব অনুসারে মানুষকে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বস্তুকে ব্যবহার করতে হয়। মানবিক প্রয়োজনে বস্তু-স্বভাব পরিবর্তিত হয় না, বস্তু-স্বভাব অনুসরণ করেই মানবিক ব্যবহারকে পরিচালিত করতে হয়। চার্বাক সম্প্রদায় বলন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য কেবল বস্তুর স্বভাবই যথেষ্ট নয়, তার জন্য সহকারী কারণেরও প্রয়োজন হয় বা হতে পারে। চক্ষু রূপ-বিশিষ্ট বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে, এটা চক্ষুর স্বভাব; কিন্তু আলোক বা জ্যোতি ঐ বস্তুর সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ না ঘটালে চক্ষুর পক্ষে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। এতে প্রমাণিত হয় না যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংগঠিত না হলেও ঐ সময়ে চক্ষুর দর্শনসামর্থ্য নেই। ইন্দ্রিয় অবিকৃত থাকলে ও সহকারী কারণের অনুপস্থিতির জন্য অনেক সময় দর্শন-ক্রিয়া সম্ভব না-ও হতে পারে; তাতে করে চক্ষুর স্বাভাবিক দর্শন-শক্তির জন্য অন্য কোনো জ্যোতিষ্মান পদার্থের অপেক্ষা থাকে না। মানুষের মৃত্যু হলে দেহের বিকৃতি ঘটে তাই দেহ চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং মৃতদেহে চৈতন্য নেই বলে দেহের অতিরিক্ত চৈতন্য স্বীকার করতে হবে কেন? আত্মাকে চৈতন্যবাদীরা 'নিত্য' 'সর্বব্যাপক' বলেন; তাহলে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকা উচিত। কিন্তু মৃতদেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি থাকে না। দেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব

আবার আচার্য ধর্মকীর্তির এ কারিকাটি থেকে এটাই ধর্মকীর্তির প্রকৃত ও অভিলষিত অভিমত এরকম ভ্রান্ত ধারণারও অবকাশ রয়েছে। ধর্মকীর্তি মূলতঃ বিজ্ঞানবাদী; তাই এ কারিকাটি আসলে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৌত্রান্ত্রিক বৌদ্ধ মতানুসারে রচিত বলেই মনে হয়। "প্রমাণবার্তিক"—এর অবশিষ্টাংশের আলোচনা করলে এবং ধর্মকীর্তির "সম্বন্ধ-পরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে এ অভিমতই সঙ্গত বোধ হয়। প্রজ্ঞাকর গুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ "বার্তিকালংকার" সযত্নে অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মকীর্তি কোনো সম্বন্ধেরই পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করেন না। কার্য-কারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও এই হল তাঁর অভিমত। এরই জন্য ধর্মকীর্তি অনুমানকে 'ভ্রান্তি' বলেছেন যদিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিকভাবে এ ভ্রান্তি জ্ঞানেরও প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেছেন ('অপিভ্রান্তেঃ প্রমাণতা' ইত্যাদি)।

প্রসঙ্গতঃ একথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুর্ধর্ষ অদ্বৈত-তার্কিক শ্রীহর্ষ তার "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য" গ্রন্থে একটি গভীর কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। শ্রীহর্ষ স্পষ্টভাবেই বলেছেন,—চার্বাকপন্থী, মাধ্যমিকপন্থী বৌদ্ধ এবং অদ্বৈতবাদী দার্শনিকবৃন্দ এ বিষয়ে একমত যে ন্যায়শাস্ত্রের কোনো প্রামাণ্যই নেই। (খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য; বিদ্যাসাগরী টীকাসহ; চৌখাম্বা প্রকাশন, বারাণসী, পৃঃ ৫০)।

স্বীকার করে চৈতন্যের অভিব্যক্তির জন্য দেহাদি এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ তাদের স্বীকার করতে হয়। তাই দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বীকৃতি একান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন; কারণ এরূপ আত্মা স্বীকার না করেও কেবলমাত্র ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগের মাধ্যমে চৈতন্যের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করা যায়। দেহাতীত চৈতন্য স্বীকার করার তাই কোনোই প্রয়োজন নেই—এই হল চার্বাকিদের সিদ্ধান্ত।

এভাবে ভূতচৈতন্যবাদ স্থাপিত হলে বস্তুর স্বভাব অনুসারেই 'জগৎসৃষ্টির মূল রহস্য উদঘাটন করা' সম্ভব হয় এবং চেতন ও জড় এই দ্বিবিধ বিভাগ এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়। তাই জগৎকর্তা হিসেবে ঈশ্বর-স্বীকৃতির কোনোই আবশ্যক হয় না। এই হচ্ছে চার্বাকিদর্শনের নিরীশ্বরবাদের মূল প্রতিপাদ্য এবং দার্শনিক অবস্থানের ভিত্তিভূমি।

তবে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে (ঈশ্ ধাতুর বরচ্ প্রত্যয় করে) কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বশক্তিশালী শাসনকর্তা হিসেবে লৌকিক ঈশ্বরস্বীকারে চার্বাকিগণের আপত্তি নেই। জগতের অবাধ ও সর্বময় কর্তৃত্ব-সম্পন্ন সম্রাটকে যদি লৌকিক অর্থে 'ঈশ্বর' বলতে চান তো বলুন—তাতে তাঁরা আপত্তি করবেন না।[৮] কিন্তু ঈশ্বরবাদীরা এতে খুশি নিশ্চয়ই নন; তাঁরা ঈশ্বর বলতে এ রকম একজন লোকসিদ্ধ সর্বময় ক্ষমতাবান সম্রাটকে মেনে নিতে রাজী নন। তাঁদের মতে ঈশ্বর হলেন নিত্য ও অলৌকিক, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ একজন জগৎস্রষ্টা। চার্বাকি সম্প্রদায় এরকম ঈশ্বর স্বীকারে সম্মত নন।

'চার্বাকি দার্শনিকগণ', 'চার্বাকি সম্প্রদায়,' 'ভূতচৈতন্যবাদী', 'স্বভাববাদী' ইত্যাদি নানা নামে আমরা যে দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত আমাদের আলোচনায় করে এসেছি, সেই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আসলে কোনো সুনির্দিষ্ট ভাষ্য বা সূত্র-নির্ভর নয় বলে এ সকল অভিধায় যে দার্শনিক সম্প্রায়ের কথা বলা হয়েছে তাঁরা আসলে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রতিনিধি একথা মেনে নেওয়াই সঙ্গত। এই বস্তুবাদী দার্শনিকগণ সমূহ নিন্দা, তিরস্কার, ধিক্কার ও সামাজিক অসহিষ্ণু নিপীড়ন এবং নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়ে যেভাবে নিজেদের বস্তুবাদী, নিরীশ্বরবাদী

৮। 'লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ।' (**সর্বদর্শন সংগ্রহ; চার্বাকদর্শন**।)

অবস্থানকে আগলে রাখতে ও নিজেদের অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে গেছেন তা রীতিমতো বিস্ময়াবহ।

''বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা, কোনো একজনকে সর্বকর্তা (ঈশ্বর) বলে মেনে নেওয়া, গঙ্গাস্নানে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয় বলে মনে করা, জাতি ও বর্ণগত উচ্চত্ব-নীচত্ব নিয়ে অভিমান ও পাপাদির বিনিষ্টির জন্য সন্তাপ (অর্থাৎ ব্রত ও উপসনা ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান)'' —এই যে পাঁচটি 'মূঢ়তা-র' কথা বৌদ্ধ আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর 'প্রামাণবার্তিক গ্রন্থে বলে গেছেন,[৯] তারচেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা আর কী হতে পারে? আসলে চার্বাকিগণের লোকায়ত নিরীশ্বরবাদের মৌল প্রেরণাও ছিল সামাজিক কল্যাণ-ভাবনা। তাবই জন্য সমাজের প্রভাবশালী স্থিতস্বার্থের সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। বেদের অভ্রান্ততা ও ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এই অভিযানের পরিণামে লোকায়ত দার্শনিকগণকে 'অসুর' প্রভৃতি হীন অভিধায় ভূষিত হতে হয়েছিল, তিরস্কৃত ও নিন্দিত হতে হয়েছিল। 'যতদিন বেঁচে আছো খেয়ে দেয়ে, দরকার হলে ঋণকরে ঘি খেয়ে স্ফূর্তি করে জীবনটাকে কাটিয়ে দাও'-ইত্যাদি যে সব অতিসরলীকৃত ও বিকৃত বক্তব্য লোকায়ত দার্শনিকদের নামে প্রচলিত তা মোটেই অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। বিরুদ্ধবাদীদের ও বস্তুবাদীদের প্রতি ঈশ্বরবাদীদের নানা অসহিষ্ণু মন্তব্য, বা 'যারা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যুক্তিহীন কথা বলে সেই ব্যক্তিদের আমরা বারণও করি না' এ ধরণের উপহাস—ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী মহল থেকে চার্বাকিদের উদ্দশ্যে অজস্রভাবে বর্ষিত হয়েছে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর—চার্বাকি, বৌদ্ধ, জৈন ও সাংখ্য দর্শনে খণ্ডিত হয়েছেন। পূর্ব মীমাংসক দার্শনিকগণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর-সম্ভাবনা প্রবলভাবে খণ্ডন করেছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা রীতিমতো ভেবে দেখার মতো। উভয় সূত্র সাহিত্যে ঈশ্বরের কার্যতঃ অনুল্লেখ থাকলেও, এই অনুপস্থিতিকে পরবর্তী ভাষ্য ও টীকাকারেরা নানাভাবে ঈশ্বর-সিদ্ধি সূচক ব্যাখ্যা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন দেখা যায়। সর্বশেষে, ন্যায়-চূড়ামণি ও আচার্যরা যুক্তিবিচারের আলোকে

৯। প্রমাণবার্তিক ঃ স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ ; অন্তিমকারিকার স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

ঈশ্বর-সিদ্ধিকে প্রধান উপজীব্য ও প্রতিপাদ্য করে সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাদি পর্যন্ত রচনা করেছেন। অথচ ন্যায়-বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বর-অস্বীকৃতিমূলক যুক্তিগুলোকে খণ্ডনের তেমন কোনো উদ্যোগই চোখে পড়ে না, ঈশ্বর-সিদ্ধির কোনো ব্যাকুলতাও দেখা যায় না। এটা কি একটা আকস্মিক ব্যাপার ও আপতনমাত্র? এই প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ঈশ্বরসূচক দিকগুলোর ব্যাপক আলোচনাকালে আমাদেরকে অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঈশ্বর-স্বীকৃতি রয়েছে। তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা নিবন্ধাংশে যথাস্থানে আমরা করবো। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-ব্যতীত যোগসিদ্ধি সম্ভব হলেও প্রধানতঃ যথার্থ যোগসিদ্ধির আনুকূল্যের জন্য ঈশ্বরানুগ্রহের প্রয়োজনেই যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু সেই পরমকারুণিক ঈশ্বর বহুল পরিমাণেই যোগসিদ্ধিদাতা মাত্র, বিশ্বাসের বস্তু; যুক্তিবিচারের জোর দাবী সেখানে তেমন নেই বলেই মনে হয়েছে। তাছাড়া যোগ একটি অসাম্প্রদায়িক বিষয়, ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী সকলের কাছেই তা সমান হিতকর ও আদরণীয়। নৈয়ায়িক নিশ্চয়তার নিরিখে পাতঞ্জল দর্শন-এর কথা টেনে এনে ঈশ্বরবাদীদের তেমন ইষ্ট হয় না। বাকী থাকে বেদান্ত দর্শন-এর বিপুল ক্ষেত্রটি। বেদান্ত দর্শনে নানা সম্প্রদায়; দ্বৈত, অ-দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি নানা মত রয়েছে। যুক্তিবিচারের পরিশীলিত শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড বলে অভিহিত শাঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তের 'ঈশ্বর'-কে পরমার্থতঃ যথার্থ ঈশ্বর বলেই গণ্য করা যায় না। বেদান্ত দর্শনের আলোচনাকালে তা অবশ্যই বিচার্য। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তের সচ্চিদানন্দঘন, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপকে নিশ্চয়ই জগৎস্রষ্টা করুণাময় ঈশ্বর বলা চলে না। ভূমিকাংশের দ্বিতীয়ভাগে যথাস্থানে এবং বেদান্ত দর্শন সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনাকালে নিবন্ধাংশে আমরা এ বিষয়ে বিচারে ব্রতী হবো।

২

ভূতচৈতন্যবাদী লোকায়ত চার্বাক সম্প্রদায়ের নিরীশ্বরবাদ স্পষ্ট এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে অস্পষ্টতা নেই। যুক্তিতে যদি অসারতা থাকে তো তার বিচার নিশ্চয়ই করা যায় ও যাবে। প্রশ্ন হল, 'বস্তু-নিরপেক্ষ চৈতন্য অসম্ভব'-এই বস্তুবাদী প্রস্থান-বিন্দুতে তাঁরা ছিলেন অবিচল।

হাজার হাজার বছর আগেকার এই বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে এক দুঃসাহসিক মননশীলতারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। এমন প্রবল একটা মতবাদের একখানি নির্ভরযোগ্য 'সূত্র' বা 'ভাষ্য' গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায় না;[১০] অথচ নানাভাবে এই বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী অভিমত খণ্ডনের সতর্ক আয়োজন বহু ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। কার্যতঃ এই নেতিবাদী খণ্ডনাত্মক যুক্তি সমূহ থেকেই চার্বাকীয় মতবাদকে গড়ে তুলতে হয়েছে!

ভারতের বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকদের বেদ-বিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের কথা সুপরিজ্ঞাত। এই দু'টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িক নিপুণতা রীতিমতো বিস্ময়কর। তবু ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের টানাপোড়েনে এই দুটি অভিমতও নানা আচারে আড়ষ্ট এবং নিয়মে নিবন্ধ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়েছে। একি সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতিলাভের প্রত্যাশার পরিণাম, না, নিজেদের দার্শনিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতার ও নিজেদের সম্প্রদায়গত বিরোধ ও আত্মকলহেরই পরিণতি? বিশেষ করে, মহাযানী যোগাচার বৌদ্ধদর্শনে একদিকে দেখি প্রভূত পরাক্রমশালী নিরীশ্বরবাদিতা আর তারই পাশাপাশি দেখা যায় জগতেব সর্ব-বিজ্ঞানময়তার প্রতি কী ঐকান্তিক আস্থা!

সাংখ্য দর্শনে চার্বাকীয় একাগ্রতায় বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রত্যাশিতভাবেই নেই, কিন্তু প্রকৃতি-পরিণামবাদী সাংখ্য-সম্মত অবস্থানে জড় প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সাংখ্য দর্শনের নিরীশ্বরবাদ প্রবল ও প্রত্যয়দীপ্ত।

১০। প্রাচীন গ্রীকদার্শনিক ইপিকিউরিয়াস ছিলেন বস্তুবাদী দর্শন চিন্তাব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে প্রচণ্ড প্রতিবোধেব সম্মুখীন হতে হয়, অনেকটা আমাদেব প্রাচীনকালেব চার্বাকপন্থীদেব মতোই। ইপিকিউবিয়াস-এব রচিত প্রায় তিনশত গ্রন্থই চিবকালেব মতো নিখোঁজ হয়ে গেছে প্রতিবাদীদের অনল-আক্রোশে। সামান্য দু'একটি খণ্ড-ছিন্ন যে লেখা বক্ষা পেয়েছিল তা থেকেই পববর্তীকালে গ্রীক বস্তুবাদী এই দার্শনিকদেব যা কিছু মতামত জানা গেছে। (**সমাজ সাহিত্য দর্শন** : হেমন্ত কুমার গাঙ্গুলী; পৃঃ ১৫৫)

প্রাচীন ভাবতে চার্বাক-দার্শনিকদের গ্রন্থভাগ্য যে তার চেয়ে প্রসন্ন ছিল না তা নিশ্চিত করে বলা চলে। অনেক পরবর্তীকালে রচিত এবং ববোদার দি **ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুট** কর্তৃক পুস্তাকাকাবে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত জয়রাশি ভট্টের 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ' নামক একখানি লোকায়ত-দার্শনিক অভিমত সম্বলিত গ্রন্থের কথা জানা গেছে। আবিস্কৃত ঐ বইখানিব অত্যন্ত সযত্ন রক্ষণায়োজন দেখে প্রতিপক্ষের প্রমত্ত প্রাবল্যের কথাই মনে জাগে!

CHARVAK PHILOSOPHY: D.R. Sastri, Calcutta,

ঈশ্বরবাদীদের প্রবল প্রতিকূলতার ফলেই সাংখ্য দর্শনের মূলগ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে এমন অভিমতকে অসঙ্গত বলে হাল্‌কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যে' বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য দর্শনকে ঈশ্বরবাদী বলে প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চালিয়েছেন তাকে এই প্রভাবের পরিণতি বলেই মনে করা যায়।

পূর্বমীমাংসা দর্শনের সর্বজ্ঞ-খণ্ডনাত্মক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই তাঁদের একটা অবিচল, দৃঢ় নিরীশ্বরবাদী অবস্থান। একদিকে দেখা যায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণে তাঁদের কী বিপুল আগ্রহ আর অন্যদিকে বেদের অভ্রান্ততা প্রমাণে ও বেদ-বিহিত আচার ও কর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের কী অচলা আস্থা! পূর্বমীমাংসক দার্শনিকগণ একদিকে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যদের বহু যুক্তি মেনে নিয়েছেন আবার ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা খণ্ডনে ঐ একই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণকে তাঁরা তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণে জর্জরিত করেছেন। একদিকে আদিম আচার ও কর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের গভীর আগ্রহ দেখে মীমাংসক দার্শনিকগণকে আদিম শিশুসুলভ সারল্যের ও প্রত্যয়ের প্রতীক বলে মনে হয়, কিন্তু পাশাপাশি যখন কুমারিল, প্রভাকর ও শবরস্বামীর গভীর ও নিপুণ বিচারধারা ও বিশ্লেষণী যুক্তিসমূহের কথা ভাবি তখন তাঁদের আধুনিক-মনস্কতায় চমৎকৃত হয়ে উঠতে হয়।

এই অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিপুল সংখ্যক দার্শনিক আচার্যবৃন্দ। এঁদের ক্ষুরধার বিচার-নৈপুণ্য ও উদ্ভাবনশীলতা যে কোনো দেশের, যে কোনো কালের নৈয়ায়িক বিচারের ক্ষেত্রে শ্লাঘাকর দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে স্বচ্ছন্দে। অন্যদিকে ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের মধ্যেও বহু অমিতশক্তিধর নৈয়ায়িকদের সাক্ষাৎ মেলে। অদ্বৈত বেদান্তের অধিবিদ্যাগত অবস্থানের ব্যাপারে যত আপত্তিই থাক না কেন শঙ্করাচার্যের নৈয়ায়িক নিপুণতা প্রায় তুলনাহীন। পাশ্চাত্য দর্শনে হেগেল তাঁর ব্রহ্মবাদী অবস্থান সত্ত্বেও ভাববাদী দর্শনে বুদ্ধির নির্মাণ হিসেবে জ্ঞানের যে সৌধপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার স্বাঙ্গীকরণ ও উত্তরণের মধ্যদিয়েই আধুনিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পাদপীঠ রচিত হয়েছে—তা আজ বস্তুবাদীদের স্বীকৃত প্রস্থান-বিন্দু। হেগেলের দর্শনের ভাববাদী খোলসকে অগ্রাহ্য করে তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সারবস্তুকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করেই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় দর্শনের

ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ বর্জনের অনুরূপ একটা প্রয়াসের প্রচুর অবকাশ রয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বর-সাধক যুক্তিসমূহের মধ্যে দু'টো মানসিকতা খুবই স্পষ্ট। একটি হ'ল, ঈশ্বরকে আন্তর বিশ্বাসের বিষয় করে তোলা, 'ক্লান্তজনের চিরসখা' বলে মেনে নেওয়া। অন্যটি হল, ঈশ্বরকে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয়-সিদ্ধ ঘোষণা এবং তার সপক্ষে অজস্র যুক্তিপ্রমাণের সাক্ষ্য এনে হাজির করা। প্রাচীন গ্রীসের আরিস্তোতল থেকে শুরু করে আমাদের দেশের 'কুসুমাঞ্জলি'-কার উদয়নাচার্য ও 'তত্ত্বচিন্তামণি'-কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতো নব্যনৈয়ায়িক দিকপাল পর্যন্ত সকলেই এই চেষ্টা করে এসেছেন।

ঈশ্বরকে বিশ্বাসের ব্যাপার করে তুললে তা নিয়ে তর্ক করা চলে না। 'বিশ্বাসে যেখানে বস্তু মিলে' সেখানে তর্কবিচারের পণ্ডশ্রমকে 'বহুদূরে' রেখে দিলে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু তাতে নিস্তার মিলে না। 'ভক্তি দিয়ে যাকে মানছি, তিনি যুক্তিতে সিদ্ধ নন'-এ বোধ বড় দগ্ধ করে; পদে পদে ভক্তিকেও তাই নানা যুক্তির জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। ভারতের বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের প্রবল তার্কিক মাধ্ব বৈদান্তিকেরা নৈয়ায়িক-সম্মত ঈশ্বরসিদ্ধির বিরুদ্ধে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বৈষ্ণব দার্শনিক ব্যাসতীর্থ তাঁর 'তর্কতাণ্ডব' নামক গ্রন্থে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ঈশ্বরানুমান খণ্ডন করে ফিরে এসেছেন তাঁর নির্ভরযোগ্য অবস্থানে; 'ঈশ্বর শাস্ত্রপ্রমাণৈকগম্য' অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। সেই একই কথা, ''বিশ্বাসে মিলয় বস্তু, তর্কে বহুদূর!'

অন্যদিকে নৈয়ায়িক আচার্যগণ নানাভাবে যুক্তিবিচারের মাধ্যমে চেয়েছেন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার সেই যুক্তি-বিচারগুলো আমরা আমাদের নিবন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করে দেখব। অদ্বৈত বেদান্তের ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তাতে যে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে তাতে দ্বন্দ্ব ঘোচে না, আমাদের নৈয়ায়িক-নিশ্চয়তাবোধও তৃপ্ত হয় না।

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে জীব-নিরপেক্ষ ব্যবহারিক জগতের ব্যাখ্যার জন্য তার উপাদান-কারণ হিসেবে শঙ্করাচার্য যেমন একদিকে 'মায়া' স্বীকার করেছেন তেমনই অপরদিকে জীবের কর্মানুসারে জগতের পরিণাম ঘটাবার জন্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এক সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্মের কথাও তিনি বলেছেন। অদ্বৈত বেদান্তের

আলোচনাকালে আমাদের নিবন্ধে তা বিচার করা হয়েছে। শঙ্কর মায়াবী অর্থাৎ মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মকেই সগুণ-ব্রহ্ম হিসেবে বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়োপাধিক হয়ে সগুণ ব্রহ্ম হিসেবে জীবের কাছে প্রতিভাত হন মাত্র! এই সগুণ ব্রহ্ম সক্রিয়, অনন্ত শক্তির আধার, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী; তিনি জগল্লীন হয়েও জগদিতিরিক্ত; যে সব দার্শনিক মতবাদে জড়াণু অর্থাৎ জড়প্রকৃতি প্রভৃতি অদৃষ্ট অচেতন শক্তিকে জগতের মূল কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে অদ্বৈত বেদান্তে সেগুলোকে খণ্ডন করে সচেতন সগুণ ব্রহ্মকেই জগতের মূল কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তাঁকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঈশ্বর মায়াযুক্ত হয়েও মায়াধীন নন, তিনি মায়াধীশ। জীবগণ যাতে কর্মানুসারে ফলভোগ করতে পারে তারই জন্য ঈশ্বর এই জগৎ রচনা করেছেন।

কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত-সম্মত ঈশ্বরের পারমার্থিক অর্থে কোনো সত্তাই নেই;[১১] তাঁর শুধু ব্যবহারিক অনিত্য একটা সত্তাই রয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের ফলে মায়া দূরীভূত হয়ে যায় এবং ব্যবহারিক জগৎ ও সেই সঙ্গে ঐ জগদীশ্বরের কোনো সত্তাই থাকে না। তাহলে এমন ঈশ্বরকে নিয়ে দার্শনিকের চলে না। যার চরম সত্তা নেই তাঁকে পরমেশ্বর বলে মানি কোন ভরসায়? এখানে ধর্মের 'ঈশ্বর' আর দর্শনের 'পরমসত্তা'-র মধ্যেকার সেই চিরকালের দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় নন তাঁকে ঈশ্বর মনে করতে বাধে; আর যিনি এক ও অদ্বিতীয় পরমসত্তা তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞান করার কোনো উপায় নেই! তাছাড়া শঙ্করের মতে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল মায়াযুক্ত হলে মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ঐ প্রতিবিম্বকেই জীব ভ্রমবশতঃ ঈশ্বর বলে গ্রহণ করে। কাজেই মায়া অপসারিত হলে ঈশ্বরই আর থাকেন না। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই ভ্রম কার ঃ ব্রহ্মের, প্রতিবিম্বের, না জীবের? বেদান্ত দর্শনের অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এনিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের এই ব্যবহারিক ঈশ্বরকে কোনোমতেই পরম-সত্তা ও চরমসত্য বলে গ্রহণ করা চলে না।

১১। "তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চ, পরমার্থতোবিদ্যয়াহপাস্তসর্বোপাধিস্বরূপ আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপদ্যতে।" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য; ভামতীকল্পতরুপরিমল; নির্ণয়সাগর প্রেস; বোম্বে ১৯২৪, পৃ; ৪২৬)।

দার্শনিক বিচারে সগুণ ঈশ্বরের পারমার্থিক সিদ্ধি সম্ভব নয় এবং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর খণ্ডনের ফলে তার অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই যুক্তিবিচারের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি শেষ পর্যন্ত অচরিতার্থই থেকে যায়।

আমাদের সামগ্রিক আলোচনায় ঈশ্বরবাদের দ্বন্দ্বে বারে বারে আমাদেরকে এরূপ বিরোধী-সমাগমের মুখোমুখী হতে হয় আর এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে শাস্ত্র-প্রমাণের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই শেষ পর্যন্ত প্রবল তার্কিক ও পরমভক্ত বৈষ্ণব দার্শনিক ব্যাসতীর্থ ঈশ্বর স্বীকার করেছেন!

৩

'যুক্তিবিচারে ক্লান্ত মানুষের অজস্র জিজ্ঞাসার শূন্যতাকে বিশ্বাস ও ভক্তির নিশ্চিন্ত আশ্রয় এক বিরাট পরমেশ্বরের কল্পনা দিয়ে ভরে দেওয়া যুগে যুগে পৃথিবীর বহু দার্শনিকের কাছেই শেষপর্যন্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা বলে মনে হয়েছে। জগৎকে এক পরমসত্তার লীলাময় প্রকাশ বলে সান্ত্বনালাভের বাসনা থেকেই অসহায়তা ও অচরিতার্থতার নিরাকরণের শেষ আশ্রয় হিসেবে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে' এরকম বক্তব্য আধুনিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম একটি প্রধান সিদ্ধান্ত; কিন্তু শুধু বিশ্বাসের বস্তু বা ভক্তির আশ্রয় হিসাবে নয়, ঈশ্বরকে যুক্তিসিদ্ধ অনুমিতির নির্ভুল নির্দোষ সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠার নানা আয়োজন দর্শনের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে। এই সব যুক্তিবিচারের বিপুল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত তারমধ্যে অভিন্ন সুর ধরা পড়ে। প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক আরিস্তোতল বললেন,'পালঙ্ক তৈরী করার জন্য মিস্ত্রী চাই', ভারতেও নৈয়ায়িক দার্শনিকগণ বললেন, 'ঘট তৈরী করতে কুমোরের প্রয়োজন'। কোনো বস্তু তৈরী করতে হলে একদিকে চাই প্রয়োজনীয় উপাদান আর অন্যদিকে চাই এইসব বস্তুর নির্মাণকৌশলে অভিজ্ঞ ও ঐ উপাদানগুলোকে কাজে লাগিয়ে বাঞ্ছিত বস্তুনির্মাণে দক্ষ একজন কর্তা। তাহলে এই বিশাল জগতের মতো একটি কর্মকাণ্ডের জন্য একজন অপরিমিত জ্ঞানশালী কর্তা অবশ্যই প্রয়োজন। তা না হলে এই জগতের সৃষ্টি কে করল? এই জগতের স্রষ্টা তো একজন সাধারণ কুমোর বা মিস্ত্রীর মতো সীমবদ্ধ-শক্তি, স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তি হতে পারেন না। তাঁকে হতে হবে অমিত-শক্তি একজন সর্বজ্ঞ পুরুষ; এবং এই সর্বজ্ঞ পুরুষকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করা

হ'ল। কিন্তু এতে করেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয়ে গেলেন না। কারণ প্রত্যক্ষ-ভাবে এমন ঈশ্বরকে কোথাও পাওয়া যায় না বলেই পাই না। তাই অনুমানের মূলনীতি নিয়ে শুরু হল নানা কূটতর্ক, দেখা দিল নানা নৈয়ায়িক বিচার ও প্রশ্ন। 'সকল কার্যের মূলে একজন কর্তা রয়েছেন' মেনে নিতে হয়; কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লব্ধ সূত্র থেকে অতীন্দ্রিয় কোনো ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয় না।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জিনিসের মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে শিখেছি। কিন্তু প্রতিটি কৃত্রিম জিনিসের একজন না একজন সম্ভাব্য কর্তা সহজে অনুমিত হলেও, সমস্ত প্রাকৃতিক জগৎ একজন অতীন্দ্রিয় পুরুষের সৃষ্টি এটা ঝট করে মেনে নেওয়া যায় না। একটা ঘট ও তার স্রষ্টা কুমোরের প্রত্যক্ষ-সম্ভব দৃষ্টান্ত থেকে সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ-সংসারের সর্বকর্তা একজন অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অনুমান এত সহজে সিদ্ধ হয়ে যায় না। আদৌ হয় বা হতে পারে কিনা তা-ই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

ঈশ্বরবাদীরা বলেন, কার্যমাত্রের কর্তা আছেন; তাই বলে কর্তা হলেই তিনি প্রত্যক্ষভূত হবেন এমন কোনো কথা নেই। ঘটের কর্তা কুমোরকে তো প্রতিটি ঘটের সঙ্গেই আমরা প্রত্যক্ষ করি না। তাহলে অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুমতিতে দোষ কোথায়? সমস্যা দাঁড়ায় এরকম যুক্তি মেনে নিলে কোনো যুক্তিকেই আর অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; কেননা, যে কোনো ক্ষেত্রেই একটা না একটা ব্যাপ্তি বা সাধারণ সূত্র স্থাপন করা যায়। 'ঘট কুমোরের সৃষ্টি' এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ দৃষ্টান্ত থেকে ঘট দেখে ঈশ্বরের অনুমান নিশ্চয়ই করা চলে না। এখানে ন্যায়ের পরিভাষায় 'ঘট' হল পক্ষ আর 'কুমোরের সৃষ্টি' হচ্ছে সাধ্য। একটি ঘটের বেলা কুমোরকে দেখতে পাচ্ছি না বল ঘট মাত্রই কুমোরের সৃষ্টি এই সাধারণসূত্র নিশ্চয়ই মিথ্যা হয়ে যায় না; অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের অদর্শন ক্ষেত্র বিশেষে দেখালেই অনুমান ব্যভিচারী হয়ে পড়ে না। কিন্তু তা থেকে জগৎ কর্তা একজন ঈশ্বরের সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া একটা রীতিমতো বাড়াবাড়ি।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা হল খুশিমতো একটা পক্ষ স্থির করে যে কোনো একটা ব্যাপক সাধারণসূত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলা চলে না। ঘটের কর্তা কুমোরকে দেখে, কার্যমাত্রের কর্তা আছেন তাই জগৎরূপী এই বিরাট কার্যের ঈশ্বর-রূপী একজন কর্তা রয়েছেন এরকম ব্যাপক সিদ্ধান্ত টানা যায় না। বৌদ্ধ আচার্য ধর্মকীর্তি একটি সরস অথচ

তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অহেতুক অনুমিতির ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছেন। 'যা মাটি দিয়ে তৈরী তা-ই কুমোরের সৃষ্টি ; এই উইয়ের ঢিবি-টি মাটি দিয়ে তৈরী অতএব এ উইয়ের ঢিবি-টি কুমোরের তৈরী'—একথা বললে আমরা নিশ্চয়ই মানব না। কেন না, উইয়ের ঢিবির পেছনে কুমোরের কর্তৃত্ব নেই এটা আমরাও স্বীকার করি। এই জগৎসংসারের পেছনে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখা যাচ্ছে না তবু 'কার্যমাত্রের কর্তা রয়েছেন' এই সাধারণ সূত্র থেকে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব এভাবে মেনে নিতে যাচ্ছি কেন? এমন জোর কোথায় পাই?

নিবন্ধে আলোচনাকালে এইসব অজস্র কূটতর্ক নিয়ে আমরা বিচার করবো। কিন্তু এই সামান্য আলোচনার আভাস থেকেই বোঝা যায় এই যুক্তি-বিচারের পথ মোটেই সহজ ও সরল নয়। তাছাড়া এই বিশাল ও জটিল জগতের কার্যত্ব কি ন্যায় শাস্ত্রের ঘট ও পট অর্থাৎ ঘটাদি ও বস্ত্রাদির মতো বহুল ব্যবহৃত দৃষ্টান্তের মতোই একটি সহজ সরল 'ঘট-কুম্ভকার' 'বস্ত্র-তন্তুবায়' জাতীয় নিছক প্রত্যক্ষগম্য কার্যমাত্র? ব্যাপ্তি নিশ্চয় অর্থাৎ সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের পথে অজস্র সমস্যা তাই ছড়িয়ে রয়েছে বলে অনুমানের নৈয়ায়িক নিশ্চয়তা সম্পর্কে, অনুমানের ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা সহজেই দেখা দেয়। ন্যায়-বৈশেষিক নৈয়ায়িকগণ থেকে শুরু করে যে কোনো যুক্তিপ্রমাণবাদী তার্কিকের সামনে তাই নানান সমস্যা। জগতের জড় উপাদান বলে কল্পিত মহাভূতচতুষ্টয় কি ঈশ্বরের চেয়ে স্বতন্ত্র সত্তা? দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা এল কোথা থেকে, তা কি যদৃচ্ছা অর্থাৎ একটি আকস্মিক ব্যাপার, না তা এক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষেরই রচনা? জীবের কর্মফলদাতা ঈশ্বর কি তাদের ভোগজনক অদৃষ্ট-জাত ফল বরাদ্দ করে দেওয়ার একজন প্রযোজক কর্তা মাত্র? জীবের কর্মফলই কি তবে ঈশ্বরকে সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত করে? এরকম নানাবিধ প্রশ্নে বিচারবাদী ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা অভিলাষীরা বিব্রত ও বিপর্যস্ত। ফলে নৈয়ায়িক ঈশ্বর-সিদ্ধির বিরুদ্ধে তাই নানা যুক্তিতর্ক নানাভাবে উত্থাপিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনেও এ রকম নানা জিজ্ঞাসার ভীড়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের সীমায়িত পরিধিতেও আমরা দেখতে পাই, একদিকে রয়েছেন বস্তুবাদী ভূত চৈতন্যবাদী লোকায়ত চার্বাক সম্প্রদায়, প্রত্যক্ষের অগম্য অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর খণ্ডনে তাঁরা অবিচল। রয়েছেন নানাভাবে নিত্য-সর্বজ্ঞ ও

জগৎকর্তা হিসাবে ঈশ্বর-খণ্ডনে প্রতিশ্রুত বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকবৃন্দ ; সর্বজ্ঞ ঈশ্বর খণ্ডনে অচঞ্চল মীমাংসক আচার্যবৃন্দ এবং প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ এই বক্তব্য উত্থাপনে তৎপর সাংখ্য দার্শনিকগণ। অন্যদিকে আমরা দেখেছি অদ্বৈত বেদান্তে যে মায়া-বিশিষ্ট ব্যবহারিক ঈশ্বরের কথা রয়েছে তাঁকে চরম ও পরম সত্য সত্তা বলে মানা চলে না। তাই শেষ পর্যন্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের পাদপীঠে শাস্ত্র-প্রমাণ-নির্ভর ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলেছে। বুদ্ধি ও যুক্তি ঈশ্বর প্রতিষ্ঠায় ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ; এই পরিস্থিতিতে যুক্তি ও বুদ্ধিকে অবশেষে হতে হয়েছে ভক্তি-আশ্রয়ী !

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নানাভাবে নিরীশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য নানাদিক থেকে এই যে বিপুল আয়োজন তার গুরুত্বকে কোনো মতে তাই লঘু করে দেখা চলে না ; অগ্রাহ্য করা চলে না তার নৈয়ায়িক নিষ্ঠা ও সবলতার দিকগুলোকে। স্পষ্ট তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলে তুলে বিপক্ষের প্রতিষ্ঠিতব্য জগৎকর্তা নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর-সাধক যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করার এ নিপুণতার নিছক নৈয়ায়িক তাৎপর্যের গুরুত্ব, এক কথায়, অপরিসীম।

কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। এমন বিপুল আয়োজন ও নিপুণ নৈয়ায়িকনিষ্ঠা সত্ত্বেও সমাজ মানসে ঈশ্বরীয় ধর্মীয় প্রভাবের সুচিরকাল স্থায়ী ব্যাপকতা কেন, কেন তাহলে নিরীশ্বরবাদের দার্শনিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি প্রদানে এমন পরিব্যাপ্ত কুণ্ঠা, তা বোঝা যায় না। সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমরা এখানে মুখ্যতঃ নিরীশ্বরবাদী যুক্তি সমূহের নৈয়ায়িক নিশ্চয়তার প্রশ্নটিই বিচার করে দেখতে চাই।

চার্বাক দর্শনে বস্তুবাদের সমস্ত সবল দিকগুলোর সসম্ভ্রম স্বীকৃতি দিয়েও একথা না মেনে উপায় নেই যে সেই প্রায়-আদিম সমাজে বস্তু-বিশ্বের অনুধাবনে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি প্রত্যাশিত কারণেই ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাছাড়া প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের উপলব্ধি ছিল না বললেই চলে ; এবং যতখানি ছিল তা ছিল ছকে-বাঁধা একটা যান্ত্রিক ধারণার মতো। তাই প্রাচীন লোকায়ত চার্বাকীয় ভূতচৈতন্যবাদের বস্তুবাদ তার নির্ভরযোগ্য প্রত্যয়-ভূমির সন্ধান শেষ পর্যন্ত পেল না।

অন্যদিকে জগতের চিরচঞ্চল গতির ও নিয়ত পরিবর্তন-শীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শনের মধ্যে বরং একটা

পরিণত ব্যাখ্যার আভাস মিলে। নিছক গতির দিক থেকে দেখলে বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ এবং সাংখ্যা দর্শনের প্রকৃতি-পরিণামবাদকে একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থান বলেই মনে হয়। বিপরীতের অন্তর্বিরোধের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বিকাশশীল জাগতিক গতির ব্যাপারে আধুনিক বস্তুবাদী মূল সূত্রের একটা মিল রয়েছে মনে হতে পারে। কিন্তু এই প্রত্যাশাও পূর্ণ হয় না শেষ পর্যন্ত। দ্বন্দ্ব ও গতির মধ্যে সম্পর্ককে একটা যান্ত্রিক ব্যাপার মনে করলে চলে না। ফলে প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক বিরোধকে বস্তু-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তর্কের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধতে গেলে গোলমালে পড়তে হয়। ভূতচৈতন্যবাদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনেও গতি ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা নিয়ে নানা বিভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দেখা গেল। বৌদ্ধ দর্শন ক্ষণধারার মধ্যে পূর্বাপর কোনো অন্বয় ও যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হল। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ শেষ পর্যন্ত 'অসংখ্য বস্তুক্ষণের নিরন্বয় সমষ্টিমাত্র'[১২] হয়ে রইল। কার্যকারণ সম্পর্কের গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা প্রদানে বৌদ্ধ দর্শন ব্যর্থ হল। অদ্বৈত বেদান্তে গতি ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার যন্ত্রণা পরিহার করার জন্য তাকে সরাসরি মিথ্যা একটা 'ভ্রান্তি' বলেই খারিজ করে দেওয়া হল। আবার সাংখ্যদর্শনে বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও গতিকে স্বীকার করেও নূতন বস্তুর উৎপত্তি নিঃসংশয় স্বীকৃতি পেল না। পরিবর্তনের অর্থ দাঁড়াল একটি সুচিহ্নিত পরিধির মধ্যে পুরাতনেরই নিত্য আনাগোনা, এ যেন চিরপুরাতনেরই নূতন একটা যান্ত্রিক অভিব্যক্তি মাত্র। বৌদ্ধ দর্শনের একদেশদর্শিতা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছল যখন দেখা গেল ক্ষণিকের স্বীকৃতি, সমগ্র ক্ষণপ্রবাহকে এবং সামগ্রিক গতিধারাকে অস্বীকার করেছে। বৌদ্ধমতে শেষ পর্যন্ত অবয়ব বা অংশগুলোই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল, সমুদয়, অবয়বী তাঁদের মতে মিথ্যা বলে গণ্য হ'ল। অথচ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে একের অভ্যন্তরে উন্মেষমুখী নতুন সুপ্ত হয়ে থাকে এবং এ জাগরমান নূতন ক্ষয়িষ্ণু পুরাতনের বিরোধের মধ্য দিয়েই সামগ্রিক প্রবাহের সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে। বৌদ্ধমতে পূর্বক্ষণ পরক্ষণের বস্তুসত্তাকে ধারণ করে না, তারা একে অন্যে অনাত্মীয়, সম্পর্কহীন। এই নিরন্বয় ক্ষণবাদ তাই বস্তুর অন্তর্নিহিত বিপরীতের বিরোধ ও ঐ বিরোধের মধ্য

১২। **সমাজ সাহিত্য দর্শন** ঃ হেমন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায ; পৃঃ ৯৩

দিয়ে বস্তুর নিয়ত পরিবর্তনশীলতার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হল। এক কথায় বিশুদ্ধ চিন্তার এই সীমাবদ্ধতাগুলো নিজের আরোপিত সীমাকেই অতিক্রম করতে ব্যর্থ হল এবং সমাজ-মানসে ব্যাপক কোনো ঠাঁই-ই পেল না। চার্বাক বস্তুবাদীরা ঠিকই বুঝেছিলেন, 'বস্তু বুদ্ধিকে অনুসরণ করে না, আসলে বুদ্ধিকেই বস্তুর অনুসরণ করতে হয়।' কিন্তু তাঁরা বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তির গতিধারাকে যথার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন নিরীশ্বরবাদী যুক্তিসমূহ তাই একটা সম্পূর্ণতঃ যুক্তি-বিচারগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ হল। কিন্তু সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনের নিরীশ্বরবাদী যুক্তি বিন্যাসের মধ্যে যে প্রবল প্রত্যয়ী মননশীলতার সাক্ষাৎ মেলে তা আজো যে কোনো অগ্রগামী সমাজ ভাবনার ঐতিহ্যগত অপরিহার্য উত্তরাধিকার।

'আমার চিন্তাধারা এই জগতে বাঞ্ছিত সমঝদার না পেয়ে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ জলরাশির মতো নিজেই শুধু নিজের ওপর আছড়ে পড়ে লয় পাবে, ক্ষয় হয়ে যাবে।'[১৩] বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি নালন্দার বৌদ্ধ-বিহারে বসে তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'প্রমাণবার্তিক' সমাপ্ত করে এই খেদোক্তিই করেছিলেন। ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকদের যুক্তিবিচারের আলোচনাকালে, আমার মনে হয়েছে, এরকম খেদোক্তি এঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য! যে কোনো প্রগতি-ভাবনার মতোই এইসব দিকপাল চিন্তাবিদেরা তাঁদের যুগের থেকে ছিলেন অনেক এগিয়ে। আজো শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের তুলনামূলক অভাবনীয় প্রসার এই সম্ভাব্য ব্যবধানকে নিঃশেষে দূর করে দিতে, অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে একথা অসংশয়ে বলা চলে কি? জগৎ ও জীবনের বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমভাবে সর্বত্র সমাদৃত এমন কথা বলা চলে না। নিজের সমস্ত অক্ষম দীনতাকে স্বীকার করে নিয়েও আমার মনে হয়েছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতীয় দর্শনের নিরীশ্বরবাদী যুক্তিসমূহকে বিচার করে দেখা উচিত। এই নিবন্ধে সেই প্রচেষ্টারই ভূমিকা করেছি মাত্র।

১৩। মতংমম জগত্যলব্ধসদৃশ প্রতিগ্রাহকম্।
প্রয়াস্যতি পয়োনিধোঃ পয় ইব স্বদেহে জবাম্।। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ'; চিরায়ত সংস্করণ; পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য)।

প্রথম অধ্যায়

প্রশস্তপাদ, উদ্যোতকর ও অবিদ্ধকর্ণ প্রমুখ ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণের ঈশ্বর-সিদ্ধি

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরসাধন

বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার মহর্ষি কণাদ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর স্বীকার করেন নি—এই অভিমত প্রসিদ্ধ। তা সত্ত্বেও বৈশেষিক দর্শনের ঈশ্বর-সাধক সূত্র হিসাবে তিনটি সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সূত্র তিনটি হচ্ছে ঃ

(ক) তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্ (১।১।৩)

(খ) সংজ্ঞা কর্মত্বু অস্মদ্ বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্ (২।১।১৮)

(গ) প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞা কর্মণঃ (২।১।১৯)

যাঁরা মহর্ষি কণাদকে ঈশ্বরবাদী বলে মনে করেন প্রথমে তাঁদের মতানুসারে এই সূত্র তিনটির তাৎপর্য আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রথম সূত্রের অর্থ হচ্ছে 'তাঁর বাক্য বলেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ'। এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের বাক্য বলেই বেদ প্রামাণ্য। সূত্রে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখই নেই, তাই ঈশ্বরের এ অহেতুক অন্তর্ভুক্তিকে অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেছেন।[১৪] অনুরূপভাবে অন্য দু'টি সূত্রেও ঈশ্বরের প্রণিধান হয় না। দ্বিতীয় সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে, 'সংজ্ঞা, কর্ম ইত্যাদির দ্বারা আমাদের চেয়ে বিশিষ্টদেরই নির্দেশ পাওয়া যায়' এবং তৃতীয় সূত্রের অর্থ হল, 'সংজ্ঞা ও কর্মাদির দ্বারা ক্ষমতাবান চেতনের প্রত্যক্ষ ও প্রবৃত্তির অধিকতর সামর্থ্যই সূচিত হয়'।

প্রথম সূত্রে যে 'তৎ' কথাটির উল্লেখ রয়েছে তার বিচার প্রথমেই করা দরকার। 'তৎ' শব্দটির দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ পূর্ব প্রস্তাবিত বস্তু ; অর্থাৎ 'তৎ' শব্দের দ্বারা পূর্বের আলোচিত

১৪। A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY; S.N. DASGUPTA; Vol. I.P. 282.

বস্তুটিকেই গ্রহণ করতে হবে।[১৫] পূর্বের আলোচিত বস্তুটি 'যৎ' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হলেই পরবর্তী 'তৎ' পদের দ্বারা তাকে গ্রহণ করা যায়। 'যৎ' শব্দের দ্বারা উল্লিখিত না হলেও পূর্বে সাধারণভাবে কোনো বস্তুর উল্লেখ থাকলে পরবর্তী 'তৎ' শব্দের দ্বারা সেই বস্তুকে বোঝা যায়।[১৬] তা ছাড়া প্রসিদ্ধ বস্তুকেও 'তৎ' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন, 'সেই কৃষ্ণ কে নমস্কার', এখানে 'সেই' কথাটি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছে।[১৭] 'তৎ' শব্দের এই দু'টি অর্থের মধ্যে কণাদের সূত্রের 'তৎ' শব্দটিকে কোন অর্থে গ্রহণ করা উচিত তা-ই বিচার্য। যাঁরা কণাদকে ঈশ্বরবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চান তাঁদের মতে 'তৎ' শব্দ প্রসিদ্ধ পুরুষকেই বোঝাচ্ছে। তাঁদের মতে শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় ঈশ্বর প্রসিদ্ধ ; তাই সূত্রস্থ 'তৎ' শব্দটি ঈশ্বর-বোধক। তাঁরা বলেন, বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধির জন্যই এই সূত্রটি উক্ত হয়েছে।

বেদ অপৌরুষেয় এই মতবাদ খুবই প্রাচীন। পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে বেদ বাক্যময় বলে তা কোনো একজন পুরুষেরই রচিত। কিন্তু বেদ রচয়িতাকে তো একজন সাধারণ পুরুষ বলা চলে না, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য একজন সর্বজ্ঞ পুরুষ বলেই তাঁকে স্বীকার করতে হবে। নিজের প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তু অন্যকে বোঝাবার জন্যই ভাষার ব্যবহার হয়। সুতরাং বাক্যের দ্বারা বর্ণিত বিষয় উক্ত বাক্য প্রয়োগকর্তার প্রত্যক্ষসিদ্ধ এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। পরবর্তী দুটি সূত্রেও এই একই প্রসঙ্গের অবতারণা করে মহর্ষি কণাদ বলেছেন, কোনো বস্তুর নাম নির্দেশ এমন একজন ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব যাঁর ঐ নির্দিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়েছে। লৌকিক শব্দ ব্যবহারের স্থলে ও বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের মূলে একজন জ্ঞানী পুরুষ রয়েছেন একথা স্বীকার্য। বিশ্বের সমুদয় শব্দসমষ্টির অর্থ নির্ধারণের মূলে একজন সর্বজ্ঞ পুরুষ রয়েছেন এবং এই সর্বজ্ঞ পুরুষই বেদ-প্রবক্তা ঈশ্বর। মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় চিত্তের অজ্ঞানতার আবরণ দূর করে সর্বজ্ঞ হতে পারে ; কিন্তু যার পূর্বে সর্বজ্ঞতা ছিল না, পরে

১৫। 'যৎপদোপস্থাপ্যে তৎপদশক্তিঃ বোধ্যা'। (**শক্তিবাদ**, বিশেষ কাণ্ড, পৃঃ ১৬২ ; বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস ; ১৯১৪ বিক্রমাব্দ ; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ।)

১৬। 'তচ্ছব্দস্যাপি পূর্ববৎ পূর্বপ্রযুক্ত তদুপস্থাপিতে শক্ত্যন্তরমঙ্গীকার্যম্' **শক্তিবাদ** ; ঐ ; পৃঃ ১৬২

১৭। 'প্রসিদ্ধার্থকমপি তৎপদম্' ; **শক্তিবাদ** ; ঐ ; পৃঃ ১৬৩

শাস্ত্র-নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করে যিনি সর্বজ্ঞ হয়েছেন তাঁর পক্ষে সব সময়ে, সব বিষয়ে সর্বজ্ঞতা সম্ভব নয় অর্থাৎ তিনি 'নিত্য-সর্বজ্ঞ' নন। তাই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা ও বাক্যময় শাস্ত্রের প্রবক্তাই হলেন প্রকৃষ্ট সর্বজ্ঞ এবং অনুরূপ পুরুষই 'নিত্য-সর্বজ্ঞ' হতে পারেন। এই 'নিত্য-সর্বজ্ঞই' ঈশ্বর। মহর্ষি কণাদের মত অনুসারে ঈশ্বর স্বীকার করতে হলে শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচক ভাবের নির্ধারক নিত্য-সর্বজ্ঞ পুরুষকেই ঈশ্বর বলতে হয়; এই হল এঁদের অভিমত।

পরবর্তীকালে বৈশেষিক আচার্যগণ ঈশ্বর স্বীকারের জন্য অন্য নানাবিধ যুক্তি উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মতে, শুধু শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচক ভাব-সম্বন্ধের জন্যই ঈশ্বর স্বীকার করতে হবে এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নয়। জগতের সৃষ্টি ও সংহারের জন্যও ঈশ্বর স্বীকার প্রয়োজন। বৈশেষিক দর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁর ভাষ্যে জগতের সৃষ্টি সংহার-প্রণালী বর্ণনা করার সময় স্পষ্ট বলেছেন, পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যাতীত সৃষ্টি বা সংহার সম্ভব নয়। প্রশস্তপাদের বক্তব্য হল, জগতের একটি নির্দিষ্ট স্থিতিকাল রয়েছে। জগৎ কতো কাল থাকবে সে বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। জগৎ সৃষ্টির পর দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকার পর (শাস্ত্র মতে তা একশ ব্রাহ্ম বছর), স্বাভাবিক নিয়মেই তা ধ্বংস হবে। কিন্তু বস্তু বিনাশের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি সাবয়ব বস্তুর আরম্ভক সংযোগ বিনষ্ট না হলে বস্তুটি লয়প্রাপ্ত হয় না। বৈশেষিক মতে পরমাণু-সংযোগই সাবয়ব বস্তুর মূল কারণ। সমস্ত পদার্থের মধ্যে সাবয়ব বস্তু কেবলমাত্র চতুর্বিধ দ্রব্য—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। এই সাবয়ব দ্রব্যই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। সাবয়ব দ্রব্যের গুণসমূহও দ্রব্যের মতোই উৎপত্তি ও বিনাশশীল। নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে অবশিষ্ট দ্রব্য আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন এবং পরমাণু নিরবয়র বলে নিত্য। সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশ এই চতুর্বিধ দ্রব্য ও দ্রব্যের সমন্বয়ে গঠিত সাবয়ব জগতেরই সম্ভব। দ্রব্যের মৌলিক উৎপত্তি দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সম্পাদিত হয় এবং ক্রমে সাবয়ব বস্তু উৎপন্ন হয়। বস্তু বিনাশের সময়ও সংযুক্ত অবয়ব সমূহের পরস্পর বিয়োজন হবে এবং প্রত্যেকটি অবয়বের বিভাগ ক্রমে পরমাণুতে পর্যবসিত হবে। বস্তু উৎপন্ন হয়ে বিনষ্ট হয়। জগৎ একটি উৎপন্ন সাবয়ব বস্তু, তাই তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বস্তুর ব্যষ্টিগত বিনাশকে সমগ্র জগতের বিনাশ বলা চলে না। কয়েকটি বস্তুর বিনাশ হলেও অন্যান্য অসংখ্য

সাবয়ব বস্তু বিদ্যমান থাকে বলে ব্যষ্টির বিনাশকে সমষ্টির বিনাশ বলা যায় না। কিন্তু যখন সমষ্টিগতভাবে যাবতীয় সাবয়ব বস্তু বিনষ্ট হয় সেই সমূহ বিনষ্টিকে বলা হয় 'মহাপ্রলয়'। কিন্তু যুগপৎ সমস্ত সাবয়ব বস্তুর বিনাশের উপযোগী অবয়ব সংযোগের বিভাগ কী করে সম্ভব তাই হল প্রশ্ন। প্রশস্তপাদের মতে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই যুগপৎ সমূহ বস্তুর বিনাশ বা মহাপ্রলয় ঘটে। পরমেশ্বরের এরকম একটা ধ্বংসেচ্ছা কেন হয় তার উত্তরে প্রশস্তপাদ সৃষ্টি-সংহার প্রক্রিয়ার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। সৃষ্টি তাঁর মতে ঈশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছা-সিদ্ধ এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে জগতের সমূহ বিনাশ হয়, সমস্ত ভূত-ভৌতিক জগৎও বিনষ্ট হয়। মহাপ্রলয়ও পরমেশ্বরের ইচ্ছা-সিদ্ধ। জগতের সাংগঠনিক রূপদান করেন পরমেশ্বর-সৃষ্ট একজন ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ব্রাহ্মমানের একশ বছর।[১৮]

ব্রাহ্মমানের একশ বছর অতিক্রান্ত হলে দীর্ঘকাল সংসার যাত্রায় পরিশ্রান্ত জীবের বিশ্রামের জন্যই ব্রহ্মার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের সংহারেচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদির আরম্ভকরূপ অদৃষ্টের-কার্যকারিতা শক্তিহীন অবস্থায় থাকে এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সাবয়ব বস্তুসমূহের আরম্ভক সংযোগের বিনাশ হয়ে পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। এই ইচ্ছে মহাপ্রলয়।

তারপর আবার কর্মফলভোগের দ্বারা জীবের বন্ধন-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক সংকল্পের উদয় হয় এবং ঐ সংকল্প অনুসারে পরমাণুসমূহের ক্রিয়ার সংযোগ ঘটে এবং জগৎ সৃষ্টি হয়। এ হচ্ছে প্রশস্তপাদ বর্ণিত সৃষ্টি-সংহার প্রকরণের অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিরবণ।

এ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার প্রক্রিয়ার আলোচনা করলে বোঝা যায়, সৃষ্টির জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় পরমাণু-সংযোগ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়। সৃষ্টির মূলে এই যে পরমাণু-সংযোগের ক্রিয়া তার প্রয়োজক রূপে ঈশ্বরই জগৎসৃষ্টির কর্তা। বৈশেষিক-সম্মত এই সৃষ্টি-প্রণালীতে

১৮। ব্রাহ্মমান সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত রয়েছে যে, আমাদের পৃথিবীর এক বছরে পিতৃলোকের একদিন। পিতৃলোকের একবছরে ঋষিলোকের একদিন। ঋষিলোকের একবছরে গন্ধর্বলোকের একদিন। গন্ধর্বলোকের একবছরে দেবলোকের একদিন। দেবলোকের ৪৮ হাজার বছরে ব্রহ্মলোকের একদিন। এরূপ দিনের একশ বছরে একজন ব্রহ্মার স্থিতিকাল নির্ধারিত। (**ব্রাহ্মমান; শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু; বিশ্বকোষ**।)

ঈশ্বরের একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে। কারণ জীবের ভোগজনক অদৃষ্ট অনুসারে ভোগ্য-পদার্থরূপে জগৎসৃষ্টি আবশ্যক—এই হচ্ছে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত।

প্রলয়কালে নিশ্চয়ই পরমাণুসমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। অন্যথায় প্রলয়কালে যদি পরমাণুসমূহের ক্রিয়া অব্যাহত থাকে তবে পরমাণু-সংযোগ হবেই। ফলে পরমাণু-সংযোগ থেকে স্বাভাবিক পরিণাম অনুসারে সাবয়ব দ্রব্যাদি উৎপন্ন হতেই থাকবে এবং এভাবে সর্বদা পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হলে প্রলয় সম্ভব হয় না। তাই যদি জগৎ অন্তত: আংশিকভাবেও সর্বদাই বিদ্যমান থাকে তবে মহাপ্রলয় সিদ্ধ হয় না।[১৯] উৎপন্ন ভাববস্তুর অবশ্য-বিনষ্টির নিয়ম অনুসরণ করে বৈশেষিকগণ মহাপ্রলয়ের কথাই বলে থাকেন। তাঁদের মতে এবং সাধারণভাবে ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর অনন্ত শক্তির আধার।[২০] ঈশ্বর তাই অসংখ্য কার্য-সৃষ্টির ব্যাপারে নিয়ত সমর্থ। অতএব ঈশ্বরেচ্ছা অর্থাৎ সমস্ত বস্তু উৎপাদনের অভিলাষ তাঁর নিত্যই রয়েছে এবং সৃষ্টির জন্য সহকারী কারণ রূপে স্বীকৃত দিক্, কাল এবং জীবের ভোগাদৃষ্টও সর্বদা বিদ্যমান। তাহলে সৃষ্টি নিয়ত বিদ্যমান থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাহলে প্রলয় কেমন করে সম্ভব? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় যে ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি নিয়ত বিদ্যমান থাকলেও কখনও কখনও ঈশ্বরের সংহারেচ্ছাও দেখা দেয় বলে সৃষ্টির বিনাশ বা প্রলয় সম্ভব। এই জন্যই ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলেছেন যে, সংসার-প্রবাহে পতিত জীবের পরিশ্রম দূর করার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করে ঈশ্বরের সংহারেচ্ছা দেখা দেয়।[২১]

জীবের প্রয়োজনেই সংহার বা প্রলয়ের আবশ্যকতা—এই হচ্ছে বৈশেষিক অভিমত। ব্রাহ্মমানের শতবর্ষ পূর্ণ হলে ব্রহ্মার অপবর্গ লাভ হয়, সুতরাং ঐ সময়ে আরেকজন ব্রহ্মার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত

১৯। নব্য নৈয়ায়িকগণ '**মহাপ্রলয়**' স্বীকার করেন না। তারা '**খণ্ডপ্রলয়**' বা '**আংশিক প্রলয়**' স্বীকার করেন।

২০। সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিদিজ্ঞাঃ, ষড়াহুরঙ্গানিমহেশ্বরস্য।।
(বিষ্ণুপুরাণ)

২১। 'সংসারখিন্নানাং সর্বপ্রাণিনাং নিশিবিশ্রামার্থং সকলভুবনপতেঃ মহেশ্বরস্য সঞ্জিহীর্ষা সমকালম্' ইত্যাদি; (প্রশস্তপাদভাষ্য; সৃষ্টি-সংহার প্রকরণ; পৃঃ ১২২; সূত্র-পূর্ববৎ)।

সাবয়ব দ্রব্যের সাংগঠনিক কর্তা না থাকায় সৃষ্টি সম্ভব নয়।[২২] সুতরাং সাবয়ব বস্তুসমূহের যুগপৎ বিনাশ কোনো একটি সময়ে অবশ্যম্ভাবী। ঐ সময়ে জীবের ভোগাদৃষ্ট স্তব্ধ হয়ে থাকে। দিক, কাল প্রভৃতি সহকারী কারণ সমূহ নিত্য হলেও পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ঐ সময়ে অন্য সৃষ্টি হয় না ও প্রলয় ঘটে।[২৩] সুতরাং জীবের অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছাতে অকার্যকর হয়ে যায় ; তাই সংহারও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। সুতরাং সৃষ্টির জন্য যেমন ঈশ্বর প্রয়োজন, সংহারের জন্যও তেমনি ঈশ্বর প্রয়োজন

'ন্যায়কন্দলী'-টীকাকার শ্রীধরাচার্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ হিসাবে আগম অর্থাৎ শাস্ত্র ও অনুমান দুয়ের কথাই বলেছেন। শ্রুতিকেই আগম বা শাস্ত্রপ্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, এই শ্রুতিটি হল—'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।' (কঠোপনিষৎ ২।১।১)। এই শ্রুতির অর্থ হল, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর বিনাশ করেছেন ; সুতরাং জীব বহির্বিষয় সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নয়। এই শ্রুতিতে ঈশ্বর কর্তৃক ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কোনো পদার্থ নির্মাণ করতে হলে নির্মাতার নির্মাণযোগ্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক। তাই অতীন্দ্রিয়-চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির স্রষ্টার পক্ষেও ঐ সব বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং এই সব ইন্দ্রিয়ের রচয়িতা হলেন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর—এই হল 'ন্যায়কন্দলী'-কারের বক্তব্য।[২৪]

এভাবে শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সাধন করে অনুমান প্রমাণের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি করা হয়েছে। সেই অনুমানটি হল : পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত চতুষ্টয় একজন উপলব্ধি-সম্পন্ন কর্তার দ্বারাই উৎপাদিত ; কেননা তা কার্য। ঘট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট কার্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বলা যায় যে, কার্যদ্রব্য সেই সেই কার্য বিষয়ে অভিজ্ঞ

২২। 'ব্রাহ্মেণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্তমানস্য ব্রহ্মণঃ অপবর্গকালে' ......ইত্যাদি (**প্রশস্তপাদভাষ্য** ; ; সূত্র—পূর্ববৎ)।

২৩। *যদ্যপি যুগপদ্যত্মানাসংখ্যেয় কার্যোৎপত্তৌ ব্যাপ্রিয়মানা দিগাদিবৎ নিত্যত্বাৎ* একৈব ঈশ্বরেচ্ছা ক্রিয়াশক্তিরূপা, তথাপি এষা তৎ তৎ কালবিশেষসহকারিপ্রাপ্তৌ কদাচিৎ সংহারার্থা ভবতি, কদাচিৎ সৃষ্টার্থা ভবতি। যদা সংহারার্থা তদা তদনুরোধাৎ অদৃষ্টানাং বৃত্তিনিরোধঃ ঔদাসীন্য লক্ষণো জায়তে। (ন্যায়কন্দলী টীকা, পৃঃ ১২৭-২৮ ; সূত্র-পূর্ববৎ)।

২৪। 'অনববোধে চ তেষাং নাধিষ্ঠাতার ইতি তেভ্যঃ পরঃ সর্বার্থদর্শিসহজজ্ঞানময় কর্তৃস্বভাবঃ কোহপি অধিষ্ঠাতা কল্পনীয়ঃ' (ন্যায়কন্দলী টীকা ; পৃষ্ঠা-১৪১ ; সূত্র-পূর্ববৎ)।

একজন কর্তার দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। তাই পৃথিবী জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি মহাভূত কার্যদ্রব্য বলেই এই সমস্ত বস্তুর বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন কর্তা রয়েছেন তা অবশ্য-স্বীকার্য। এই কর্তাই ঈশ্বর।[২৫]

এই অনুমান সম্পর্কে প্রশ্ন হল, পৃথিবী প্রভৃতি চারটি মহাভূত কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন বলে তার কর্তা রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন। এই অনুমানে পক্ষরূপে নির্দিষ্ট পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় যদি উৎপন্ন বলে প্রমাণিত হয় তা হলে ঐ পক্ষে কার্যত্ব নামে হেতু থাকতে পারে। আর যদি উক্ত ভূতচতুষ্টয় কার্য বলে প্রমাণিত না হয় তবে উক্ত পক্ষে কার্যত্ব হেতু থাকতে পারবে না; তার ফলে 'স্বরূপাসিদ্ধি'[২৬] নামক হেত্বাভাস ঘটবে। তাই এই দুষ্ট অনুমান অভিমত সাধ্যের উৎপাদনে ব্যর্থ হবে। তাই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় যে কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন তা-ই প্রমাণ করতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় সাবয়ব বলে তা কার্য। কারণ ঘট প্রভৃতি সাবয়ব বস্তু যে কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন, তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং যা সাবয়ব তা-ই কার্য এ ব্যাপ্তি অনুসারে পৃথিবী প্রভৃতি সাবয়ব বলে তার কার্যত্ব সিদ্ধ হবে।[২৭]

পরবর্তী প্রশ্ন হল, ব্যাপ্তিজ্ঞান থেকে অনুমান হয়। তাই প্রদর্শিত অনুমানে যা সাধ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে তার সঙ্গে কার্যত্ব নামক হেতুর ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব কিনা তাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রদর্শিত অনুমানে 'উৎপাদ্য বিষয়ের জ্ঞানশালী ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত' (উপলব্ধিমৎপূর্বকম্) এ অংশটি সাধ্যরূপে নির্ধারিত। সুতরাং এ সাধ্যের সঙ্গে কার্যত্ব নামক হেতুর ব্যাপ্তিজ্ঞান যে ভাবে হওয়া সম্ভব তা হল ঃ যেখানে কার্যত্ব থাকে সেখানে 'উপলব্ধিমৎপূর্বকত্ব' থাকবে। কিন্তু এরূপ ব্যাপ্তি সম্ভব নয় কারণ ঘট প্রভৃতি সাবয়ব বস্তুর একজন নির্মাণকর্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে ঐ সমস্ত স্থলে কার্যত্বের সঙ্গে 'উপলব্ধিমৎপূর্বকত্বের' সাহচর্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ হলেও বীজ থেকে উৎপন্ন

২৫। মহাভূতচতুষ্টয়মুপলব্ধিমৎপূর্বকং কার্যত্বাৎ, যৎ কার্যং তদুপলব্ধিমৎপূর্বকং, যথা ঘটঃ। কার্যঞ্চ মহাভূতচতুষ্টয়ং, তস্মাদেতদপি উপলব্ধিমৎপূর্বকম্। (ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৩৩, সূত্র পূর্ববৎ)

২৬। যে হেতু পক্ষে থাকে না সেই হেতুর দ্বারা অনুমান করলে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস ঘটে।

২৭। যৎ সাবয়বং তৎ কার্যং, যথা ঘটঃ; সাবয়বঞ্চ পৃথিব্যাদি, তস্মাদেতদপি কার্যমেব। **ন্যায়কন্দলী; সৃষ্টি-সংহার প্রকরণ**, পৃঃ ১৩৪; সূত্র-পূর্ববৎ।

অঙ্কুর প্রভৃতি কার্যবস্তুর স্থলে বহুক্ষেত্রেই এরূপ কোনো কর্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নন। তাই সাবয়বত্ব বা কার্যত্ব হেতু অঙ্কুর ইত্যাদিতে থাকায় এবং সেখানে উপলব্ধিমৎপূর্বকত্ব না থাকায় কার্যত্ব হেতুর সঙ্গে উপলব্ধিমৎপূর্বকত্বের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। ফলে এই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে আশ্রয় করে প্রদর্শিত অনুমান সম্ভব হতে পারে না। তার উত্তরে বলা হয় যে, যা কার্যবস্তু তার একজন কর্তা রয়েছেন একথা ভূয়োদর্শন ও যুক্তিসিদ্ধ। কর্তা ব্যাতীত কার্যসিদ্ধ হয় না। কর্তা না থাকলেও যদি কার্য থাকত তা হলে কার্যের জন্য কোনো কারণের অপেক্ষাও সিদ্ধ হত না এবং কারণবিহীন কার্য সম্ভব হত। যার কারণ নেই তা স্বয়ম্ভূ বলে নিত্য হবে—তখন তাকে কার্য বলা চলে না। অতএব সাধারণ এই যুক্তিতেই বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি কার্যেরই একজন কর্তা আছেন একথা ঠিক, কিন্তু এই কর্তা সর্বত্র প্রত্যেক্ষগোচর হবেন এমন কোনো নিয়ম নেই। শুধু শরীরধারী কর্তাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; কিন্তু কর্তা শরীরধারী না হলে কর্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হন না। বহুকাল পূর্বে নির্মিত একটি বস্তু বর্তমানে কার্য বলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হলেও তার নির্মাতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নন বলে ঐ বস্তুটির কোনো কর্তা নেই একথা বলা যায় না। ঐ ক্ষেত্রে বস্তুর সাবয়বত্বের জন্য কার্যত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে তা কর্তৃজন্য একথা যুক্তিসিদ্ধ হবে। কর্তা প্রত্যেক্ষের যোগ্য নয় বলে বস্তু-নির্মাতার প্রত্যক্ষ হল না বলে বস্তুটিকে অকর্তৃক বলা চলে না। ফলে বলতেই হয়, যা সাবয়ব তা কার্য এবং যা কার্য তার একজন কর্তা রয়েছেন। কর্তার প্রত্যক্ষ না হলেই যুক্তিসিদ্ধ বস্তুর অস্তিত্বের অপলাপ করা সম্ভব নয় ; কারণ বহু ক্ষেত্রে বস্তু বিদ্যমান থাকলেও নানা কারণে তার প্রত্যক্ষে বাধা ঘটতে পারে। 'সাংখ্যকারিকা'-তে সম্ভাব্য এরকম আটটি প্রতিবন্ধকের কথা বলা হয়েছে ; সেগুলো হল,—অতি-দূরত্ব, অতি-সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অশক্তি, অন্যমনস্কতা, বস্তুর সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভবত্ব (অধিকতর প্রভাদীপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে হীনপ্রভ অবস্থায় থাকা) এবং তুল্য বস্তুর সংমিশ্রণ।[২৮] *সুতরাং কর্তা থাকলেই তা প্রত্যক্ষ হবে এমন কোনো কথা নেই এবং প্রত্যক্ষ হয় না বলেই কর্তা নেই একথা বলা চলে না।*

২৮। অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যদ্ব্যবধানাভিভবাৎ সমানাদভিহারাচ্চ।।
(সাংখ্যকারিকা-৭)

সমস্ত কার্যবস্তুই কোন না কোন শরীরধারী কর্তৃক নির্মিত এরূপ ব্যাপ্তি যদি অভিপ্রেত হত তা হলেই প্রতিবাদীর আপত্তি গ্রাহ্য হত। কিন্তু এখানে 'শরীরধারী কর্তৃক নির্মিত' একথা অভিপ্রেত নয় বরং 'কার্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্মিত' তা-ই হচ্ছে লক্ষ্য। সুতরাং যেখানে কর্তা শরীরধারী হবেন, সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ-যোগ্য বলেই তার প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু কর্তা যদি ইন্দ্রিয়াতীত হন তবে প্রত্যক্ষ হয় না, বলেই কর্তার অভাব রয়েছে একথা বলা চলে না।[২৯] যেখানে কর্তা প্রত্যক্ষ-যোগ্য উপাদানের সাহায্যে কার্য নির্মাণ করেন সেখানে কর্তা শরীরধারী হতে পারেন কিন্তু বৈশেষিক মতে পৃথিবী প্রভৃতি চারটি মহাভূতের উপাদান সূক্ষ্ম পরমাণু। এ পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয় অতএব শরীরধারী কর্তার পক্ষে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের উপাদান-কারণের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়; অথচ পরমাণুসমূহ দ্বারা দ্ব্যণুকাদিক্রমে নির্মিত যাবতীয় বস্তুই কার্যদ্রব্য বলে তার একজন কর্তা অবশ্যই রয়েছেন, সুতরাং সেই কর্তা শরীরধারী নন। কর্তা হলেই শরীরধারী হবেন এমন কোনো নিয়ম নেই। কোনো কার্যনির্মাণ করার পদ্ধতি আলোচনা করলে ঐ কার্যোৎপত্তির একটি সুসংবদ্ধ প্রণালী জানা যায়। একজন কর্তা নিশ্চয়ই থাকা চাই; বাঞ্ছিত কার্যনির্মাণের উপযোগী বস্তুসমূহ চাই, বস্তুটির নির্মাণ কৌশল কর্তার জানা থাকা চাই, 'আমি এ বস্তুর সাহায্যে এ কার্য করতে চাই' এরকম একটা ইচ্ছা কর্তার থাকা চাই; তারপর প্রয়োজন প্রযত্ন অর্থাৎ প্রচেষ্টার কার্যোপযোগী ব্যবহারের; এভাবেই কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কার্যোৎপত্তির আগে একজন সচেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়, কর্তা ছাড়া কার্য হয় না—এটা যুক্তিসিদ্ধ। কর্তা শরীরধারী না অশরীরী তা এখানে বিচার্য নয়।

বৈশেষিক মতে বুদ্ধিমান কর্তার প্রয়োজনই স্বীকার্য, কর্তা শরীরী না অশরীরী, সে বিচার অপ্রাসঙ্গিক। কারণ বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি

২৯। *নাত্র শরীরপূর্বকত্বং সাধনীয়ম্; শবীরে সতি অবশ্যমিন্দ্রিয়প্রাপ্তৌ* অতীন্দ্রিয়োপাদানোপোকরণাদিকারকশক্তি পরিজ্ঞানাসম্ভবে সতি কর্তৃত্বাসম্ভবাৎ। অশরীরপূর্বকত্বঞ্চ অশক্যসাধনম্, সর্বোহপি কর্তাকাবকস্বরূপমবধারয়তি, ততঃ ইচ্ছতি অহমনেন নিবর্তয়ামি ইতি, ততঃ প্রযততে তদনুকার্যং ব্যাপারয়তি ততঃ কাবণানি অধিতিষ্ঠতি ততঃ করোতি, অনবধাবয়ন্ অনিচ্ছন্ অপ্রযতমানঃ কার্যম্ অব্যাপারয়ন্ ন করোতি ইতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ বুদ্ধিমচ্ছরীরমপি কর্যোৎপত্তৌ উপায়ভূতম্। (**ন্যায়কন্দলী**; পৃঃ ১৩৬-৩৭, সূত্র-পূর্ববৎ)।

কার্যনির্মাণের উপযুক্ত সমস্ত কারণাদি বিদ্যমান থাকলেই হয়। বৈশেষিক মতে বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি আত্মার বিশেষ গুণ ; কর্তা শরীরী হলে এ কার্যনির্মাণক্ষম গুণ শরীরের নয়, তা আত্মারই গুণ। তাই যে আত্মার শরীর সম্বন্ধ নেই অর্থাৎ অশরীরীর পক্ষেও বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রযত্ন থাকা সম্ভব বলে তাঁর কর্তৃত্বের হানি হয় না।

প্রতিবাদীরা আবার বলবেন, ক্রিয়ানুষ্ঠান শরীর ভিন্ন সম্ভব নয় ; আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শরীর-সাধ্য। তাই ঈশ্বর শরীরধারী কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার সেই একই সমস্যা দেখা দেয়। ঈশ্বর শরীরধারী হলে ক্রমানুসারে অন্যতর ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। অন্যদিকে ঈশ্বর শরীরধারী হলে তার নিত্যত্ব থাকে না। ঈশ্বরবাদীরা জগৎ-কর্তা রূপে ঈশ্বর স্থাপনের জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করেন 'জগৎ সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ', প্রতিবাদীরাও তার বিপরীত অনুমান উপস্থিত করে জগৎ কর্তৃজন্য নয় একথা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তাঁরা বলেন, জগৎ কোনো শরীরধারী কর্তৃক উৎপন্ন নয় বলে তা কর্তৃজন্য নয়। কারণ, যা শরীরধারী কর্তৃক উৎপন্ন হয় না তা কার্য নয়। আকাশ, আত্মা, কাল, দিক প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। তাদের যুক্তিটি হল, 'জগৎ অকর্তৃকং শরীরাজন্যত্বাৎ আকাশাদিবৎ' ; সুতরাং সিদ্ধান্তী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষে পরস্পর বিরোধী দু'টি অনুমানই সম্ভব বলে সিদ্ধান্তীর নিজপক্ষ সিদ্ধ হবে না। কারণ এতে 'সৎ প্রতিপক্ষ'[৩০] হেত্বাভাস ঘটবে।

ঈশ্বরবাদীরা বলেন, প্রতিবাদীর প্রদর্শিত অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নয় ; কেন না শরীরধারী কর্তৃক উৎপন্ন না হলেই তা অকর্তৃক হবে এমন কথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ কর্তৃত্ব যদি একান্তভাবে শরীর ধারণের ওপর নির্ভরশীল হয় তা হলেই প্রতিবাদীর যুক্তি গ্রাহ্য হত। কিন্তু যা শরীরাজন্য অর্থাৎ শরীরধারী কর্তৃক উৎপন্ন নয় তা সর্বত্রই অকর্তৃক হবে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। কারণ ঘট প্রভৃতি কার্যবস্তুর দৃষ্টান্তের দ্বারা সমস্ত কার্যই কর্তৃজন্য তা সিদ্ধ হয়, কিন্তু সমস্ত কার্যই

৩০। 'সাধ্যাভাব-সাধকং হেত্বন্তরং যস্য স সৎপ্রতিপক্ষ' ; অর্থাৎ পর্বতে ধূম দেখে কেউ অনুমান করলন যে পর্বতে অগ্নি রয়েছে, কিন্তু একই সময়ে জল দেখে অন্য কেউ অনুমান করলেন যে 'পর্বতে অগ্নি নেই'—এখানে একই পর্বতরূপ পক্ষে একই সময়ে অগ্নি ও অগ্নির অভাব এই দু'টি সমান শক্তিমান হেতুদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে একটি অনুমান অপরটির **সৎপ্রতিপক্ষ**। এখানে দু'টি অনুমানে প্রত্যেকটির সৎপ্রতিপক্ষ আছে বলে কোনোটির সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য নয়।

শরীর—জন্য তা সিদ্ধ হয় না; অর্থাৎ শরীর বিশিষ্ট কর্তাই কার্যের জনক ঘটাদি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। কার্যের অনুকূল নিজ প্রযত্নের দ্বারা কার্যের অন্যান্য কারক সমূহের প্রেরকত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্নবান কর্তৃত্বই শুধু ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধ হয়। আসলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা 'ক্রিয়ার উৎপত্তি আত্মার প্রযত্নসাধ্য, শরীরসাধ্য নয়'—এই বক্তব্য খণ্ডিত হয় না।

জীবের প্রযত্নের দ্বারা শরীরে ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়ার আগে শরীরে কোনো ব্যাপার দৃষ্ট হয় না তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাই জীবাত্মার জ্ঞানের ফলে ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং ইচ্ছা থেকে প্রযত্ন দেখা দেয় ও তার ফলেই শরীরে ক্রিয়া সৃষ্ট হয়। বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে তাই ক্রিয়া নিজের উৎপত্তির জন্য কেবলমাত্র শারীরিক ব্যাপারেরই অপেক্ষা করে না, শরীরে কোন ব্যাপার না থাকলেও আত্মাতে যথাক্রমে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন উৎপন্ন হওয়ার ফলেই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাই যা শরীর-জন্য তা-ই কর্তৃজন্য নয় এ নিয়মের ব্যভিচার শারীরিক ক্রিয়ার উৎপত্তির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। শারীরিক ক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্বে অপর কোনো শারীরিক ক্রিয়া না থাকায় কেবলমাত্র আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নের ফলেই এরূপ শারীরিক ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়ায় ঐরূপ ক্রিয়া শরীরাজন্য হলেও অকর্তৃক নয়। সুতরাং প্রতিবাদী প্রদর্শিত শরীরাজন্যত্ব হেতুর সঙ্গে অকর্তৃকত্ব সাধ্যের ব্যভিচার রয়েছে বলে ব্যাপ্তি সম্ভব নয়। তাই কার্যত্বের সঙ্গে কর্তৃজন্যত্ব অর্থাৎ সকর্তৃত্বের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় বলে তার সাহায্যে নির্বাধে ঈশ্বর সিদ্ধ হন।

বৈশেষিক মতে জীবাত্মার জ্ঞান বিশেষের ফলেই কার্য সম্পন্ন করার ইচ্ছা জন্মে। শারীরিক যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় আত্মাই তার জনক। তাই শারীর ক্রিয়া শরীরাজন্য হলেও অকর্তৃক নয়। এই আলোচনার আলোকে ঈশ্বরের সৃষ্টি নির্মাণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ঈশ্বরের শরীর না থাকলেও তার জ্ঞান, ইচ্ছা প্রযত্ন থাকতে পারে। তার ফলে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। সমগ্র জগতের উপাদানসমূহ অপরোক্ষভাবে যিনি জানেন ও বিচিত্র জাগতিক পদার্থের অদ্ভুত বিন্যাস কৌশল যাঁর আয়ত্ত তাকে সর্বজ্ঞ বলতেই হবে। এই সর্বজ্ঞ আত্মাই বৈশেষিক শাস্ত্রে ঈশ্বর বলে প্রসিদ্ধ। সাধারণ জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে জীবন্মুক্ত অবস্থায় সর্বজ্ঞ হতে পারলেও তাকে নিত্যসর্বজ্ঞ বলা যায় না। তাই একমাত্র 'নিত্য সর্বজ্ঞ'ই ঈশ্বর।[৩১]

৩১। 'তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্যন্বেষা' ইত্যাদি; (**পাতঞ্জলদর্শনম্ সমাধিপাদঃ**; সূত্র—২৫; ব্যাসভাষ্য।)

বৈশেষিক দর্শন সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রশস্তপাদভাষ্য ও আচার্য শ্রীধরকৃত 'ন্যায়-কন্দলী টীকা' অনুসরণ করে এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা আলোচনা করেছি। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখই করেন নি, তা সত্ত্বেও সৃষ্টি ও সংহার কার্য বলে তার একজন কর্তা থাকবেন তা সহজেই পরবর্তী বৈশেষিক আচার্যগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। পরমাণুবাদী মহর্ষি গৌতমের ''ন্যায়সূত্র'' বিচারের সময়ও সৃষ্টি ও সংহার-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য প্রশস্তপাদ-সম্মত পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে দেখা যায়। গৌতমের 'ন্যায়সূত্রে'ও স্পষ্টতঃ সম্মতিসহ ঈশ্বরের অনুল্লেখ লক্ষণীয়। তিনি বেদপ্রবক্তা একজন আপ্তপুরুষের কথাই বলেছেন। এতে করে সে আপ্তপুরুষের সর্বজ্ঞত্ব অনুমিত হয় এবং এ সর্বজ্ঞ আপ্তকাম পুরুষই ঈশ্বর বলে পরবর্তী ন্যায়াচার্যদের কাছে গৃহীত হয়েছেন। তাঁদের মতে, বেদ-বর্ণিত তত্ত্ব থেকে বিষয়ের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানশালী আপ্ত পুরুষের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়, বলেই মহর্ষি কণাদ 'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' এই সূত্রে 'তৎ' শব্দের দ্বারা ঈশ্বর স্বীকার করেছেন একথা অগ্রাহ্য করা কঠিন। তাছাড়া বৈশেষিক দর্শনে কোথাও ঈশ্বর খণ্ডন করা হয়নি বা ঈশ্বরনিষেধ করা হয়নি বলে অন্যমতসিদ্ধ ঈশ্বর তিনি স্বীকার করতেন এটা বলার পক্ষেও বাধা হয় না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই, পরবর্তী বৈশেষিক আচার্যবৃন্দ যেভাবে ঈশ্বর সিদ্ধি করেছেন তা মহর্ষি কণাদ নির্দেশিত নয়। মহর্ষি কণাদ বিশেষভাবে কেনো ঈশ্বরালোচনা করেন নি এ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হয় দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়—এই ছয়টি পদার্থের সার্ধম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা বিচার-মূলক তত্ত্বজ্ঞান হলেই মোক্ষলাভ সম্ভব এই ছিল কণাদের অভিলষিত প্রতিজ্ঞাসূত্র।[৩২] তারই জন্য ঈশ্বরের প্রণিধানের কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি—এই অভিমত যথার্থ বলে মনে হয়। এই দার্শনিক যুক্তিসহ সত্যজ্ঞান লাভের দৃঢ় প্রত্যয় অভিনন্দনীয় ঋজুতারই দ্যোতক। তারই জন্য মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আলোচনার প্রয়োজনই বোধ করেন নি।[৩৩] কিন্তু মহর্ষি কণাদ প্রথমেই তাঁর প্রতিজ্ঞাসূত্রে বলেছেন,

---

৩২। ধর্মাবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাংপদার্থানাং সার্ধম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎনিঃশ্রেয়সম্। (**বৈশেষিক দর্শন**; প্রথম অধ্যায়; প্রথম আহ্নিক, সূত্র-৪)

৩৩। INDIAN ATHEISM: D. P. Chattopadhyay.

''অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যাম্'' (বৈশেষিক দর্শন, ১।১।১)। অর্থাৎ ধর্ম নিরূপণই মহর্ষির অভিলষিত ; তারই জন্য পরবর্তী সূত্রে বলেছেন, যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহলৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ ও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ হয় তা-ই ধর্ম।[৩৪] তারপরেই ধর্মের প্রমাণ হিসাবে 'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' এ সূত্রের উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায় অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হিসাবে বেদে যা নির্দেশিত তাকেই তিনি 'ধর্ম' বলে গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন সূত্রস্থ 'তৎ' শব্দের দ্বারা 'ধর্ম'-ই নির্দেশিত। তাঁরা বলেন, এই সূত্রের (১।১।৩) ব্যাখ্যা হল, যেহেতু বেদে প্রসিদ্ধ ধর্মের যথাযথ নির্দেশ রয়েছে তারই জন্য বেদের প্রমাণ্য স্বীকার্য অর্থাৎ বেদ-বিহিত বলেই ধর্ম প্রমাণ-সিদ্ধ।[৩৫] এই সূত্রের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রস্থ 'তৎ' শব্দ-সূচিত অর্থ আপ্ত-পুরুষ বা ঈশ্বর নন। 'তৎ' হচ্ছে 'বেদ-বিহিত ধর্ম'। এই ব্যাখ্যা যে সর্ব-সম্মত নয় একথা স্পষ্ট। বেদ বাক্যময় তাই পৌরুষেয় এবং এ পুরুষ ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য বলে বেদ আপ্ত সর্বজ্ঞ পুরুষ-রচিত এটা প্রতিপন্ন ; এভাবেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়েছে। বেদ প্রমাণ হিসেবে সিদ্ধ না হলে বেদ-বিহিত উপায়কে 'ধর্ম' বলে গ্রহণ করা অসম্ভব ; তাই আপ্ত পুরুষের বাক্য বলে বেদ অভ্রান্ত এটা বলতে হয়। তাই সূত্রস্থ 'তৎ' শব্দের অর্থ আপ্ত, সর্বজ্ঞ পুরুষ এই ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই ব্যাখ্যা বেদান্ত দর্শনের শাঙ্করভাষ্য সম্মতও বটে।[৩৬]

তারপর মহর্ষি কণাদ গুণ কর্ম প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন ; কিন্তু সূত্রে কথিত 'ধর্মবিশেষপ্রসূতাৎ' এই উক্তির দ্বারা মহর্ষি বলেছেন, বিশেষ ধর্ম

৩৪। যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম ; (**বৈশেষিকদর্শন** ১।১।২)।

৩৫। ''তদ্বচনাৎ—ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ ; তস্য—উক্ত লক্ষণধর্মস্যবচনং—যথাতথ্যেন প্রতিপাদনমস্তি যত্র, তস্য ভাবতত্ত্বং, তস্মাৎ—তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য—ঋগযজুসামাথর্বনাম্নো ভগবতো বেদস্য প্রামাণ্যং ধর্মে প্রমাণত্বমিত্যর্থঃ।।'' (**বৈশেষিকদর্শন** ১।১।৩ সূত্রের হরিপ্রসাদ স্বামী-কৃত ব্যাখ্যা।)

৩৬। মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। ন হি ঈদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাৎ অন্যতঃ সম্ভবঃ অস্তি। যৎ যৎ বিস্তরার্থং শাস্ত্রং পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেঃ জ্ঞেয়ৈদেশার্থমপি, সঃ ততঃ অপি অধিকতর-বিজ্ঞানঃ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। (**ব্রহ্মসূত্র ; শাংকরভাষ্য ;**)

অর্থাৎ ইহ বা এজন্মে বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুভাদৃষ্ট না জন্মিলে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয়। যুক্তিতর্কের সাহায্যে পদার্থ বিশ্লেষণ করে যে নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে কেবল তা-ই মোক্ষের হেতু হতে পারে না। ধর্ম থাকলেই পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভের উপযুক্ত হবে—এই হচ্ছে মহর্ষির অভিমত।

· তাই সূত্রে যে 'তৎ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে পৌর্বাপর্ব বিচারে তা সর্বজ্ঞ, আপ্ত পুরুষেরই বোধক। কিন্তু দার্শনিক আলোচনাকালে এই সর্বজ্ঞ পুরুষ বা বেদোক্ত উপদেশাবলীর যুক্তিবত্তা প্রমাণ করা মহর্ষি কণাদের অভিলষিত নয় বলেই যা লৌকিক বুদ্ধির সাহায্যে বিচার্য তার অবতারণা তিনি বৈশেষিক সূত্রে করেন নি এই অভিমত সঙ্গত বলেই মনে হয়। বুদ্ধির সাহায্যে যতদূর যাওয়া যায় তিনি ততদূরই অগ্রসর হয়ে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লৌকিক যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে অনুপযোগী বিষয়ের তিনি কোনো আলোচনা তেমন করেন নি। তাছাড়া শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে খণ্ডন না কারায় মহর্ষি কণাদকেও ঈশ্বরবাদী বলে গ্রহণ করা যায়।

ন্যায় মতে ঈশ্বর

মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে ঈশ্বর শব্দের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু এ সূত্র পূর্বপক্ষের অভিমত হিসাবেই প্রদর্শিত, তা গৌতমের সিদ্ধান্ত নয় এরকম কটি বক্তব্যও রয়েছে। আবার গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করেন এই অভিমতও আছে। সূত্রটির প্রারম্ভে 'অথাপর আহ' অর্থাৎ অপর এক সম্প্রাদায় বলেন এরকম উল্লেখ থাকায় প্রথম মতটির যুক্তিগ্রাহ্যতা বেড়েই যায়। যাই হোক, সূত্রটি হল ঃ ''ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফিল্যদর্শনাৎ'' (**ন্যায়সূত্র**; ৪।১।১৯)। এই সূত্রের সরলার্থ হচ্ছে, ঈশ্বর জগতের কারণ কেননা জীবের কর্মানুষ্ঠানের বৈফল্য দেখা যায়। এই উক্তির তাৎপর্য হল, জীবের কর্ম-নিরপেক্ষ একমাত্র ঈশ্বর জগতের কারণ নন কেননা জীব কোনো কর্ম না করলে কোনো ফল জন্মাতে পারে না। এই উত্তরের মাধ্যমে মহর্ষি এ কথাই বলতে চান যে যদি একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কর্ম-নিরপেক্ষভাবে ফলদান করতেন তাহলে জীব কর্মানুষ্ঠান না করলেও ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে তাকে সুখদুঃখ প্রভৃতি ফল দিতে পারতেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বর

জীবের সুখদুঃখের একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াতেন বলে তাঁর পক্ষপাতিত্ব-দোষ অবশ্যম্ভাবী এবং তাতে করে ঈশ্বরের রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে তাঁকে ঈশ্বরই বলা যায় না। জীবের কর্মসাপেক্ষ হয়ে ঈশ্বর শুভাশুভ ফলদান করেন একথাই গৌতমের অভিমত বলে মনে হয় এবং তারই জন্য পূর্বপক্ষের মত হিসাবে সূত্রটি তিনি উপস্থিত করেছেন। তাই উল্লিখিত ন্যায় সূত্রে (৪।১।১৯) গৌতম ঈশ্বর অস্বীকার করেন নি, শুধু জীবের কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগৎ-কর্তা হতে পারেন না একথাই বলেছেন—এই অভিমতই যুক্তিগ্রাহ্য বলে গণ্য হয়। জীবের কর্মফলানুসারে ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন এ অভিমত বেদান্ত দর্শনেও স্বীকৃত।[৩৭] তাই গৌতম ৪।১।১৯ সূত্রের পরবর্তী দু'টি সূত্রে এই পূর্বপক্ষকেই খণ্ডন করেছেন।

জীব স্বীকৃত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যথাবিহিত সুখ-দুঃখ ভোগ করে একথা স্বীকার না করলে সংসারের অসংখ্য জীবের বিচিত্র ভোগাদৃষ্টের ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। কেননা, ঈশ্বরই যদি জগতের একমাত্র কারণ হন তাহলে ঈশ্বর ও জগতের স্বরূপ অভিন্ন হওয়ায় বৈচিত্র্য অসম্ভব হত, কেননা একই কারণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় কার্যোৎপত্তি হয় না। এই বিষয়ে **উদ্যোতকর** তাঁর ন্যায়বার্তিকে বলেছেন ঃ জীবের কর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বরকে যারা কারণ বলে স্বীকার করেন তাদের মতে মোক্ষের অভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে; কিন্তু ঈশ্বরকে জীবের কর্মসাপেক্ষ ফলদাতা হিসাবে দেখলে এই অসুবিধা হয় না। তাহলে একথা বোঝা যায় যে জীবের দুঃখজনক কর্মবশতঃ ঈশ্বর জীবের দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করেছেন। তাই যার সমস্ত অদৃষ্ট ধ্বংস হয়, তার আর কোনো দিনই দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে না বলে তার দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ বা মোক্ষ সম্ভব হবে। উদ্যোতকরের এ আলোচনা থেকেও একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জীবের কর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ এই অভিমত খণ্ডন করাই সূত্রটির অভিলষিত লক্ষ্য।

বাচস্পতি মিশ্র 'তাৎপর্য টীকায়' বলেছেন মহর্ষি এ সূত্রের দ্বারা শুধু যে 'কর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ' এই অভিমত খণ্ডন করেছেন তা নয় বেদান্ত-সম্মত ব্রহ্ম-বিবর্তবাদ এবং সাংখ্যসম্মত

৩৭। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।

(**ব্রহ্মসূত্র**, ২।১।৩৪)

ব্রহ্ম-পরিণামবাদ এ দু'টি প্রসিদ্ধ অভিমতও খণ্ডন করেছেন। মহর্ষি গৌতম এ সূত্রের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নন, ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র। এই 'ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ-বাদই' ন্যায়-সম্মত সিদ্ধান্ত। বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন এই সূত্রে মহর্ষি 'জীবের কর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ' এ ত্রুটিপূর্ণ অভিমতও খণ্ডন করেছেন; তারই জন্য 'ন্যায়দর্শনের' পরবর্তী ৪।১।২১ সূত্রে "তৎ কারিত্বাৎ অহেতুঃ" এই উক্তির সাহায্যে উল্লিখিত তিনটি খণ্ডনযোগ্য মতবাদ 'ব্রহ্ম পরিণামবাদ' 'ব্রহ্ম বিবর্তবাদ' ও 'কর্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর নিমিত্তকারণবাদ' খণ্ডন করে নিজের অভিমত সিদ্ধান্তটি উপস্থিত করেছেন।[৩৮]

কর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ নন এ মহর্ষি-সিদ্ধান্ত সমর্থন করে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন, বিশেষ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই ঈশ্বর। সেই আত্মার ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রযত্ন এই তিনটি গুণ রয়েছে এবং অধর্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদের অভাব রয়েছে বলে ধর্মজ্ঞান ও সমাধিসম্পদ-বিশিষ্ট আত্মাই ঈশ্বর।[৩৯] এ কথার অর্থ হল অন্যান্য আত্মার অধর্ম, ভ্রম ও প্রমাদাদি রয়েছে বলেই তারা ঈশ্বর হতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, ঈশ্বর যদি শুভ কর্মানুষ্ঠান করে ঐ কর্মের ফলে ধর্ম উৎপন্ন করেন বলে বলা হয় তবে ধর্মের বিপরীত অধর্মের সম্ভাবনাও তো থেকে যায়। তাহলে ঈশ্বরকে অন্যান্য জীব থেকে বৈলক্ষণশালী বলা চলে না। এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন, ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্মই প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টকে ও পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গকে সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্ত করে।[৪০] এই বক্তব্যের নিহিতার্থ হল, ঈশ্বরের স্বকীয় সুখদুঃখাদির কোনো অভিলাষ নেই। এই অভিলাষ তাঁর পক্ষপাতিত্ব দোষেরই হেতু হয়ে দাঁড়ায়। তবে সুখদুঃখের অভিলাষ নেই বলেই ঈশ্বরের সাধারণ জীবের মতো কোনো কর্মানুষ্ঠান নেই; তাই ঈশ্বরের কর্মানুষ্ঠান-জনিত ধর্ম সম্ভব নয়। তাছাড়া ন্যায়াচার্যদের মতে ঈশ্বরের

৩৮। ন্যায়সূত্রের ৪।১।২০ সূত্রের বার্তিক তাৎপর্য টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের এই অভিমত আলোচিত হয়েছে।

৩৯। গুণবিশিষ্টম্ আত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্যাত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ। (ন্যায়দর্শন; ৪।১।২১ সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

৪০। সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্মঃ। (সূত্র—পূর্ববৎ)।

অষ্টৈশ্বর্য অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, রাশিত্ব, ঈশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব রয়েছে[৪১] ; তাই ঈশ্বরের কর্মাদৃষ্ট হয় না।

কিন্তু ঈশ্বরের কোনো কর্মানুষ্ঠান না থাকলে তাঁর কোনো ধর্ম হতে পারেনা, তাহলে ধর্ম ব্যাতীত আণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য থাকলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অকৃতকর্মের ফলপ্রাপ্তির আশঙ্কা হয় ; তারই জন্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম প্রত্যেক জীবের ধর্মাধর্ম সমষ্টি ও ভূতবর্গকে সৃজনোন্মুখ করে তোলে। সুতরাং ঈশ্বরের বাহ্যিক কর্ম না থাকলে সৃষ্টির পূর্বে তাঁর যে সংকল্প জন্মে তা-ই ধর্মের কারণ এবং ঐ ধর্ম-বিশেষের ফলেই তাঁর অণিমাদি ঐশ্বর্য হয় ও ঐশ্বর্যের ফলেই প্রাকাম্য বা ইচ্ছামাত্র জগৎ নির্মাণ ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের ধর্মকে সংকল্প-জনিত বলে বর্ণনা করায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অনিত্য বলে স্বীকৃত হয়। কারণ ধর্ম অনিত্য হলে ধর্মের ফল ঐশ্বর্যও অনিত্য হবে। উদ্যোতকর তার 'বার্তিক টীকায়' ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে 'নিত্য' বলেছেন ; সুতরাং বার্তিককারের সিদ্ধান্ত ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়ে পড়ে। তাই উদ্যোতকর পরে বলেছেন, ঈশ্বরের ধর্ম তার ঐশ্বর্যের জনক নয়, সৃষ্টির সহকারী কারণ জীবসমূহের অদৃষ্ট সমষ্টির প্রবর্তক মাত্র। নিহিত উদ্দেশ্য হল, মহাপ্রলয়কালে জীবের যে ভোগাদৃষ্ট অপূর্ণ থাকে, প্রলয়-পরবর্তী যথাকালে সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে সেই অবরুদ্ধ ভোগাদৃষ্ট পুনরায় কর্মোন্মুখ হয়ে ওঠে—এই হচ্ছে ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্মের ফল। তাছাড়া প্রলয়কালে পরস্পর বিশ্লিষ্ট যে পরমাণুসমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্মের ফলেই ঐ পরমাণু সমুহের মধ্যে ক্রিয়ার সঞ্চার হয় এবং দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং ঈশ্বরের ধর্ম সাধারণ ধর্মমাত্র নয়, তা ঈশ্বরের সংকল্প জনিত সমস্ত সৃষ্টির একটি শক্তি বিশেষ মাত্র। উদ্যোতকর তাঁর বার্তিকের টীকায় বলেছেন—প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কোনো ধর্ম নেই। বাচস্পতি **তাৎপর্য টীকা-য়** বলেছেন ঈশ্বরের ধর্ম স্বীকারের কোনো আবশ্যকতাই নেই। ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি নিত্য, এই শক্তি দু'টিই তাঁর ঈশনা বা নিত্য-ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য অণিমাদি থেকে স্বতন্ত্র ; বস্তুতঃ ঈশ্বরের সংকল্প-জনিত ধর্মই অণিমাদি ঐশ্বর্যের কারণ। ন্যায়দর্শনের ৪।১।২১ সূত্রের বার্তিক তাৎপর্য টীকায় এই অভিমতই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৪১। অষ্টৈশ্বর্য সংক্রান্ত আলোচনা ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-এর **'ন্যায়দর্শন'**, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য।

তাহলে প্রশ্ন, ঈশ্বরের এ জ্ঞান ইচ্ছা যদি নিত্যই হয় তবে প্রলয়কালে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা কিভাবে বিদ্যমান থাকে? তার উত্তরে ''ন্যায়মঞ্জরী''-কার জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান যদি নিত্য না হয় তবে একটি বিশেষ সময়ে ঈশ্বরকে অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানহীন বলে স্বীকার করতে হয়। ফলে সৃষ্টিকালে কোনো একটি ক্ষণে ঈশ্বরের ঐ অজ্ঞানতানিবন্ধন তাঁর ইচ্ছা-প্রেরিত হয়ে জীবের বিচিত্র কর্মফল ভোগ স্তব্ধ হয়ে যাবে কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়েই জীবের অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ ফল প্রদানে সক্ষম হয়। সুতরাং ঈশ্বর যখন জ্ঞান-রহিত হবেন সেইক্ষণে জীবের কোনো কর্মফলভোগ সম্ভব হবে না। তা যুক্তি ও অনুভব-বিরুদ্ধ; কেননা যতক্ষণ সৃষ্টি থাকবে ততক্ষণ প্রত্যেক জীবেরই কর্মফল ভোগ করতে হবে—এটা যুক্তিসিদ্ধ। তাই ঈশ্বর কোনো কালেই জ্ঞানশূন্য হতে পারেন না বলে তাঁর জ্ঞান নিত্য।

অনুরূপ যুক্তির সাহায্যেই ঈশ্বরের ইচ্ছাও নিত্য বলে গৃহীত হয়েছে। প্রলয়কালে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা উৎপন্ন বলে স্বীকৃত নয়। যে ভাব-বস্তু উৎপন্ন হয় না, তার বিনাশও হয় না—তাই তা নিত্য। আত্মা এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছে বলা চলে না কারণ পূর্বের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা অনুসারেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। তাই সৃষ্টির পূর্বে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা উৎপন্ন হত তাহলে ঐ ইচ্ছাকে সৃষ্টির আরম্ভ বলে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অনুরূপ ইচ্ছা ঐ সময়েই কেন হবে তার কোন কারণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর নিজেই যদি ঐ ইচ্ছার কারণ হন তা হলে ঈশ্বর নিত্য বলে তাঁর ঐ ইচ্ছাও নিত্য হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমিক বা যুগপৎ হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমিক বলে স্বীকার করলে ইচ্ছার পূর্ব বা পরত্বের কোনো যুক্তি থাকে না। অন্যদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যুগপৎ বলে স্বীকার করলে অতীত, বর্তমান, অনাগত এই ত্রিকালের যাবতীয় ইচ্ছা যুগপৎ উদিত হওয়ায় এবং ঈশ্বরেচ্ছা অমোঘ বলে ইচ্ছা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত পদার্থ সৃষ্টির আবশ্যকতা দেখা দেয়, ফলে অতীত বা অনাগত বলে কিছু থাকে না। অথচ কালত্রয় যুক্তিসিদ্ধ। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা যুগপৎ নয়। সুতরাং ঈশ্বের ইচ্ছা নিত্য—এই হল ন্যায়-সিদ্ধান্ত।

এখানে প্রশ্ন, ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি নিত্যই হয় তাহলে সর্বদা সেই ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে বলে সব সময়ই জগতের উৎপত্তি সম্ভব

হবে—অর্থাৎ অনন্ত জগতের সৃষ্টি হবে। আর সর্বদা জগতের উৎপত্তি হলে কোনো সময়ই জগতের বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় ন্যায়ের যুক্তি-সিদ্ধ প্রলয় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যদি সৃষ্টির ইচ্ছার মতো ঈশ্বরের সংহার বিষয়ক ইচ্ছাও নিত্য হয় তা হলে সংহারও সব সময়ই বিদ্যমান থাকবে। সৃষ্টি ও সংহারের পরস্পর-বিরোধী এই দুটি ইচ্ছা ঈশ্বরে নিত্যই বর্তমান থাকলে সমান শক্তিশালী দুটি ইচ্ছার পারস্পরিক অভিঘাতের ফলে সৃষ্টি সংহার কিছুই হতে পারে না। তাই ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা স্বীকার করার পক্ষে প্রবল বাধা রয়েছে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বরূপতঃ সর্বদা বিদ্যমান থাকলেও এ ইচ্ছার বিশেষ প্রকাশ আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগের অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা নির্দিষ্ট কোন বিশেষ বিষয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত নয়। কিন্তু আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটলে এ ইচ্ছার বিশেষ প্রকাশ ঘটে। প্রলয়কালে এই বিশেষ প্রকাশের কারণ যে মনঃসংযোগ তা থাকে না বলে প্রলয়ের পূর্ব-মুহূর্তে বিশেষ মনঃসংযোগের ফলেই প্রলয় বিষয়ের ইচ্ছার উদয় হয় এবং যথাকালে সৃষ্টির ইচ্ছা যখন ঘনীভূত হয় তখন ঈশ্বরের মনঃসংযোগ ঘটে এবং তারফলেই সৃষ্টি হয়। অন্য সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যবর্তী কালে জগৎপালনের উপযোগী ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বরূপতঃ নিত্য হলেও বিশেষ অভিব্যক্তির ফলেই সৃষ্টি ও সংহার ঘটে থাকে।[৪২]

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন শুধু ঈশ্বরের সংকল্পের কথাই বলেছেন 'সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্মঃ' (৪।১।২১)। অণিমাদি ঐশ্বর্যের কারণ সংকল্পের কথাও এরমাঝে আলোচনা করা হয়েছে। সংকল্প অর্থ ইচ্ছা—এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে শুধু সংকল্পের দ্বারাই ঈশ্বরের পক্ষে সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু সংকল্প শব্দের অর্থ যদি ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ তপস্যা হয় তাহলেও শ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২। ৬ মন্ত্রে বলা হয়েছে 'সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' অর্থাৎ সেই পরমাত্মা কামনা করলেন, 'আমি বহু হব'।

৪২। অনাত্মমনঃসংযোগজত্বাদিচ্ছাস্বরূপমাত্রেণ নিত্যাপি কদাচিৎ সর্গেণ, কদাচিৎ সংহারেণ বা বিষয়েণ অনুরজ্যতে সর্গসংহারয়োরন্তরালে তু জগতঃ স্থিত্যবস্থায়ামস্মাৎ কর্মণ ইদমস্য সম্পাদ্যতামিতি ইচ্ছা ভবতি প্রজাপতেঃ। প্রযত্নস্তস্য সংকল্পবিশেষাত্মকৈব, তথাচাগম সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি। (**ন্যায়মঞ্জরী**, প্রমাণপ্রকরণ, পৃঃ ১৮০ ; চৌখাম্বা সংস্কৃতসিরিজ, বারাণসী ১, ১৯৭১)।

এই প্রসঙ্গেই ঈশ্বরের সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তপস্যার কথাও বলা হয়েছে 'স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদংসর্বমসৃজত' ইত্যাদি ; (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৬)। তার অর্থ হল, তিনি তপস্যা করেছিলেন এবং তপস্যা করেই তিনি এই সমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। মুণ্ডক উপনিষদেও ১। ১।৯ মন্ত্রে 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষই তাঁর তপস্যা একথা বলা হয়েছে। এইসব শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে নৈয়ায়িক আচার্যবৃন্দ বলতে চেয়েছেন পূর্বসৃষ্ট জগতের পর্যালোচনারূপ জ্ঞানবিশেষই ঈশ্বরের তপস্যা, সৃষ্টি কবে প্রথম ঈশ্বর করেছিলেন তা অবান্তর বলে সৃষ্টি অনাদি এই হচ্ছে তাঁদের অভিমত। সংহারকে পৌর্বাপর্য রক্ষার জন্য অনাদি বলে মানা হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন সৃষ্টি সম্ভব নয় একথা 'মনুসংহিতা'-য়ও স্বীকৃত ঃ সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ 'সংকল্পসম্ভবাঃ' (২।৩) ; * এবং এই ইচ্ছার মূলে ঈশ্বরের সংকল্প বিদ্যমান। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি 'সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ'-কেই সংকল্প বলেছেন ; এ জ্ঞান বিশেষকেই স্মৃতিতে তপস্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের সংকল্প জনিত ধর্ম বিশেষের জন্যই সমস্ত জীবের অদৃষ্টশক্তি ও জগতের উপাদান কারণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার ফলে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরের সংকল্প জীবের অদৃষ্ট সমষ্টির মধ্যে এমন একটি বেগ সৃষ্টি করে যার ফলে জগতের উপাদান সমূহ যথাযথ-ভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করে।

এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় ঈশ্বর যদি মুক্তপুরুষই হবেন তা হলে ঈশ্বরের সংকল্প জনিত সৃষ্টিনির্মাণ সম্ভব নয়, কেননা মুক্ত পুরুষের কোনো সংকল্প থাকতে পারে না। আর যদি ঈশ্বর বদ্ধ হন তবে তাঁর ঈশ্বরত্বই থাকে না। ন্যায় ভাষ্যকারের মত আলোচনা করলে মনে হয় ঈশ্বর বদ্ধ নন, মুক্তও নন ; অর্থাৎ ঈশ্বর বদ্ধ ও মুক্ত এ দু'টি থেকে স্বতন্ত্র আত্মা। ঈশ্বরের মিথ্যাজ্ঞান নেই তাই তিনি বদ্ধ নন, অন্যদিকে ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম ও অণিমাদি ঐশ্বর্য উৎপন্ন হয় বলে তাঁকে

***অনুরূপ ঃ**

'এষ আত্মাহপহতপাপ্ম বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং' ইত্যাদি। **(ছান্দোগ্য উপনিষৎ** ৮।১।৫)।

মুক্তও বলা চলে না। ভাষ্যকারের অভিমত হল, যার বন্ধন আছে তারই মুক্তির প্রশ্ন ওঠে; কিন্তু ঈশ্বরের বন্ধন নেই বলেই তাঁকে মুক্তও বলা চলে না। (উদ্যোতকরের ন্যায়বার্তিকে এ ধরনের অভিলাষই দেখা যায়।)

পাতঞ্জল যোগদর্শনের সমাধিপাদে ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত বলা হয়েছে। 'স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি' (২৪শ সূত্র)। কিন্তু 'সাংখ্য প্রবচনসূত্রে' ঈশ্বর অস্বীকার প্রসঙ্গে সূত্রকার বলেছেন ঈশ্বর মুক্ত হতে পারেন না এবং বদ্ধও নন বলে ঈশ্বর সিদ্ধি সম্ভব নয়; কারণ মুক্ত অথবা বদ্ধ দু'টি প্রকার ভিন্ন অন্য কোনো তৃতীয় প্রকার পুরুষ বা আত্মা সিদ্ধ নন। ('মুক্তবদ্ধায়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ সিদ্ধিঃ' ১।৯৩)।

'ন্যায়মঞ্জরী'কার জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়দর্শনের ঈশ্বব স্বীকৃতি সম্পর্কিত অভিমত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সৃষ্টিকার্যের জন্য একজন কর্তা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু সৃজ্যমান পদার্থের উপাদান কারণ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্মাণ কৌশল জানা না থাকলে কর্তা হয় না এবং কর্তা ভিন্ন কোনো কার্য হয় না। তাই সৃষ্টির জন্য একজন কর্তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হয়। এই সৃষ্টিকর্তাকে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের উপাদান কারণ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞানবান হতে হবে। সর্ব বিষয়ে এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানশালী কর্তাকে জগৎস্রষ্টা রূপে স্বীকার করতে হয় এবং তিনি ঈশ্বর। সুতরাং ন্যায়মতে সর্বজ্ঞতা ঈশ্বর-স্বীকৃতির মূল কথা। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য কেন—এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বর যদি বিশেষ একটি ক্ষণেও জ্ঞানহীন হন তাহলে ঐ ক্ষণে জগতের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। আবার প্রলয়কালেও যদি ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যাহত থাকে তাহলে তাঁর ইচ্ছাদিও অব্যাহত থাকবে, তাহলে জগৎ প্রবাহ অব্যাহত থাকায় ন্যায়-সম্মত প্রলয় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই প্রলয়কালে ঈশ্বরের জ্ঞান থাকে না তা স্বীকার করতেই হয় এবং তাহলে ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানশালী থাকেন না। এই সমস্যার সমাধান-কল্পে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান প্রলয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে একথা স্বীকার করলে প্রলয়কালেও ঈশ্বরের জ্ঞান না থাকার কোনোই যুক্তি নেই। বিনাশের কারণ না থাকলে বিনাশ হয় না তাই প্রলয়কালে অন্য কোনো বিনাশক কারণ না থাকায় ঈশ্বরের জ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে একথা বলা চলে না। ন্যায়মতে আত্মা নিত্য পদার্থ, আত্মার বিনাশক কারণ নেই বলে আত্মার বিনাশ সম্ভব নয়—তাই

প্রলয়কালেও ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যাহত থাকে এটা এ যুক্তিতে সাধ্য। পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভকালে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি হলেও প্রলয়কালে অবস্থিত ঈশ্বরের জ্ঞানোৎপত্তির কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপত্তি-বিনাশশূন্য বলেই নিত্য।[৪৩]

জয়ন্ত ভট্টের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান ক্রমিক বা যুগপৎ এ দুটোর কোনোটাই হতে পারে না। জ্ঞান ক্রমিক হলে বর্তমানে অনাগত বিষয়ের জ্ঞান না থাকায় তার সর্বজ্ঞত্বের হানি ঘটে ; আবার ঈশ্বরের জ্ঞান যুগপৎ একথা স্বীকার করলে অতীত, বর্তমান বা অনাগত বিষয়ের জ্ঞান কালগতভাবে ভিন্ন একথা বলা চলে না। তাই ন্যায় সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বরের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান সর্বদা সমভাবেই বিরাজিত থাকে।

ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলে তা ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞান নয় এবং তা পরোক্ষ জ্ঞানও নয় ; তাই ঈশ্বরের জ্ঞান অপরোক্ষ একথা বলা হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের জ্ঞান সমভাবাপন্ন বলে এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও বলা হয়। আবার ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলে অন্যান্য আত্ম বিশেষগুণ (ইচ্ছা ও প্রযত্ন প্রভৃতি) নিত্য এই হল জয়ন্ত ভট্টের অভিমত ; কারণ আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ বলে স্বীকার করলে তা অনিত্য হয়ে পড়ে। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা প্রযত্ন মনঃ-সংযোগের অপেক্ষা করে না বলেই তা নিত্য।

এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্য হলে প্রতিক্ষণে নূতন জগতের সৃষ্টি হয়ে অনন্ত জগৎ সৃষ্টি হত অর্থাৎ জগতের বিলুপ্তি কখনও ঘটত না। কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং ঈশ্বর জগতের সংহারেরও কর্তা এটা ঈশ্বরবাদীদেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হলে সর্বদাই জগৎসৃষ্টি হবে অথচ ঈশ্বরের সংহারেচ্ছাও নিত্য বলে সংহারও সর্বদাই হবে। সৃষ্টি ও সংহারের ইচ্ছা পরস্পর বিরুদ্ধ হলে সৃষ্টি ও সংহার নিত্যই হতে থাকবে। এতে করে সৃষ্টি ও সংহারের ক্রমিকতা ব্যাহত হবে। এই প্রশ্নের উত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হলেও অনাত্ম বস্তুর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ব্যতীত সেই ইচ্ছা কার্যকরী হয় না। তাই কখনও সৃষ্টি

৪৩। 'আপ্রলয়াৎ সিদ্ধে নিত্যত্বে তদা বিনাশকারণাভাবাদস্যাত্মন ইব তজজ্ঞানস্য নিত্যত্বং সেৎ স্যতি, পুনশ্চ সর্গকালে তদুৎপত্তিকারণাভাবাদপি নিত্যত্বং তজ্জ্ঞানানাম্' (**ন্যায়মঞ্জরী** ; প্রমাণপ্রকরণ ; পৃঃ ১৮৪ পূর্ববৎ।)

ও কখনও সংহার সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত না হলে ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্যকর হতে পারে না। সৃষ্টি ও সংহার এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বরূপে বিদ্যমান থাকে ; কোনো বিষয়কে বিশেষভাবে কেন্দ্র করে থাকে না বলে সৃষ্টি বা সংহারের ইচ্ছা স্ফুরিত হলেই সৃষ্টি বা সংহার ঘটে। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছা নিত্য হলেও উত্থাপিত আশঙ্কা থাকে না।[৪৪]

ঈশ্বরের সর্বময় জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করলে জগতের সমূহ সুখ দুঃখই ঈশ্বরসৃষ্ট একথা মেনে নিতে হয়। সুখভোগ তৃপ্তিকর হলেও দুঃখভোগ ক্লেশকর। সুতরাং ঈশ্বর জীবের ক্লেশদায়ক দুঃখ সৃষ্টি করে নিজের বিদ্বেষরই পরিচয় দিয়েছেন একথা মানতেই হয়। তাতে ঈশ্বরের নিত্যশুদ্ধতা ও সর্বজ্ঞতা ক্ষুণ্ণ হয় ; কারণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের নিশ্চয়ই দুঃখের পরিণাম সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে এটা অবশ্য স্বীকার্য। তাই দুঃখ সৃষ্টি করে ঈশ্বর অন্তরের বিদ্বেষেরই পরিচয় দিচ্ছেন ফলে ঈশ্বরের শুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হয়। অথচ ঈশ্বর করুণাময় এবং তিনি নিরপেক্ষ-চিত্তে জগৎসৃষ্টি করেন—এটাই ঈশ্ববাদীদের সিদ্ধান্ত ; কিন্তু জাগতিক দুঃখভোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঈশ্বরবাদীদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। ঈশ্বর যদি বিদ্বেষপরায়ণ না হন তা হলে তিনি কখনও দুর্দশা ভোগের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করতেন না। ঈশ্বর তাহলে রাগদ্বেষহীন মুক্ত-পুরুষ নন এবং নিত্য-মুক্ত না হলে তাঁকে নিত্যসর্বজ্ঞও বলা চলে না।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন তা সম্যক নির্ধারিণ করতে না পারলে পূর্বোক্তি প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। সূর্যের জগৎ-প্রকাশতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, ঈশ্বরও তেমনি প্রয়োজন ভিন্নই জগৎসৃষ্টি করেন—এটা ঈশ্বরের স্ব-ভাব। কখনও সৃষ্টি এবং কখনও সংহার—এটা হল ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ ; তার কারণ অনুসন্ধান নিরর্থক।[৪৫] এই সূত্রেই জয়ন্ত ভট্ট বলেছেন—ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি তাঁর ক্রীড়ামাত্র। তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে, শিশু যেমন নিজের

৪৪। "অনাত্মনঃ সংযোগজত্বাদিচ্ছা স্বরূপমাত্রেণ নিত্যাপি কদাচিৎ সর্গেণ সংহারেণ বা বিষয়েন অনুরজ্যতে, সর্গসংহরয়োরন্তরালে তু জগতঃ স্থিত্যবস্থায়ামস্মাৎ কর্মণঃ ইদমস্য সম্পদ্যতামিতি ইচ্ছা ভবতি প্রজাপতেঃ।" (**ন্যায়মঞ্জরী** ; জয়ন্ত ভট্ট সূত্র পূর্ববৎ।)

৪৫। 'স্বভাব এবৈষ ভগবতো যৎ কদাচিৎ সৃজতি কদাচিৎ সংহরতি বিশ্বমিতি ; (**ন্যায়মঞ্জরী** ; প্রমাণ প্রকরণ ; পৃঃ ১৮৬ ; সূত্র পূর্ববৎ)।

ইচ্ছামতো নানা জিনিস গড়ে ও ভাঙে—ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহারও হচ্ছে সেই রকম। নিরাসক্ত চিত্তে শিশু যেমন খেলাঘর গড়ে ও ভাঙে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তা-ই। জয়ন্ত ভট্ট বলেছেন ঃ

ক্রীড়ার্থেঽপি জগৎসর্গ ন হীয়তে ক্রিয়ার্থতা।

প্রবর্তমানা দৃশ্যন্তে ন হি ক্রীড়াসু দুঃখিতা। (ন্যায়মঞ্জরী)

ঠিক এই ধরনের বক্তব্য বেদান্ত দর্শনের সূত্রকারেরও অভিলষিত। ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন পারমার্থিকভাবে না থাকলেও সূত্রকার বলেছেন—জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের লীলামাত্র।[৪৬] বেদান্ত বলেছেন, লৌকিক ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় একজন রাজা কোনো প্রয়োজন না থাকলেও কেবলমাত্র বিলাসবশতঃ নানা কাজে প্রবৃত্ত হন, ঈশ্বরও তেমনি প্রয়োজন না থাকলেও জগতের সৃষ্টি ও সংহারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিলাসের ক্ষেত্রে তো কিছু তৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাই ঈশ্বরেরও খানিকটা তৃপ্তিলাভের প্রশ্ন ওঠে। ঈশ্বরবাদীরা জানেন এই তৃপ্তির কথা মেনে নিলে ঈশ্বর আর আপ্তকাম থাকতে পারেন না। তাই শংকরাচার্য এ সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন, বাহ্যিক কোনো প্রয়োজনসিদ্ধি বা ফলের আকাঙ্খা না থাকলেও মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদি প্রক্রিয়া যেমন স্বভাবজাত তেমনি কোনো প্রয়োজন না থাকলেও শুধু স্বভাববশতঃ ঈশ্বর সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে প্রবৃত্ত হন।[৪৭]

প্রশ্ন হচ্ছে আপ্তকাম ঈশ্বরের নিশ্চেষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। তাই ঈশ্বরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং জীবের পক্ষে চরম দুঃখদায়ী এই সৃষ্টি তিনি কেন করেন? খেলা থেকে শিশু যেমন হঠাৎ নিবৃত্ত হয়, ঈশ্বর হঠাৎ নিবৃত্ত হন না কেন? আর ঈশ্বর যদি হঠাৎ নিবৃত্ত হন তবে তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই জীবের মুক্তি হবে না কেন? তাছাড়া ঈশ্বর হঠাৎ জগৎ সৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত হলে জগতের চিরন্তন অবসান ঘটে না কেন? —এই সব প্রশ্নের জবাবে শংকরাচার্য জয়ন্ত ভট্টের মতো ঈশ্বরের স্বভাবের কথা বলেছেন।[৪৮] স্বভাবকে তো আর দোষ দেয়া যায় না! জল নিম্নগামী শীতল, অগ্নি ঊর্ধ্বমুখী ও উষ্ণ—এর জন্য কি জল ও অগ্নিকে আমরা দোষ দিতে যাই? ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির

৪৬। 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'। (**বেদান্তদর্শন** ২।১।৩৩)।

৪৭। যথা চ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ঃ অনভিসন্ধায় বাহ্যং [illegible] কেবলং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি। এবমীশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি। (**বেদান্তদর্শন ; শাংকরভাষ্য ২।১।৩৩**)।

৪৮। 'ন চ স্বভাবঃ পর্যনুযোক্তুং শক্যতে'। (ঐ ; পূর্ববৎ)।

ব্যাপারেও তাই ঈশ্বরের স্বভাবেরই উপযুক্ত কাল সমুপস্থিত হলেই সৃষ্টি বা সংহার ঈশ্বর করে থাকেন—এটা স্বভাবজ তাই এতে কোনো দোষ বা অসঙ্গতি নেই। লৌকিক লীলা কিছু পরিমাণে চিত্তবিনোদনসূচক। কিন্তু নিত্যতৃপ্ত আপ্তকাম ঈশ্বরের কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, তাই ঈশ্বর বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি সংহার করেন বলেই তাকে লীলা বলতে হয় এবং লীলাকে তাঁর স্বভাবই বলতে হয়।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের তাৎপর্য বর্ণনা কালে অপ্পয়দীক্ষিত 'পরিমল টীকা'-য় বলেছেন ঃ সৃজ্য বস্তুর স্বভাবই পরমেশ্বরের সৃষ্টি প্রেরণার মূল, স্রষ্টার স্বভাব তার মূল নয়।[৪৯]

বেদান্ত দর্শনের এ মতের সঙ্গে জয়ন্ত ভট্টের মতের পূর্ণ মিল রয়েছে কারণ জয়ন্ত ভট্টও স্বভাব এবং লীলা এই দুটিকেই ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও জয়ন্ত ভট্ট বলেছেন 'জীবের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই ঈশ্বর সৃষ্টি সংহার করেন'।[৫০] ঈশ্বর অনুকম্পাবশে জগৎ সৃষ্টি করেন—এটা পাতঞ্জল দর্শনেরও সিদ্ধান্ত;[৫১] ঈশ্বর নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত ও সর্বজ্ঞ হলেও দুঃখসাগরে পতিত বিপন্ন প্রাণীর কল্যাণের নিমিত্তই ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন। কোনো সৃষ্টির সুপরিজ্ঞাত স্থিতিকালের সমাপ্তি সমাসন্ন হলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জানতে পারেন যে বহু জীবের কর্মফলভোগ শেষ হয় নি অথবা তাদের তত্ত্বজ্ঞানও অর্জিত হয়নি; অথচ তাদের কর্মক্ষয় না হলে তাদের বন্ধন দূর হবে না। তাই সমস্ত জীবের কর্মক্ষয়-জন্য ফলভোগের ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে ঈশ্বর জীবের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই জগৎ সৃষ্টি করেন।[৫২]

শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয়ে ঈশ্বরসিদ্ধির এই আয়োজনে ভক্তের অন্তর সিক্ত হলেও বৈচারিকের তৃপ্তি হয় না। তাই ঈশ্বরানুমানকে বিচারের মানদণ্ডে গ্রহণীয় করার দিকে নৈয়ায়িকদের দৃষ্টি ধাবিত হয়।

৪৯। 'সৃষ্টেঃ সৃজ্যবস্তুস্বভাবতৈবানভিমতত্বেন প্রদর্শিতা নতু স্রষ্টৃস্বভাবতা'—(কল্পতরু-পরিমালটীকা; বেদান্তদর্শন ২।১।৩৩)।

৫০। অথবা অনুকম্পয়া এব সর্গ সংহারৌ আরভতামীশ্বরঃ। (ন্যায়মঞ্জরী; সূত্র-পূর্ববৎ)।

৫১। তস্য আত্মানুগ্রহাভাবে অপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্। (পাতঞ্জলদর্শন; সমাধিপাদ; ব্যাসভাষ্য—সূত্র ২৫)।

৫২। শংকরাচার্য, জয়ন্ত ভট্ট এবং পাতঞ্জল দর্শন এক্ষেত্রে প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন।

নৈয়ায়িক অবিদ্ধকর্ণপাদ এবং মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের অভিমত এই লক্ষ্য নিয়েই উত্থাপিত হয়েছে। আমরা বর্তমান অধ্যায়েই অবিদ্ধকর্ণপাদের দু'টি ঈশ্বর-সাধক যুক্তি আলোচনা করছি; উদয়নাচার্যের যুক্তিগুলো আমরা পরবর্তী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করব।

নৈয়ায়িক অবিদ্ধকর্ণপাদ ঈশ্বরসাধনের জন্য দুটি প্রসিদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অবিদ্ধকর্ণের মতে সমস্ত জাগতিক কার্যবস্তুকে দুভাগে ভাগ করা যায়; কতগুলো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবার কতগুলো দুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একটি বৃহদাকার বস্তুর রূপটি দুটি ইন্দ্রিয় যথা চক্ষু ও ত্বকের দ্বারা গ্রাহ্য।[৫৩] রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহ এক-একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সুতরাং একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় জগৎ কোনো বুদ্ধিমান কর্তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে; কেননা এই সমস্ত জাগতিক বস্তুর মূল অবয়ব সমূহের সন্নিবেশের ফলেই তা উৎপন্ন হয়েছে।[৫৪]

দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তার অগ্রাহ্য এই বিশেষণ প্রয়োগ করে অবিদ্ধ-কর্ণপাদ পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুকে বুঝিয়েছেন। তার মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, চক্ষু এবং ত্বক এই দুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বায়ু দুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, শুধু একটি ইন্দ্রিয়ের তা গ্রাহ্য। এ চারটি দ্রব্য ব্যতীত আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন—এরা দ্রব্য; এদের কোনো উৎপাদক কর্তা নেই। উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ এ দুভাগে বিভক্ত এরূপ নির্দেশের কারণ হল, কেবলমাত্র অবয়ব সন্নিবেশ বিশিষ্ট কার্যদ্রব্যকেই উৎপাদক কর্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে ঐ সমস্ত স্থলে অনুমানের সিদ্ধ-সাধন দোষ ঘটে। তা এমন ভাবে 'পক্ষ' নির্দেশ করা হয়েছে যাতে এরূপ দোষের সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়, উদয়নাচার্য প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ যেভাবে অনুমান প্রদর্শন করেছেন তাতেও নানারূপ দোষের আশঙ্কা থাকে। কারণ তারা শেষ পর্যন্ত পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুকেই পক্ষরূপে নির্দেশ করেছেন। 'পৃথিবীত্ব' জাতিটি সাবয়ব পৃথিবীতে এবং পার্থিব

৫৩। যার রূপ নেই তা ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এই মতবাদ বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত। তাদের মতে বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্পর্শের দ্বারা বায়ুর অনুমান হয়।

৫৪। দ্বীন্দ্রিয় গ্রাহ্যাগ্রাহ্যং বিমত্যধিকরণভাবাপন্নং বুদ্ধিমৎকারণপূর্বকম্, স্বারম্ভকাবয়বসন্নিবেশ বিশিষ্টত্বাৎ, ঘটাদিবৎ, বৈধর্ম্যেণ পরমাণব ইতি। (তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকাটীকা; কারিকা—৪৭-৪৮)।

পরমাণুতেও বিদ্যমান থাকায় যাবতীয় পৃথিবীকেই 'পক্ষ' রূপে নির্দেশ করা যায় না; কেননা পরমাণু নামক পৃথিবী নিত্য বলে স্বীকৃত হওয়ায় সেখানে কার্যত্ব হেতু থাকে না। অতএব 'স্বরূপাসিদ্ধি'[৫৫] হেত্বাভাস ঘটে। পক্ষান্তরে সাবয়ব পৃথিবীকে অনুমানের পক্ষরূপে গ্রহণ করলে ঘট প্রভৃতি সাবয়ব পার্থিব বস্তুতে 'সিদ্ধসাধন'[৫৬] দোষ ঘটে। সুতরাং অবিদ্ধকর্ণপাদ এমন একটি কৌশলে পক্ষ নির্বাচন করেছেন যাতে আলোচিত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। এখানেই অবিদ্ধকর্ণপাদের অনুমানের বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বর সাধনের দ্বিতীয় অনুমান হিসাবে অবিদ্ধকর্ণপাদ আরেকটি অনুমান উপস্থিত করেছেন; তা হল, শরীর প্রভৃতি কার্যবস্তুর উপাদান যে পরমাণুসমূহ তা অচেতন; সুতরাং তা সচেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়েই কার্যের উৎপাদক হতে পারে। তন্তু প্রভৃতি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। বস্ত্রের উপাদান অচেতন তন্তুসমূহ চেতন তন্তুবায়ের প্রচেষ্টা ব্যতীত পরস্পর মিলিত হয়ে বস্ত্র নির্মাণ করতে পারে না। এতএব অচেতন পরমাণুসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে কোনো সচেতনের প্রযত্ন ব্যতীত কার্যদ্রব্য গঠন করতে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ যার আছে তা-ই কার্যদ্রব্য। সুতরাং অনুমানটি হল : শরীর প্রভৃতির উপাদান পরমাণুসমূহ (পক্ষ) সচেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়েই কার্য নির্মাণ করে (সাধ্য); যেহেতু তাদের রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ রয়েছে (হেতু)।[৫৭]

এই প্রশ্নে প্রশস্তিমতি নামক একজন আচার্যের মতও 'পঞ্জিকা টীকায়' উদ্ধৃত হয়েছে। প্রশস্তমতি ভিন্নতর একটি লোকসিদ্ধ দৃষ্টি-কোণ থেকে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, শিশু তার অভিজ্ঞ পিতামাতা প্রমুখের কাছ থেকে বস্তু ব্যবহারের উপদেশ লাভ করে। 'জল তৃষ্ণা দূর করে' অথবা 'অগ্নি দাহ করে'—এই

৫৫। **স্বরূপাসিদ্ধিঃ** যে হেতু পক্ষে থাকেনা সেই হেতুর দ্বারা অনুমান করলে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস ঘটে। শব্দগুণোঃ চাক্ষুষত্বাৎ রূপবৎ অর্থাৎ 'শব্দ দেখা যায় বলে তা রূপের ন্যায় গুণ'। এইরূপ অনুমানের হেতু স্বরূপতঃ অসিদ্ধ কেননা শব্দকে দেখা যায় না, শ্রবণ করা যায়। শব্দের গুণত্ব প্রমাণে চাক্ষুষত্ব স্বরূপতঃ অসিদ্ধ—এরূপ হেতুকে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস বলে।

৫৬। **সিদ্ধসাধন দোষ** : যে বিষয়টি সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়েছে বাদী অযথা তাকে আবার সিদ্ধ করলে সিদ্ধসাধন দোষ ঘটে।

৫৭। শরীরাদীনামুপাদানং পরমাণ্বাদি, চেতনেন কারণেনাধিষ্ঠিতং সৎ স্বকার্যকৃৎ রূপাদিমত্ত্বাৎ। (**তত্ত্বসংগ্রহ** পঞ্জিকাটীকা; কারিকা-৪৯)।

সমস্ত ধারণা সে নিজের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকেই শুধু লাভ করে না। অভিজ্ঞ অভিভাবকদের উপদেশ থেকেও তা সে লাভ করে। 'জল তৃষ্ণা দূর করে' এই অভিজ্ঞতা জল পান করেই জানতে হয়। কিন্তু আদিমতম মানুষ পিপাসার্ত হয়ে জলপানে প্রবৃত্ত কী করে হয়েছিল? আকস্মিকভাবে জলপান করেই হয়ত তিনি তৃষ্ণা দূর করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন জলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়। কিন্তু এই আকস্মিকতার তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য মনে হয় না; তাহলে বহুস্থলেই প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার অসম্ভব হত। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ বা অন্যের ব্যবহার থেকে শিক্ষালাভই অনেক বেশী সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। জাগতিক প্রতিটি বস্তুর প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করে নিজে তার ব্যবহার করা বা অপরকে ঐরূপ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব বলে মনে হয়। তা অসংখ্য বস্তুর ব্যবহার যিনি জানেন একমাত্র তিনিই অপরকে ঐসব বস্তু-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দিতে পারেন। আর এরকম অভিজ্ঞতা একমাত্র সর্বজ্ঞেরই থাকতে পারে; এই সর্বজ্ঞই ঈশ্বর।[৫৮]

এই লোকাচার-ভিত্তিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এখানে 'সর্বজ্ঞ' বলতে প্রকৃতপক্ষে কাকে বোঝানো হচ্ছে? সমস্ত পদার্থের জ্ঞান যার আছে তাকেই যদি সর্বজ্ঞ বলতে হয়—তাহলে তিনি নিজে তার নিজের পরিমাণ ও সংখ্যা জানেন তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এখানে জানা ও না-জানা দু' ক্ষেত্রেই তার সর্বজ্ঞতার হানি ঘটবে। যদি না-জানেন তবে নিশ্চয়ই তার সর্বজ্ঞতা ব্যাহত হবে আর যদি জানেন এবং নির্দিষ্ট ও সীমায়িত হন তবে এমন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনিত্যতা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বৌদ্ধ যুক্তির উত্তরে প্রশস্তমতির বক্তব্য অন্যান্য নৈয়ায়িক আচার্যের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ তিনি সর্বকর্তা হিসাবেই ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলেছেন। বলা বাহুল্য, নির্মীয়মাণ বস্তুর উপাদান সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্মাণ-কৌশল জানা থাকলেই একজন এমন বস্তুর কর্তা হতে

৫৮। প্রশস্তমতিস্তু আহ সর্গাদৌ পুরুষাণাং ব্যবহারঃ অন্যোপদেশপূর্বকঃ উত্তরকালং প্রবুদ্ধানাং প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ। অপ্রাসিদ্ধবাগ্ ব্যবহারানাং কুমারানাং গবাদিষু প্রত্যর্থনিয়তবাগ্ ব্যবহারঃ যথা মাত্রাদ্যুপদেশপূর্বকঃ ইতি। (**তত্ত্বসংগ্রহ** পঞ্জিকাটীকা; কারিকা-৫১)

পারেন। এই যুক্তি অনুসারেই ন্যায়-সিদ্ধান্ত সম্মত জগৎকর্তা ঈশ্বর নিত্যসর্বজ্ঞ এবং নিত্যসর্বজ্ঞ বলেই তিনি ঈশ্বর।[৫৯]

এই উভয় মত খণ্ডনের জন্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রথমেই বস্তুর গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে অবয়ব-সন্নিবেশের ক্রম অনুসারেই অবয়বী নামে কোনো দ্রব্য থাকতে পারে না। এটা সুপরিচিত বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত। ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ায় নিরবয়ব পরমাণু থেকে দ্ব্যণুকাদি ক্রম অনুসরণ করে বস্তুর উৎপত্তি যে অসম্ভব সে কথাই বৌদ্ধ আচার্যগণ এক্ষেত্রে বলেছেন। তাই বৌদ্ধমতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার নৈয়ায়িক যুক্তিই অসিদ্ধ।

অবিদ্ধকর্ণপাদের অভিমতও শান্তরিক্ষত খণ্ডন করেছেন এবং এই উভয় যুক্তিই যে ঈশ্বরসাধনে ব্যর্থ তা নির্দেশ করেছেন। সর্বকর্তৃত্ব সর্বজ্ঞতার পরিচায়ক নৈয়ায়িকগণের এ অভিমতের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অন্যতম বক্তব্য হল, যে সব কার্য আমাদের প্রত্যক্ষ হয় তার মূলে ঐসব কার্যের ব্যাপারে অভিজ্ঞ কর্তা রয়েছেন বলে যাবতীয় কার্যের মৌল উপাদান ও নির্মাণ কৌশলের জ্ঞাতা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হবেন—নৈয়ায়িকদের এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ অনুমানের জন্য দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের অর্থাৎ দু'টি তুলনীয়ের মধ্যে তুল্যতা আবশ্যক। এই রীতি অনুসারে নৈয়ায়িকগণের অভিমত নিত্যসর্বজ্ঞ সিদ্ধ হবে না, কারণ যা কার্য তা কর্তৃ-জন্য এ অনুমান প্রদর্শনকালে ঘট কুম্ভকারে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাতে কার্যবস্তুটি একান্ত অনিত্য; তাই এক্ষেত্রে কর্তাও অনিত্য। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত অনুসারে জগৎকর্তাকেও অনিত্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে, তার বেশী নয়। তবে নৈয়ায়িকগণ যদি নির্মাতা হিসাবে একজন বুদ্ধিমান কর্তা স্বীকার করেন, বৌদ্ধাচার্যদের তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু সেই কর্তাকে নিত্য ও নিত্যজ্ঞানশালী বললেই তাঁদের আপত্তি। অনিত্য কার্যদ্রব্যের কর্তারূপে যাকে নির্ধারণ করা হবে তার জ্ঞানও অনিত্য হবে—এটাই যুক্তিসম্মত। সাধনার প্রভাবে সমগ্র তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ করে একজনের পক্ষে সর্বজ্ঞতা লাভ করা যুক্তিযুক্ত একথা

৫৯। সর্বকর্তৃত্বসিদ্ধৌ চ সর্বজ্ঞত্বমযত্নতঃ। সিদ্ধমস্য যতঃ কর্তা কার্য রূপাদিবেদক। (ঐ ; কারিকা-৫৪)।

বৌদ্ধাচার্যগণ মানেন। এই সর্বজ্ঞ কোনো মতেই 'নিত্য সর্বজ্ঞ' নন। বুদ্ধদেবকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বৌদ্ধগণ 'সর্বজ্ঞ' বলে মানেন।[৬০]

আলোচ্য নৈয়ায়িক যুক্তিসমূহের নিশ্চয়তা ও যুক্তিসিদ্ধতা যা-ই হোক না কেন, একটা কথা অত্যন্ত পরিষ্কার। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নিজেদের যুক্তি ও অবস্থানের দৃঢ়তা সম্পর্কে এতই আস্থাবান যে তাঁরা প্রতিপক্ষের বক্তব্যগুলো নিজেরা খুঁজে এনে হাজির করেছেন এবং আলোচনান্তে তা খণ্ডন করেছেন। ন্যায়াচার্য অবিদ্ধকর্ণপাদের যুক্তির সন্ধান ন্যায়শাস্ত্রে নয়, বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে খণ্ডনাত্মক আলোচনা প্রসঙ্গেই আমরা পাই!

৬০। তদ্বৎ প্রমাণং ভগবান্; অভূতবিনিবৃত্তয়ে। ভূতোক্তিঃ; সাধনাপেক্ষা ততো যুক্তা প্রমাণতা। (**প্রমাণ বার্তিক**; ধর্মকীর্তি; কারিকা-১।৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা
উদয়নাচার্যের ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা

পরবর্তী ন্যায়দর্শনের প্রবক্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলে বিবেচিত মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থের শুরুতেই ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠাকে তাঁর মুখ্য লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের এই ন্যায়শাস্ত্রচর্চা শ্রবণ-পরবর্তী মননের দ্বারা ঈশ্বরেরই উপাসনা।'[৬১] প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায় কুমারিল থেকে শ্রীধরাচার্য পর্যন্ত সমস্ত বৈদিক দার্শনিকদেরই প্রধান ভাবনা ছিল বৌদ্ধমত খণ্ডন। এই সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ব্যাপক প্রভাব ও গুরুত্বই এর মধ্য দিয়ে সূচিত হয়। উদয়ন যেভাবে সাড়ম্বরে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন এবং যে রকম আনুপূর্বিকভাবে যুক্তি-তর্ক-বিচারের মাধ্যমে ঈশ্বরসিদ্ধি করতে চেয়েছেন তা থেকে তাঁর আয়োজনের বিশালতা ও নিষ্ঠার একাগ্রতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। ন্যায়দর্শনের বিশিষ্ট লেখক কুপুস্বামী শাস্ত্রীর ভাষাতে বলা যায়ঃ ''ভারতীয় ঈশ্বরবাদের ইতিহাসে উদয়নের ঈশ্বরসাধক প্রয়াসের বিশেষ গুরুত্ব হল এই যে তা বেদ-বিরোধী বৌদ্ধদের অভিযানের ফলে শাস্ত্র-প্রমাণের বিফলতার ক্ষেত্রে যুক্তি-বিচারকে ঈশ্বরবাদের সেবায় কতখানি কাজে লাগনো যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে...।''[৬২]

'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'-তে বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বর স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি যুক্তি প্রধান; একটি হল, 'জীবের কর্মফলের প্রদাতা বা কর্মজন্য-অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা' এবং দ্বিতীয় যুক্তি হল, 'জগৎকর্তারূপে ঈশ্বর-সিদ্ধি'। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মফলদাতা হিসাবে ঈশ্বর-সিদ্ধির কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সূত্রকার পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, জীবের, কর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই একমাত্র ফলদাতা নন; কারণ জীব কর্মানুষ্ঠান

৬১। ন্যায়চর্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা।। (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ১।৩)

৬২। "In the history of Indian theism, Udayan's theistic contribution is of particular value in demonstrating the extent to which theism may press reason into service where revelation fails—as in the case of the anti-Vedic Buddhists..." **Kuppuswami Sastri; Primer of Indian Logic, P. 85.**

না করলে তার ফল উৎপত্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকর প্রমুখ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উদয়নাচার্য যা বলেছেন তার তাৎপর্য হল এই যে মানুষ কর্মানুষ্ঠান করলেও কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। ফলের সাধক কর্মকে ঐ সমস্ত কর্মের ফলপ্রদানকারীরূপে নির্ধারিত করতে হলে বহুপূর্বে অনুষ্ঠিত ও নিঃশেষিত কর্মের সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যবধানে উৎপন্ন ফলের একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এই যোগসূত্রকেই ধর্ম বা অধর্ম ও অদৃষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়।[৬৩]

জীব স্বকৃত কর্মানুসারেই ফলভোগ করে, কর্মানুষ্ঠান না করলে ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে জীবকে কোনো বিশেষ ফল প্রদান করতে পারেন না—এটা সমস্ত ঈশ্বরবাদী দর্শনেরই সিদ্ধান্ত। এখানে প্রশ্ন হল, প্রত্যেকেই যদি স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করবে এই নিয়ম হলে ফলদাতা হিসাবে ঈশ্বরের আবশ্যকতা কী এবং কোথায়? ঈশ্বর স্বাধীনভাবে যদি ফলপ্রদানে অক্ষম হন তাহলে ঈশ্বর স্বীকারেরই প্রয়োজন কী? কর্মানুসারে ফলপ্রদান করতে হলে ঈশ্বরের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রত্যাশিতভাবেই উদয়নাচার্য এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ একজন চেতন কর্তা না থাকলে কেবলমাত্র জড়বস্তু পরস্পর মিলিত হয়ে উপযুক্ত কার্য নির্মাণ করতে পারে না। পরমাণু সমূহ নিজেরা অচেতন এবং কর্মফলজাত অদৃষ্ট অচেতন বলে ভোক্তার অদৃষ্ট অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু নির্মাণের ব্যবস্থা স্বয়ংসিদ্ধ হতে পারে না।[৬৪] তাই অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করে, [৬৫] কার্যমাত্রেরই কর্তা রূপে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

'কুসুমাঞ্জলি'-র পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে পঞ্চম স্তবকেই প্রধানতঃ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ; অনুমান প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা

৬৩। চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্মাতিশয়ং বিনা।
সম্ভোগো নির্বিশেষাণাং ন ভূতৈঃ সংস্কৃতৈরপি।।
(কুসুমাঞ্জলি ; ১।৯)

৬৪। সংস্কারঃপুংস এবেষ্টঃ প্রেক্ষণাভ্যক্ষণাদিভিঃ।
স্বগুণাঃ পরমাণুনাং বিশেষাঃ পাকজাদয়ঃ।। **(কুসুমাঞ্জলি** ; ১।১১)

৬৫। কর্তৃধর্মা নিয়ন্তারশ্চেতিতা চ সর্ব এব নঃ।
অন্যথানপবর্গঃ স্যাদসংসারোহথবা ধ্রুবঃ।। (ঐ ; ১।১৪)

করাই নৈয়ায়িকদের লক্ষ্য। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে অনুমানের সহায়ক হিসাবে ঈশ্বরসিদ্ধির অনুকূল শ্রুতি ও স্মৃতির সম্মতিরও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নৈয়ায়িকেরা অনুমানকেই ঈশ্বর প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নব্য-নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁর ''তত্ত্বচিন্তামণি''-তে অনুমান পরিচ্ছেদে ঈশ্বরানুমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, উদয়ন অনুমানের ও যুক্তিবিচারের সাহায্যেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন।

''ন্যায়কুসুমাঞ্জলি''-র পঞ্চম স্তবকের প্রথম কারিকাতেই উদয়ন বলেছেনঃ

কার্যোয়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ।।

উদয়ন বলেছেন, কার্য, আয়োজন, ধৃতি, পদ, প্রত্যয়, শ্রুতি, বাক্য এবং সংখ্যাবিশেষরূপ হেতুর দ্বারা বিশ্ববিদ্ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন। এই প্রধান আটটি যুক্তিই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে উদয়ন উপস্থিত করেছেন। আমরা এখন ক্রমান্বয়ে এই যুক্তিগুলোর উপস্থাপনা, আলোচনা ও বিচার করব।

উদয়নের প্রথম ও প্রধান যুক্তি, এই জগৎ একটি কার্যদ্রব্য, প্রতিটি কার্যের কারণ আছে, এই জগৎরূপী কার্যের কারণ হলেন ঈশ্বর।

যা উৎপন্ন হয় ও যার বিনাশ আছে তা-ই কার্য।[৬৬] প্রতিটি কার্যই একটি ভাব-পদার্থ এবং তার একজন কর্তা আছে—এটা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ঘট একটি কার্যদ্রব্য ও কুম্ভকার তার কর্তা। তাই দৃশ্যমান জগৎ একটি কার্য; এবং তার একজন কর্তা নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল জগৎ যে কার্য তা কিভাবে বোঝা যাবে? এর উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন, সাবয়ব বস্তুই হল কার্য; কারণ অবয়বসমূহের পরস্পর মিলনের ফলেই অবয়বী নামক বস্তুটি উৎপন্ন হয়। যেখানে সাবয়বত্ব হেতু থাকবে সেখানে কার্যত্বও থাকবে এটা যুক্তিসিদ্ধ। তাই নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হল, জগৎ একটি কার্য; কারণ তার সাবয়বত্ব আছে এবং ঘট প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

৬৬। যার প্রাগভাব ও ধ্বংস দুই-ই আছে সেই বস্তুটিকে প্রাগভাবের প্রতিযোগী ও ধ্বংসের প্রতিযোগী বলা হয়। সুতরাং যা প্রাগভাবের প্রতিযোগী ও ধ্বংসের প্রতিযোগী তা-ই **কার্য**। যে সব ভাব-পদার্থের প্রাগভাব আছে তার ধ্বংসও আছে। সুতরাং ন্যায়মতে কার্য বলতে উৎপত্তি ও বিনাশশীল ভাবপদার্থকেই বোঝায়।

(জগৎ কার্যং ; সাবয়বত্বাৎ ঘটাদিবৎ)।

জগতের কার্যত্ব নির্ধারণের পর এই কার্যত্বের হেতু হিসাবে একজন কর্তা অবশ্যই অনুমিত হন। তাই নৈয়ায়িকদের যুক্তি ঃ জগৎ একটি কার্য বলে তার কর্তা আছেন এবং ঘট হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত। (জগৎ সকর্তৃকং ; কার্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ)। কিন্তু এই অনুমানের সাহায্যে জগতের একজন কর্তা অর্থাৎ নির্মাতা অনুমিত হলেন, কিন্তু এতে করে ঈশ্বর সিদ্ধ হন না ; এ ধরনের প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন একজন সর্বজ্ঞ ও নিত্য পুরুষ ভিন্ন কেউ এই জটিল ও বিশাল জগতের নির্মাতা হতে পারেন না। সেই নিত্যসর্বজ্ঞই ঈশ্বর।

নৈয়ায়িকদের সুপরিচিত এই **প্রথম** ঈশ্বরসাধক যুক্তিটি নিয়ে এর মাঝেই আমরা নানাভাবে আলোচনা করেছি। তবু বর্তমান আলোচনার সূত্রে প্রথমেই যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল, এখানে 'জগৎ'কে পক্ষ করা হয়েছে, কিন্তু ন্যায়মতে জগতের যাবতীয় বস্তু 'পক্ষ' হতে পারে না কারণ বস্তুসমূহের মধ্যে ন্যায়মতে কতগুলো বস্তু 'নিত্য' এবং অন্যগুলো 'অনিত্য'। অনিত্য বস্তুসমূহ কার্য বলে কর্তার দ্বারা উৎপন্ন হলেও আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন এবং পরমাণুসমূহ নিত্য বস্তু বলে সেগুলো কার্য নয়, সুতরাং তা কর্তৃ-জন্য নয়। সামান্য, বিশেষ, সমবায়, নিত্যদ্রব্যের কিছু কিছু গুণ ও অত্যন্তাভাব নিত্য পদার্থ বলে তা-ও কার্য হতে পারে না। সুতরাং নিত্য ও অনিত্য এই সমস্ত বস্তু জগৎ বলে পরিচিত বলে সামগ্রিকভাবে জগতে কার্যত্ব হেতু আরোপ করা যায় না এবং তা সকর্তৃকও নয়। ফলে এ অনুমানে নানা অসিদ্ধি ও দোষ রয়েছে, এতে 'ভাগাসিদ্ধি' হেত্বাভাস ও 'আংশিক বাধ' ঘটেছে।[৬৭] সুতরাং জগৎকে পক্ষ করে, সকর্তৃকত্বকে সাধ্য করা এবং কার্যত্বকে হেতু করে অনুমান করা চলে না। তাই প্রদর্শিত অনুমানের

৬৭। অনুমানে প্রদর্শিত হেতুতে দোষ থাকলে হেত্বাভাস হয় ; হেত্বাভাস অনুমানের প্রতিবন্ধক। বিভিন্ন হেত্বাভাসের মধ্যে 'স্বরূপাসিদ্ধি' ও 'বাধ' অন্যতম। যাকে হেতু করা হয়েছে তা যদি পক্ষে না থাকে তবে 'স্বরূপাসিদ্ধি' হেত্বাভাস ঘটে। যেমন, কেউ যদি বলেন, 'হ্রদে আগুন আছে কারণ তাতে ধূম রয়েছে' তবে প্রদর্শিত হেতু ধূম পক্ষ হ্রদে নেই বলে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেতু এমন হতে পারে যা পক্ষ রূপে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কয়েকটি স্থানে থাকলেও সর্বত্র নেই অর্থাৎ পক্ষের এক ভাগে রয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্যভাগে নেই তবে ভাগাসিদ্ধি হেত্বাভাস ঘটবে। যেমন, 'মানুষ মাত্রেই পুরুষ কারণ তাদের পুরুষত্ব আছে' এরকম অনুমান করলে পুরুষত্ব হেতুটি সকল মানুষে নেই বলে ভাগাসিদ্ধি

'পক্ষ' কী হবে তা বিচার্য বিষয়।

সাবয়ব বস্তু অর্থাৎ যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকেই যদি পক্ষ করা হয় তাহলেও অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না কারণ সমূহ সাবয়ব বস্তুর একমাত্র কর্তা ঈশ্বর নন, অদৃষ্ট অনুসারের সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি নৈয়ায়িক-সম্মত বলে জীবও সাবয়ব বস্তুর কর্তা হতে পারে। আবার যদি বলি, অদৃষ্ট-জনক কর্ম থেকে অনুৎপন্ন অথচ সাবয়ব এমন বস্তুই পক্ষ হবে—তা হলেও পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুকে পক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না কারণ ঈশ্বরের প্রচেষ্টা পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুর উৎপত্তির সহায়ক হলেও জীবের অদৃষ্টও ভোগ্যবস্তুর কারণ বলে স্বীকৃত হওয়ায় পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় ভোগ্যবস্তু পক্ষের অন্তর্গত হবে না। তাই সেই সব বস্তুতে ঈশ্বর-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হবে না।

এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাবতীয় বস্তুকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে অনুমান করা সম্ভব না হলেও যে সব সাবয়ব বস্তুর উৎপাদনকারী কর্তা কেউ কখনও প্রত্যক্ষ করতে পারে না তা যেহেতু সাবয়ব তাই তা অবশ্যই কর্তৃজন্য এই সিদ্ধান্ত করতেই হয়। যে পক্ষটি সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এমন একটি পক্ষকে গ্রহণ করে অনুমান করলেই তার সাহায্যে অন্যান্য সাবয়ব বস্তুরও একজন কর্তা সিদ্ধ হবে। এই জন্যই 'কুসুমাঞ্জলি'-তে পৃথিবীকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে উদয়ন বলেছেন, 'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ' (কুসুমাঞ্জলি', ৫।১) অর্থাৎ জগৎ কর্তাজন্য কারণ তা ঘট প্রভৃতির মতোই একটি কার্যদ্রব্য।

তা সত্ত্বেও পৃথিবী একটি ভোগ্যবস্তু বলে চিহ্নিত হওয়ায় জীবের ভোগ-জনক অদৃষ্টও পৃথিবীর অন্যতম কারণ বলে গৃহীত। তাই এই অদৃষ্টের কর্তা জীবকেও তো পৃথিবীর কর্তা বা কারণ বলা যায়। সুতরাং এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন কেমন করে?

এই সমস্যার উত্তরে ঈশ্বরবাদীরা বলেন, অনাদিকাল থেকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হয়েই জীব কর্মানুষ্ঠান করে সুতরাং জীবের অদৃষ্টজনক কর্মও ঈশ্বরেচ্ছা-প্রণোদিত বলে সর্বত্র ঈশ্বরের কর্তৃত্ব রয়েছে; তাই শুধু ভোগজনক অদৃষ্টের কর্তা বলেই জীবকে পৃথিবী

হবে। অন্যদিকে [illegible] হলে 'বাধ' নামক হেত্বাভাস হয়; যদি বলি, 'বহ্নি অনুষ্ণ কারণ [illegible] নামক পক্ষে অনুষ্ণত্ব নামক সাধ্য না থাকায় 'বাধ' বলে পরিচিত হেত্বাভাস ঘটে। সামগ্রিকভাবে সাধ্য পক্ষে না থাকলেও যদি পক্ষের একাংশে থাকে তবে 'আংশিক বাধ' হয়; যেমন, 'মানুষ মাত্রেই পুরুষ কারণ তাদের পুরুষত্ব আছে' তবে এই অনুমানে 'আংশিক বাধ' ঘটবে।

প্রভৃতি বস্তুর কর্তা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ ন্যায়-মতে অচেতন পরমাণুসমূহের দ্ব্যণুকাদি ক্রমে যে সংযোগ তা থেকে সকল সাবয়ব বস্তু উৎপন্ন হয়। জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী বস্তুর উৎপত্তি আবশ্যক জেনেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সচেতন সংকল্প অনুসারেই এই পরমাণু সংযোগ ঘটে। জীবের ভোগাদৃষ্ট ভোগ্যজগতের উৎপত্তির সহকারী কারণ হলেও, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই সৃষ্টির প্রধান প্রযোজক। কারণ জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির সমানাধিকরণ না হলে কার্যোৎপত্তি সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি সাবয়ব বস্তু সমবায়-সম্বন্ধে নিজের অবয়বে উৎপাদিত হয়—এই হচ্ছে ন্যায় সিদ্ধান্ত। দ্রব্যের অবয়বকে তাই তাঁরা সমবায়ী কারণ বলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন দ্রব্যের অবয়বে অর্থাৎ সমবায়ী কারণে থাকে না, থাকে আত্মাতে। তাহলে কার্য যে অধিকরণে উৎপন্ন হয় সেই অধিকরণে কারণ, ইচ্ছা, প্রযত্ন থাকে না—এটা পরিষ্কার। তাহলে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন ভিন্নাধিকরণ হওয়ায় এদের মধ্যে কার্যকারণভাব কিভাবে নির্ধারিণ করা যাবে—এটা খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতেই থাকে কিন্তু অন্য সম্বন্ধে সমবায়ী কারণেও থাকতে পারে। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয়, সুতরাং 'এই অধিকরণে এই কার্য হতে পারে' এমন জ্ঞান, 'এই অধিকরণে এটা হোক' এমন ইচ্ছা এবং 'এই অধিকরণে এটা করব' এমন প্রযত্ন সমবায়-সম্বন্ধে আত্মাতে থাকলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কার্যের সমবায়ী কারণটি জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নেরই বিষয়। সুতরাং বিষয়তা সম্বন্ধে এই জ্ঞান ইত্যাদি কার্যের সমবায়ী কারণে থাকতে পারে। সুতরাং **বিষয়তা-সম্বন্ধে** এই সব জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন যেখানে থাকবে সমবায় সম্বন্ধে সেখানেই কার্যদ্রব্য উৎপন্ন হবে এমন কার্যকারণভাব নির্ধারিণ করা যায়।[৬৮]

নৈয়ায়িকগণ বলেন, এভাবে কার্যকারণভাব নির্ধারিত হওয়ার ফলে কোনো সাবয়ব দ্রব্যেই ঈশ্বর-কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের সংকল্প ব্যতীত কোনো কার্যোৎপত্তি অসম্ভব বলে কার্যবস্তুর কর্তৃত্ব শুধু

৬৮। 'বিশেষ্যতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নকৃতিত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতসমবায সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কার্যত্বম্ ।' (**ভাষাপরিচ্ছেদ ; দিনকরী টীকা** ; প্রত্যক্ষ খণ্ড, প্রথম কারিকা।)

ঈশ্বরেরই সম্ভব। ভোক্তার অদৃষ্টই যদি ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদক হত তা হলে একই বস্তু বিভিন্নকালে বহু মানুষের কাছে পরস্পর বিপরীত ফলদায়ী হত না—তাই সর্বকালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার যুক্তিসিদ্ধ।[৬৯]

ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার **দ্বিতীয় হেতু** হিসাবে উদয়নাচার্য 'আয়োজন'-এর কথা বলেছেন। 'আয়োজন কথার অর্থ হচ্ছে 'কর্ম'।[৭০]

প্রথম অনুমানে সকর্তৃকত্বকে সাধ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ কার্য কোনো কর্তার প্রযত্নের দ্বারা সমুৎপন্ন; সুতরাং কার্যদ্রব্য হিসাবে পৃথিবী প্রভৃতি কোনো একজন কর্তার দ্বারা নিষ্পন্ন এইটুকু বোঝা গেল। অভিলষিত কার্যের উপাদান কারণের প্রত্যক্ষজ্ঞান ঐ কার্য নির্মাণের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাজাত প্রযত্ন যার রয়েছে তাকেই কর্তা বলা হয়। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু কোনো একজন কর্তা কর্তৃক নির্মিত কেবল তাই বোঝা যায়। এরূপ কর্তা জগতের কর্তারূপে নির্ধারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি হয় না। এ ধরনের আশঙ্কা দূর করার জন্যই 'আয়োজন'কে হেতু করে উদয়ন ঈশ্বরানুমান করেছেন।

নৈয়ায়িকমতে পৃথিবী ও দ্রব্য সমূহ উৎপত্তির পূর্বে পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে পরস্পর যুক্ত হয়ে সাবয়ব দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সংযোগের জন্য এই সংযোগের দু'টি সংযুক্তের মধ্যে স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া আবশ্যক; কারণ দু'টি নিষ্ক্রিয় বস্তুর পরস্পর-সংযোগ স্বাভাবতঃ ঘটে যায় না। পরমাণুসমূহ অতি সূক্ষ্ম বলে সর্বব্যাপক না হওয়ায় প্রতিটি পরমাণু স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ প্রদেশে অবস্থান করে। সুতরাং একটি পরমাণু অন্য আরেকটি পরমাণুর সঙ্গে স্বভাবতঃ সংযুক্ত নয়। দু'টি পরমাণুর মধ্যে অথবা যে-কোনো একটি পরমাণুর মধ্যে স্পন্দনের সঞ্চার না হলে পরমাণুরা নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করে অপর পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। মনে রাখা দরকার পার্থিব জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই পরমাণু দুটির সংযোগ আবশ্যক কারণ ঐ সংযোগ থেকেই সৃষ্টির প্রারম্ভ সূচিত হয়। তাই পরমাণুর মধ্যে অন্য কোনো কারণেই প্রথম স্পন্দন জন্মাতে পারে না—অথচ এই স্পন্দন

৬৯। কার্যত্ব হেতুর অনুমান সম্বন্ধে অন্যান্য নানাবিধ সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা উদয়ন করেছেন। তবে তাঁর মূল প্রতিপাদ্যই আমরা এখানে উপস্থিত করেছি।

৭০। 'আয়োজনং কর্ম;' (**কুসুমাঞ্জলি**; হরিদাসী টীকা; ৫।১)।

না জন্মালে একটি পরমাণুর সঙ্গে আরেকটি পরমাণুর সংযোগও হবে না। তাহলে ধরে নিতেই হয় এমন একজন চেতন পুরুষ কেউ রয়েছেন যিনি এই পরমাণু দু'টির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অনুকূল স্পন্দনের সঞ্চার করেন। বলা বাহুল্য, ন্যায় মতে, ঐ গতির-গতি চেতন পুরুষই ঈশ্বর। এখানে অনুমানটি হল এইরূপ, সৃষ্টির পূর্বে দ্ব্যণুকের আরম্ভক পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ যে কর্মের দ্বারা সংঘটিত হয় সেই কর্ম কোনো একজন চেতন-পুরুষের প্রযত্ন-সাধ্য; কেননা তা কর্ম এবং আমাদের প্রত্যক্ষ শারীরিক কর্ম তার দৃষ্টান্ত।[৭১]

উদয়নাচার্যের তৃতীয় ঈশ্বর-সাধক হেতু হল ধৃতি। 'ধৃতি' শব্দের অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। এই কথার তাৎপর্য হল গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বস্তুই মহাশূন্যে স্থিতিশীল হয়ে থাকতে পারে না; ভারসম্পন্ন যে কোনো স্বাভাবিক বস্তুর ধর্মই হল কোনো একটি আশ্রয়ে অবস্থিতি। সমপরিমাণ বা অধিকপরিমাণ বস্তুই ভারবিশিষ্ট দ্রব্যের আশ্রয় হতে পারে। সুতরাং শূন্য অর্থাৎ যার কোনো গুরুত্ব নেই তা ঐ ভারবিশিষ্ট দ্রব্যের আশ্রয় হতে পারে না। অতি গুরুত্বসম্পন্ন এই পৃথিবী মহাশূন্যে অনাশ্রিত হয়ে থাকতে পারে না। তাই একথা স্বীকার করতেই হবে যে কারও বিশেষ প্রযত্নের ফলেই পৃথিবী মহাশূন্যে অবস্থান করতে পারছে এবং তারই জন্য পতন বা স্থানচ্যুতি ঘটছে না। গুরুত্ববিশিষ্ট পৃথিবীর পতনের প্রতিবন্ধক শক্তিকেই এখানে ধৃতি বলা হয়েছে। 'কুসুমাঞ্জলি'-কারের সিদ্ধান্ত হল—যাঁর প্রযত্নের ফলে পৃথিবীর পতন ঘটে না তিনিই ঈশ্বর। অনুমানটি হচ্ছে ঃ ব্রহ্মাণ্ড পতনের প্রতিবন্ধক প্রযত্নের দ্বারা আবদ্ধ। তারই জন্য গুরুত্ববিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের পতন হয় না।[৭২]

'কুসুমাঞ্জলি-কারের চতুর্থ ঈশ্বরসাধক হেতু হ'ল পদ। এখানে 'পদ' শব্দটি 'ব্যবহার' অর্থে গৃহীত হয়েছে।[৭৩] এখানে পদ শব্দের তাৎপর্য হল, যে কোনো একটি নির্মাণ করতে হলে তার নির্মাণ কৌশল জানা হলেই হবে না। ঐ উপকরণগুলোর সাহায্যে বস্তুটির নির্মাণ-কৌশলও জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র সংস্থান

৭১। 'সর্গাদ্যকালীন দ্ব্যণুকারম্ভকপরমাণুদ্বয়সংযোগজনকং কর্মচেতন প্রযত্নপূর্বকং কর্মত্বাৎ অস্মাদাদিশরীরক্রিয়াবৎ'। (**কুসুমাঞ্জলি**, হরিদাসী টীকা; ৫।১)

৭২। ব্রহ্মাণ্ডাদি পতনপ্রতিবন্ধকীভূত প্রযত্নবদধিষ্ঠিতম্; ধৃতিমত্ত্বাৎ বিয়তি বিহঙ্গমধৃতকাষ্ঠবৎ। (সূত্র-পূর্ববৎ)।

৭৩। 'পদাৎ পদ্যতে অনেন ইতি ব্যুৎপত্যা পদং ব্যবহারঃ।' (**কুসুমাঞ্জলি**; হরিদাসী টীকা; ৫।১)

এবং প্রত্যেকটি বস্তুর সূক্ষ্ম ও জটিল নির্মাণ-পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই নির্মাণ-কৌশল জানতে হলে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন উপদেশকের প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্বজগতের নির্মাণকর্তা যদি অন্য কারো নিকট থেকে এই নির্মাণ-কৌশল অবগত হয়ে থাকেন তবে তাঁকেই ঈশ্বর বলা সঙ্গত। জগৎনির্মাতা ঈশ্বর নিত্যসর্বজ্ঞ, স্বভাবতঃই সমস্ত নির্মাণ-কৌশল তিনি নিজেই জানেন তাই অন্যের উপদেশের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই এই সিদ্ধান্তই করতে হয়। সুতরাং ঈশ্বর অন্যের উপদেশের অপেক্ষা না করেই বিশ্বজগৎ নির্মাণে সমর্থ একথা মানতে হয়। তাই এই অনুমানটি হলঃ জগতিক বস্তুর নির্মাণ পদ্ধতি কোনো একজন স্বয়ংসিদ্ধ নির্মাণকৌশলাভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে, কেন না সকল ক্ষেত্রেই নির্মাণকৌশল একজন অভিজ্ঞ পুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়ে থাকে।[৭৪]

ঈশ্বর-সাধক পঞ্চমহেতু হল 'প্রত্যয়'। এখানে প্রত্যয় শব্দের অর্থ প্রামাণ্য।[৭৫] কথাটির তাৎপর্য হল, বেদের প্রতিপাদ্য জ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধরূপেই গণ্য হয় কারণ বেদ বাক্যময় হলেও তার রচয়িতা একজন সর্বজ্ঞ। বেদসংহিতা সর্বজ্ঞ-কল্প এই হচ্ছে অনুমানটির ভিত্তি। নৈয়ায়িকগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলেন না; তাকে সর্বজ্ঞ পুরুষ-কল্পিত বলেই মনে করেন। 'মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যাচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্' —গৌতমের দর্শনের ৩।১।১৭ সূত্রানুসারে সর্বজ্ঞ বেদরচয়িতার প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ঈশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টিকর্তারূপে স্বীকার করলে জগতের অবিদ্যমানতার সময়ও ঈশ্বর ছিলেন তা স্বীকার করতে হয়। সেই ঈশ্বরের জ্ঞানরাশিই বাক্যময় রূপে বেদ নামে অভিহিত; অতএব বেদ সৃষ্ট-পুরুষের রচিত নয় বলে সর্বদা নির্দোষ —তারই জন্য বেদ প্রমাণ বলে গণ্য।[৭৬]

ষষ্ঠ হেতু হ'ল 'শ্রুতি'। 'শ্রুতি'র অর্থ বেদ। এই হেতুর সাহায্যে বেদের পৌরুষেয়ত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। বেদ বাক্যময় বলেই তা কোনো বুদ্ধিমান পুরুষ কর্তৃক বিরচিত এই হচ্ছে বক্তব্য। এই

৭৪। পটাদি সম্প্রদায় ব্যবহারঃ, স্বতন্ত্রপুরুষপ্রযোজ্যঃ, ব্যবহারত্বাৎ আধুনিক লিপ্যাদি ব্যবহারবৎ। (সূত্র-পূর্ববৎ)।

৭৫। 'প্রত্যয়তঃ প্রামাণ্যাৎ' (ঐ)

৭৬। বেদজন্যজ্ঞানং কারণগুণজন্যং প্রমাত্বাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবৎ। (সূত্র—একই)

বুদ্ধিমান রচয়িতা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারেন না; অভ্রান্ত বেদের রচনা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত সম্ভব নয়।

সপ্তম ঈশ্বর-সাধক হেতু 'বাক্য'। এটাও ফলতঃ বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদক একটি অনুমান। বেদের বাক্য সমূহ একমাত্র সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলেই তা প্রমাণ।

অষ্টম এবং সর্বশেষে হেতু হ'ল 'সংখ্যাবিশেষ'। এই কথার অর্থ হ'ল, দু'টি পরমাণুর সংযোগ থেকে দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত কার্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু অণু ও দ্ব্যণুক এই উভয়ই অণু-পরিমাণ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হ'ল, দ্ব্যণুক অণুরই কার্য; সুতরাং নিয়মানুসারে দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণুর পরিমাণ থেকেই উৎপন্ন হবে। কার্য-দ্রব্যের পরিমাণ কারণ-দ্রব্যের পরিমাণ থেকেই উৎপন্ন হয়। বস্ত্রের পরিমাণ সূত্রের পরিমাণ থেকেই উদ্ভূত, ঘটের পরিমাণ কপাল পরিমাণ থেকেই উৎপন্ন হয়। অতএব স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দ্ব্যণুক একটি কার্যদ্রব্য বলে তার পরিমাণ ও দ্ব্যণুকের কারণ যে পরমাণু থেকে উৎপন্ন তা অবশ্য-স্বীকার্য। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণকে কারো কারণ বলা হয় না।[৭৭] সুতরাং দ্ব্যণুকের কারণ যে দু'টি পরমাণু তাদের দ্বিত্ব

৭৭। কাবণ-দ্রব্যের পরিমাণ সাধারণতঃ কার্য-দ্রব্যেব পরিমাণের জনক কিন্তু একটি পবিমাণ থেকে আবেকটি পরিমাণেব উৎপত্তি বিশেষ নিয়মের অধীন। এখানে একটি নিযম হল, কোনো পরিমাণ নিজেব চেয়ে উৎকৃষ্ট স্বজাতীয় পরিমাণেবই জনক হতে পারে। পরিমাণ দু'রকমেব; অণু ও মহৎ। সূত্রের পরিমাণ থেকে বস্ত্রের পরিমাণ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর, মহৎ পরিমাণের ক্ষেত্রে এরূপভাবে মহত্তর, মহত্তম প্রভৃতি পরিমাণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু অণুপরিমাণের ক্ষেত্রে অনুতর পরিমাণ অসম্ভব কেননা পদার্থের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য সত্তাই হল পরমাণু। এ থেকে বোঝানো হচ্ছে, অণু পরিমাণের চরমসীমা হচ্ছে পরমাণু অর্থাৎ পরমাণু অপেক্ষা অণুতর পরিমাণ অসম্ভব। কিন্তু পবমাণুব পরিমাণ যদি কারণ হয তা হলে পূর্বের নিয়ম অনুসারে সে কেবল স্বজাতীয় উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অণুতর পরিমাণেরই জনক হতে পারে। অথচ অণুতর পরিমাণ অপ্রসিদ্ধ। এই জন্যই পরমাণুর পবিমাণকে কারণ বলা হয় নি। তাই 'ভাষাপরিচ্ছেদ'-এর প্রত্যক্ষ খণ্ডে বলা হয়েছেঃ 'পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্' অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুতেই কারণত্ব থাকবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, পরমাণুর পরিমাণ যদি কারো কারণ না হয় তাহলে দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ কে হবে? পরিমাণের কারণ পরিমাণই হয় এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব দ্ব্যণুকের কারণ পরমাণুর পরিমাণই হতে পারে। অথচ পরমাণুর পরিমাণ কারণ নয়। সুতরাং প্রশ্ন হল পরমাণুর কারণ কী? তার উত্তরেই উদয়নাচার্য বলছেন—সংখ্যাবিশেষই হ'ল সেই কারণ।

সংখ্যাটিকেই দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ বলা হয়। এখানে প্রশ্ন হ'ল দ্বিত্বসংখ্যা অপেক্ষা-বুদ্ধিসাপেক্ষ।[৭৮] সৃষ্টির পূর্বে এরূপ অপেক্ষা-বুদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরের থাকা সম্ভব; সুতরাং দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ যে দ্বিত্ব সংখ্যা তার জ্ঞান ঈশ্বর ব্যতীত কারো থাকতে পারে না। তাই দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ অণুদ্বয়ের দ্বিত্বসংখ্যাজ্ঞান যাঁর রয়েছে তিনিই ঈশ্বর। অনুমানটি এই ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করেই রচিত।[৭৯]

'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা উদয়ানাচার্য এভাবে আটটি হেতুর সাহায্যে ঈশ্বরের যুক্তি-বিচারমূলক অস্তিত্বসাধন করেছেন বলে দাবী করেন।

যত আড়ম্বর সহকারেই বিঘোষিত হোক না কেন উদয়নাচার্যের এই যুক্তিগুলোতে তাঁর পূর্বতন নৈয়ায়িক আচার্যদের যুক্তিবিচারেরই পুনরাবৃত্তি ও প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই। এই ''পুনরুক্তির দূষণীয় কাজটা ভূষণ হিসাবে গ্রহণ''[৮০] করে তিনি ঈশ্বর স্থাপনে কতখানি সমর্থ হয়েছেন তা পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে।

'ন্যায়দর্শন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার ব্যাৎস্যায়নের অভিমত আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'ন্যায়বার্তিক'-কার উদ্যোতকর এবং 'তাৎপর্যটীকা'-কার বাচস্পতি মিশ্রের বিভিন্ন ঈশ্বরসাধক যুক্তিসমূহও এরমাঝে আলোচনা করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনের ঈশ্বরসিদ্ধিসূচক আলোচনাকালে আমরা দেখেছি তাঁদের মতে জগৎ-কর্তৃত্বই ঈশ্বর সিদ্ধির প্রধান হেতু। এক কথায়, জগৎ-কর্তৃত্ব সিদ্ধ না হলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধন করা সম্ভব নয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে ন্যায়-বৈশেষিক ঈশ্বর-সিদ্ধির বিরুদ্ধে বৌদ্ধ প্রতিবাদের আলোচনাকালে এই বিষয়টিই ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ, ন্যায়-বৈশেষিক এবং বিশেষ করে 'কুসুমাঞ্জলি'-কার উদয়নাচার্যের ঈশ্বরসিদ্ধির বিরুদ্ধে বিশ্রুতকীর্তি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর যুক্তিসমূহ এখানে অবশ্যই স্মরণীয়[৮১]।

৭৮। 'এটা এক' এবং 'ঐটি আর এক'—এভাবে বস্তুর পৃথক পৃথক ভাবে একত্ব সংখ্যাজ্ঞানকেই অপেক্ষা-বুদ্ধি বলা হয়।

৭৯। দ্ব্যণুকপরিমাণং সংখ্যাজন্যং পরিমাণপ্রচয়াজন্যত্বে সতি জন্য পরিমাণত্বাৎ। (কুসুমাঞ্জলি; হরিদাসী টীকা ৫।১)।

৮০। **রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঃ 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ'**; পৃঃ ৭৪ দ্রষ্টব্য; (চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩; সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)।

৮১। ঐ; পৃঃ ৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত ঈশ্বর-সিদ্ধির বিরুদ্ধে বৌদ্ধ প্রতিবাদ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ যে ক্ষুরধার যুক্তি এবং অতুলনীয় নিপুণতার সঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক-সম্মত ঈশ্বর-সিদ্ধিকে খণ্ডণ করেছেন তা-ই এখন আমাদের আলোচ্য।

ঈশ্বরকে যুক্তি-সিদ্ধ হিসাবে উপস্থাপনের পক্ষে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সকল যুক্তির মূলভিত্তি হচ্ছে—'নিত্য-সর্বজ্ঞতা'। একজন নিত্য-সর্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকলে বিশ্বনির্মাণ সম্ভব নয়—এটাই হচ্ছে তাঁদের বক্তব্যের ও যুক্তিজালের সার কথা। বৌদ্ধগণ ভগবান তথাগতকে 'সর্বজ্ঞ' বলে স্বীকার করেন ; কিন্তু 'নিত্যসর্বজ্ঞতা' তাঁদের মতে অ-সিদ্ধ। বৌদ্ধ-দার্শনিকদের মধ্যে বিশ্রুতকীর্তি আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর ''প্রমাণবার্তিক'' গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ-কে প্রমাণরূপে স্বীকাব করেছেন।[৮২] একথার মুখ্য তাৎপর্য হচ্ছে যথাযথ সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিকে প্রমাণ-পুরুষ রূপে গ্রহণ করা চলে। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর কঠোর সাধনার মাধ্যমে সত্যকে অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং নিজের প্রজ্ঞালব্ধ সত্যকে জগতের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সেই উপদেশাবলী মহান 'আর্যসত্য চতুষ্টয়' নামে খ্যাত। অপরের পক্ষে যা অনুভব করা সম্ভব হয় নি সেই পরম সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন বলেই ভগবান বুদ্ধদেব প্রমাণ-পুরুষ হিসাবে বিদিত—এই হচ্ছে বৌদ্ধদের বক্তব্য।[৮৩] ধর্মকীর্তির এই সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায় ভগবান বুদ্ধদেবের সর্বজ্ঞতা প্রমাণ-সিদ্ধ বলেই বুদ্ধদেবকে প্রমাণ-পুরুষ রূপে গ্রহণ করা সম্ভব। ন্যায়-সম্মত নিত্যসর্বজ্ঞতা যদি অনুরূপভাবে প্রমাণ-সিদ্ধ হয় তা হলে নিশ্চয়ই তা মেনে নেয়া যায় ; কিন্তু নিত্যসর্বজ্ঞতা প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। আচার্য ধর্মকীর্তি 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য হাজির করে

৮২। এখানে 'ভগবান' শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও প্রশংসাসূচক বিশেষণ মাত্র। এই 'ভগবান' শব্দটি আদৌ জগৎ-কর্তা ঈশ্বর-সূচক নয়। বৌদ্ধমতে চারটি আর্য সত্যের যথার্থ উপলব্ধির ফলে বুদ্ধত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু নিত্য-সর্বজ্ঞ বৌদ্ধমতে অসম্ভব ও অযৌক্তিক। 'তদ্বৎ প্রমাণং ভগবান্' ; **প্রমাণবার্তিক** ; ১।৭

৮৩। যথাবিহিতস্য সত্যচতুষ্টয়স্য অবিসংবাদনাৎ তস্যৈব পরৈরজ্ঞাতস্য প্রকাশনাচ্চ ; (**প্রমাণবার্তিক** ; মনোরথনন্দীকৃত টীকা)।

বলেছেন ঃ নিত্যং প্রমাণং নৈবাস্তি প্রামাণ্যাৎ বস্তুসদগতেঃ। জ্ঞেয়ানিত্যতয়া তস্যা অধ্রৌব্যাৎ; ক্রমজন্মনাম্ ॥ নিত্যাদুৎপত্তি বিশ্লেষাদপেক্ষায়া অযোগতঃ। কথঞ্চিৎ নোপকার্যত্বাদনিত্যেপ্যপ্রমাণতা॥ (১।১০-১১)।

একথার তাৎপর্য হচ্ছে, এই সমগ্র জগতের নির্মাণকর্তা কেউ যদি থাকেন তা হলে তিনি নিত্য বা অ-নিত্য এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আলোচনা করলে দেখা যায় জগতের নির্মাণকর্তা নিত্য বা অনিত্য কিছুই হতে পারেন না। সুতরাং জগতের নির্মাণকর্তা কেউ নেই এই হচ্ছে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত। স্বভাবতঃ এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত এসেছে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে; বৌদ্ধমতে সমস্ত সদ্বস্তুই ক্ষণিক। সুতরাং বস্তুর ক্ষণিকতা স্বীকার করে নিয়েই বৌদ্ধমতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। প্রাসঙ্গিক বৌদ্ধযুক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

নিত্য-জগৎকর্তা প্রমাণসিদ্ধ নয় তার কারণ প্রতিটি বস্তুই স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। বস্তুর উৎপাদক একজন নিত্যকর্তা থাকলে কখনও বস্তু এরূপ হতে পারত না: কেননা কর্তা যদি নিত্য হন তাঁর বস্তু নির্মাণসামর্থ্য নিত্য একথাও অবশ্য-স্বীকার্য। বস্তু নির্মাণের উপযোগী প্রযত্নই প্রকৃত কর্তৃত্ব; সুতরাং সেই প্রযত্ন নিত্য হলে বস্তুর উৎপত্তি নিত্য হবে অর্থাৎ নির্মিত বস্তুও হবে নিত্য—এটা যুক্তি এবং অনুভব-সিদ্ধ। ধর্মকীর্তি প্রসঙ্গতঃ এখানে বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে বৌদ্ধমতের উল্লেখ করে বলেছেন, যা 'অর্থক্রিয়াকারী' অর্থাৎ যার প্রয়োজন-সিদ্ধির যোগ্যতা রয়েছে তা-ই বস্তু। প্রতিটি বস্তুরই একটি অনন্যসাধারণ সামর্থ্য আছে এবং সে সামর্থ্য এক একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'জল' একটি বস্তু যার 'তৃষ্ণা নিবারণের সামর্থ্য' রয়েছে। কিন্তু পিপাসার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণানিবারণ কেবল একটি ক্ষণেই সম্পাদিত হয়; অন্য সময়ে জল তৃষ্ণা নিবারণ করে কি না তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত নয়, কেবল অনুমানের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং জলের তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা যে মুহূর্তে অনুভূত হয় জলের অস্তিত্ব শুধু সেই ক্ষণটিতেই সিদ্ধ; অন্য সময়ে ঐ নির্দিষ্ট ক্ষণের তৃষ্ণা নিবারক জল বিদ্যমান ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। বৌদ্ধসম্মত ক্ষণভঙ্গবাদের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; আমরা শুধু বৌদ্ধসিদ্ধান্তের উল্লেখ করছি—'প্রতিটি বস্তু যেই ক্ষণে তার অনন্যসাধারণত্বের জন্য নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে শুধু

সে সময়েই সেই বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়; অন্য সময়ে ঐ ক্ষণের প্রয়োজন সিদ্ধিকারক বস্তুর বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয় না। কেননা যে বস্তু অনন্যসাধারণ যে প্রয়োজনটি সিদ্ধ করে সেই বস্তুটিই সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির একমাত্র কারণ; সুতরাং বস্তুটি যদি পূর্বেও বিদ্যমান থাকত তা হলে বর্তমানের প্রয়োজন-সিদ্ধি পূর্বেই সিদ্ধ হত অথবা ভবিষ্যৎ প্রয়োজন-সিদ্ধি বর্তমানে হতে পারত। কিন্তু তা যে হয় না তা সকলেই জানেন। একেকটি ক্রিয়া সম্পাদনের অনন্যশক্তিমান বস্তুটি বিদ্যমান থাকলে সেই বস্তু-নিষ্পাদ্য ক্রিয়া সম্পাদিত না হবার কোনোই যুক্তি নেই। আবার বস্তুটি বিদ্যমান থেকেও যদি তার নিজস্ব ক্রিয়া সম্পাদন করতে না পারে তা হলে সেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ-সিদ্ধ হয় না। কারণ প্রয়োজন-সিদ্ধির সামর্থ্যই হচ্ছে বস্তুর সত্তা। তাই দেখা যায়, প্রত্যেকটি বস্তু কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ক্ষণেই স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে বলে ঐ ক্ষণেই সেই বস্তুর সত্তা প্রমাণিত হয়।' ঈশ্বর-সাধক যুক্তিপ্রসঙ্গে এই মতবাদের তাৎপর্য স্পষ্ট এবং এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ধর্মকীর্তি বলেছেন ঃ বস্তু ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য বা স্থির নয়। বস্তুর নিত্যত্বই যদি প্রমাণ-সিদ্ধ না হয় তবে তথাকথিত জগৎকর্তাকেও নিত্য বলা অসম্ভব কেননা সেই জগৎকর্তাও তো একটি সৎ বস্তু। যা সৎ তা-ই ক্ষণিক; অতএব জগৎকর্তাও ক্ষণিক এবং সেই জগৎকর্তাও নিত্য হতে পারেন না। অন্যদিকে জগৎকর্তা যদি নিত্য হন তা হলে জগৎ-কর্তৃত্ব তাঁর নিত্যই রয়েছে—একথাও মানতে হয়। বহ্নি এবং উষ্ণত্ব যেমন অভিন্ন তেমনই জগৎকর্তা ও তার কর্তৃত্বও অভিন্ন হবে; তাই জগৎকর্তা নিত্য হলে তার জগৎ-কর্তৃত্বও নিত্য হবে। জগৎ বললে অতীত, বর্তমান ও অনাগত এ কালত্রয়ের সমগ্র জগৎকেই বুঝতে হবে। সুতরাং জগৎকর্তা যদি নিত্য বা স্থির হন তাহলে তিনি একই সময়ে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করবেন। তা যদি না করেন তা হলে সমস্ত জগতের কর্তৃত্ব একজনেরই রয়েছে তা প্রমাণিত হবে না। সুতরাং ঈশ্বরকে নিত্য বলে মেনে নিলে সমগ্র জগতের উৎপত্তি নিত্যই হবে: অতীতে উৎপন্ন 'হয়েছিল' বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন 'হবে' এরূপ যুক্তি সিদ্ধ হয় না। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ সমগ্র জগতের উৎপত্তি নিত্য বলে স্বীকার করেন না। তারা প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব স্বীকার করে নিয়ে স্পষ্টতঃ বোঝাতে চেয়েছেন যে জাগতিক বস্তুর উৎপত্তির কালভেদ আছে।[৮৪] বৌদ্ধদের যুক্তি হচ্ছে,—একদিকে বস্তুর উৎপত্তির কালভেদ

স্বীকার করবেন অথচ বলবেন উৎপাদনকর্তা তাঁর সমূহ উৎপাদন-সামর্থ্য নিয়ে নিত্য বিরাজ করছেন নৈয়ায়িকদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ।

নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন,—বস্তুর উৎপত্তি বা কোনো কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে সেই ক্রিয়া-সম্পাদনে সমর্থ কর্তাই একমাত্র কারণ নন; 'কাল' প্রভৃতি সহকারী অন্যবিধ সহকারী কারণও প্রয়োজন। জগৎ-নির্মাণে সমর্থ ঈশ্বর নিত্য হলেও উৎপত্তির সহকারী কারণসমূহের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হলে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর নিত্য হলেও প্রতিটি বস্তুব উৎপত্তির সহকারী কারণের নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত না হলে বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না; সুতরাং 'কালভেদে বস্তুর উৎপত্তি ঈশ্বরের নিত্যত্বের বাধক নয়।' এই যুক্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, 'সহকারী' কারণ কার্য উৎপত্তির পক্ষে প্রয়োজন এ কথাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। প্রথমেই জিজ্ঞেস করা যায়, 'সহকারী' কারণ কাকে বলে? যা মূল কাবণ বলে স্বীকৃত কার্যোৎপত্তির পক্ষে তা-ই যদি পর্য্যাপ্ত হয় তাহলে সহকারী কারণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। সহকারী কারণের এমন কোনো শক্তি নেই যাব জোরে সে কার্য উৎপাদনের সমূহ শক্তিসামর্থ্যশূন্য বস্তুকেও কার্যোৎপাদক করে তুলতে পারে। আর যদি সহকারী কারণ উপস্থিত হলেই কার্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় তা হলে তাকে 'সহকারী' না বলে 'মূল' কারণ বলাই সঙ্গত। যার উপস্থিতিতে কার্য উৎপন্ন হয় এবং অনুপস্থিতিতে কার্য হয় না তা-ই তো মূল কারণ সুতরাং সহকারী কারণ না থাকলে যদি কার্যের উৎপত্তি হয় তবে তাকে আর 'সহকারী' কারণ বলা চলে না—তাকে মূল কারণ বলেই অভিহিত করতে হয়। আবার সহকারী কারণ উপস্থিত হয়েও যদি মূল কারণের কোনো উপকার না করে অর্থাৎ সহকারী কারণকে বাদ দিয়েই যদি মূল কারণের কার্য উৎপাদনের অনুকূল সামগ্রিক শক্তিই স্বীকৃত হয়, তা হলে সহকারী কারণ 'ছাগের গল-লম্বিত স্তনের মতো'ই (অজাগলস্তনস্যেব) নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। ছাগের গলায় যে স্তনের মতো থাকে তাতে কি আর ছাগশিশুর দুগ্ধপান সম্ভব হয়? এই হচ্ছে

৮৪। বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে সমবায়ী কারণে বস্তুর যে অভাব থাকে তার নাম প্রাগভাব এবং উৎপন্ন বস্তু বিনষ্ট হলে যে অভাব জন্মে তা হচ্ছে ধ্বংসাভাব। কর্দমপিণ্ডে ঘটের প্রাগভাব; কিন্তু সৃষ্ট ঘটটি নষ্ট হয়ে গেলে যে অভাব তা হচ্ছে ধ্বংসাভাব।

সহায়ক কারণ সম্পর্কিত নৈয়ায়িক বক্তব্যের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের সরস অথচ তীক্ষ্ণ কশাঘাত!

আবার অনেকে বলেন, মূল কারণের স্বভাব হচ্ছে এমন যে সহকারী কারণের সঙ্গে মিলিত হয়েই তা নিজ কার্য উৎপাদন করে এবং সহকারী কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তিই অসম্ভব। এর জবাবে বলা যায়—মূল কারণের স্বভাব সম্পর্কে একথা মেনে নিলে সহকারী কারণ কখনও মূল কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না তা স্বীকার করে নিতেই হয় এবং মেনে নিতে হয় যে কারণের এই স্বভাব অনুসারেই সর্বদা সহকারী কারণকে মূল কারণের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। তা হলে মূল কারণ থাকলেই সহকারী কারণের অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হবে। একথা স্পষ্ট, মূল কারণ তা হলে কখনও সহকারী কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না। এই অবস্থায় মূল কারণ থাকলেই সহকারী কারণ থাকবে এটা মেনে নিতে হয়। অতএব নিত্য ঈশ্বর জগৎকর্তা এবং তার সহকারী কারণ হচ্ছে বিভিন্ন 'কাল' এই যুক্তি দিয়েও ন্যায়মতের প্রতিষ্ঠা হবে না, কেননা তাঁদের মতে ঈশ্বর সর্বদেশে, সর্বকালেই রয়েছেন এবং কালকেও তারা নিত্য বলে স্বীকার করেন। সহকারী কারণ 'কাল' সর্বদাই জগৎকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে অবিযুক্তভাবে অবস্থিত বলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ উৎপত্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

একথা তাহলে মেনে নিতে হয় যে ঈশ্বর যদি আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সহকারী রূপে কালের অপেক্ষা করেন তা হলে একথাই প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির উপযোগী সামগ্রিক শক্তি নেই। কারণ সামগ্রিক শক্তি থাকলে অপর কারও অপেক্ষায় থাকতে হয় না। ফলে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বই অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশ্বসৃষ্টির সামগ্রিক শক্তি যার রয়েছে একমাত্র তাঁকেই বিশ্বের স্রষ্টা বলা যায়। যদি এককভাবে ঈশ্বরের সেই শক্তিই না থাকে তবে তাঁর জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না; আবার যদি তাঁর অন্য-নিরপেক্ষ এই শক্তি থাকে তবে ঈশ্বর নিজেই বিশ্বনির্মাণে সমর্থ একথা মেনে নিতে হয়। তা হলে আবার যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে একথা কোনো প্রকারেই অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং ঈশ্বরের 'নিত্যত্ব' যুক্তি বা প্রমাণ-সিদ্ধ নয়।

বৌদ্ধ আচার্য ধর্মকীর্তির ক্ষুরধার ঈশ্বর-বাধক এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে তাঁর যুক্তি সমূহের তীক্ষ্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "ন্যায়

মঞ্জরী''-কার জয়ন্ত ভট্ট দার্শনিক তীব্র মতপার্থক্য সত্ত্বেও ধর্মকীর্তি প্রসঙ্গে 'জগদভিভবধীরধীমতিঃ ধর্মকীর্তিঃ' অর্থাৎ জগতকে অভিভূত করার মতো শক্তিমান বুদ্ধিসম্পন্ন স্থিরমতি ধর্মকীর্তি বলে যে প্রশস্তিসূচক উক্তি করেছেন তা এই সঙ্গে সহজেই মনে পড়ে। বৌদ্ধ-পণ্ডিত শান্তরক্ষিতও তাঁর ''তত্ত্বসংগ্রহ'' নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ঈশ্বর-সাধক যুক্তি সমূহকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং আনুপূর্বিকভাবে সেগুলোকে খণ্ডন করেছেন। ঈশ্বর-খণ্ডনাত্মক যুক্তি সমূহ উপস্থাপনের পূর্বে শান্তরক্ষিত ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যদের ঈশ্বর সাধক যুক্তি সমূহের অবতারণা ও আলোচনা করেছেন এবং 'তত্ত্বসংগ্রহের টীকাকার' কমলশীল দেখিয়ে দিয়েছেন অবিদ্ধকর্ণ ও উদ্যোতকর প্রমুখ ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যদের যুক্তি সমূহ থেকে নানা উদ্ধৃতিও শান্তরক্ষিত দিয়েছেন। অর্থাৎ শান্তরক্ষিত ঈশ্বর-সাধক সমূহ যুক্তিকে নৈয়ায়িক নিশ্চয়তার নিরিখেই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; এখন আমরা সেই আলোচনাই শুরু করছি।

ন্যায়-মতে অচেতন পরমাণুসমূহ সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়বী নামক কার্য সৃষ্টি করে। অচেতন বস্তু চেতনের প্রেরণা ভিন্ন স্বয়ং কার্য আরম্ভ করতে প্রবৃত্ত হতে পারে না—কারণ প্রযত্ন বা প্রবৃত্তি অচেতনের ধর্ম নয়, তা চেতনেরই ধর্ম। অতএব যে চেতনের ইচ্ছায় সমস্ত অচেতন পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়ে কার্য আরম্ভ করে সেই চেতনই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর।

কিন্তু অচেতন পরমাণু সমুহ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কার্য আরম্ভ করে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর যথার্থ অবয়ব-সন্নিবেশেই কার্যের আরম্ভ হয় শান্তরক্ষিত এই মূল ভিত্তিকেই আক্রমণ করেছেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য, অবয়ব-সন্নিবেশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ অতএব তা দৃশ্য। অবয়বীও দৃশ্য পদার্থ কারণ কণাদ-সূত্রে স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হয়েছে মহৎ বস্তু অনেক দ্রব্যবিশিষ্ট এবং কোনো কোনো স্থলে রূপবিশিষ্ট বলে তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, ন্যায় বৈশেষিক মতে স্বীকৃত অভিন্ন ষট্ পদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ ও জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; তার মধ্যে ক্ষিতি, অপ ও তেজ এই তিনটি দ্রব্য বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ন্যায়মতে পূর্বের তিনটি এবং বায়ু এ চারটি দ্রব্যই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দ্রব্যের মধ্যে এ চারটি অনিত্য, অন্যান্য দ্রব্য নিত্য বলে সেই সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তি ন্যায় বৈশেষিক মতে অসম্ভব হওয়ায় তাদের জন্য ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা নেই। কারণ জন্য-বস্তুর

কর্তারূপেই ঈশ্বর স্বীকৃত সুতরাং যে সমস্ত জন্য-বস্তুর কর্তারূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন সেই সমস্ত জন্য-বস্তু দৃশ্য পদার্থ একথা বলা যায়। এখানে প্রথমেই বলা যায়, যাকে অবয়বী বলে স্বীকার করা হয়েছে তা অবয়বীনিষ্ঠ রূপ, রস প্রভৃতি গুণের অতিরিক্ত রূপে কখনও বুদ্ধিগোচর হয় না। ঘট এবং ঘটের রূপ যদি ভিন্ন হত তা হলে রূপকে বাদ দিয়েও ঘটের প্রত্যক্ষ হতে পারত অথবা ঘটকে বাদ দিয়েও রূপের প্রত্যক্ষ হতে পারত। কিন্তু তা হয় না। কোনো অবস্থাতেই রূপহীন ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না অথবা ঘটহীন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। দুটি বস্তু ভিন্ন হলে এরূপ হতে পারে না কারণ দুটি বস্তু পৃথক অথচ তাদের প্রত্যক্ষ পৃথকভাবে হয় না, মিলিতভাবে হয় একথা স্বীকার করার পেছনে কোনো যুক্তিই নেই। সুতরাং ঘট এবং ঘটের রূপ যা প্রত্যক্ষ-গোচর তা পৃথকভাবে প্রত্যক্ষগম্য না হওয়ায় এই দুটোকে পৃথক বলা যাবে না অর্থাৎ রূপ ও রূপের আশ্রয় পৃথক বস্তু নয়।

যদি বলা হয় রূপের আশ্রয় পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয় বলেই সেখানে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে পরমাণু সমূহে রূপ নেই। পরমাণুতে রূপ না থাকলে কার্যদ্রব্যও রূপ থাকতে পারত না। কেননা কারণে যে গুণ থাকে কার্যদ্রব্যে সেই গুণগুলোই সংগঠিত ও সংহত হয়। শ্বেত বর্ণের সূত্র দিয়ে নির্মিত বস্ত্র শ্বেত বর্ণই হয়, অন্য বর্ণের হয় না। সুতরাং কার্যদ্রব্যের রূপ প্রভৃতি গুণ কারণদ্রব্য থেকেই উদ্ভূত অতএব রূপ এবং দ্রব্য যদি পৃথক না হত তা হলে বিভিন্ন কার্যদ্রব্যের বিভিন্ন গুণ অর্থাৎ শুক্লত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি গুণ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা নির্ধারিণ করা যেত না; তাই দ্রব্য ও গুণ অর্থাৎ রূপ প্রভৃতি পৃথক।

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে পরমাণু সমূহের দ্বারা গঠিত দ্রব্য (যেমন ঘট প্রভৃতি) প্রত্যক্ষগম্য হয় তা সর্বসম্মত। দ্রব্যের অবয়ব পরমাণু সমূহ যদি প্রত্যক্ষগম্য না হয় তা হলে ঐ অবয়ব সমূহের বিশিষ্ট অবস্থা অর্থাৎ অবয়বী প্রত্যক্ষগোচর হতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ যদি পরমাণুকে অতীন্দ্রিয় বলে স্বীকার করেন তা হলে পরমাণুসমূহ পুঞ্জীভূত অবস্থায় প্রত্যক্ষগম্য হবে কেমন করে? সুতরাং ঘট এবং ঘটের আরম্ভ পরমাণু ও ঘটের রূপ এদের কিছুই পৃথক বস্তু নয়। তারই জন্য ঈশ্বর জগতের কর্তা এই অনুমান করার সময় নৈয়ায়িকগণ ঘট প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্ত

ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে অর্থাৎ দু'টি তুলনীয়ের মধ্যে তুল্যভাব না থাকলে দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না। পৃথিবী বিশেষ কোনো কর্তার দ্বারা নির্মিত কেননা তা একটি কার্য এই অনুমানে ঘটকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ঘটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় ঘট যে রকম কার্যদ্রব্য তাতে কর্তার কোনো প্রয়োজন নেই তা হলে এই দৃষ্টান্ত ন্যায়-উত্থাপিত অনুমানের অনুকূল হবে না। আর দৃষ্টান্ত অনুকূল না হলে অনুমানও সিদ্ধ হবে না।

প্রদত্ত যুক্তিধারার সাহায্যে শান্তরক্ষিত বোঝাতে চেয়েছেন প্রতিটি কার্যদ্রব্যই অবয়বের বিশেষ সন্নিবেশের ফলেই উৎপন্ন হয় এবং এই অবয়ব-সন্নিবেশের জন্যই কর্তার প্রয়োজন; ঘট এ রকমই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু তা কোনো অবয়ব-সন্নিবেশ জাত নয় কারণ যে প্রক্রিয়ায় ন্যায়মতে ঘটের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়েছে সেই প্রণালীই যুক্তিসিদ্ধ নয়। অতএব ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে যে অনুমান প্রদর্শিত হয়েছে সেই অনুমানই সিদ্ধ নয়। এ যুক্তিই ''তত্ত্বসংগ্রহ'' গ্রন্থের ৫৭ সংখ্যক কারিকায় শান্তরক্ষিত উপস্থিত করেছেন ঃ দৃশ্যাত্বেনাভ্যুপেতস্য দ্বয়স্যানুপলম্ভনাৎ। সাধনানন্বিতং চেদমুদাহরণমপ্যতঃ॥[৮৫]

তারপর শান্তরক্ষিত অন্যভাবে নৈয়ায়িকদের উত্থাপিত অনুমানের দোষ প্রদর্শন করেছেন। নৈয়ায়িকগণ তাঁদের অনুমানে 'পক্ষ' হিসাবে যা উল্লেখ করেছেন, পক্ষরূপে অভিমত সেই বস্তুটি সিদ্ধ না হলে **আশ্রয়াসিদ্ধি**[৮৬] হেত্বাভাস ঘটবে। হেতুর আশ্রয় যে পক্ষে সাধ্যের

৮৫। পরার্থানুমানেব ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত, হেতু প্রভৃতি অবযব উল্লেখ কবতে হয; দৃষ্টান্তেব সাহায্যেই হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি নির্ধারিত হয। সুতরাং দৃষ্টান্ত এমন একটি ক্ষেত্র হবে যেখানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি বাদী ও প্রতিবাদী উভযের কাছেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত যদি প্রতিবাদী খণ্ডন করতে পাবেন তা হলে দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হওয়ায় হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি নির্ধারিত হয় না; ফলে বাদ-প্রদর্শিত অনুমান সিদ্ধ হয় না। ঘট সম্পর্কিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ কবে নৈয়ায়িকগণ জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরের অনুমান করতে প্রবৃত্ত হয়ে কার্যত্বকেই হেতু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যা কিছু কার্য তা-ই কোনো না কোনো কর্তার দ্বারা উৎপাদিত—এই হচ্ছে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ঘট এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু ঘটের সামগ্রিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শান্তরক্ষিত বোঝাতে চেয়েছেন নৈয়ায়িকসম্মত প্রণালী অনুযায়ী ঘট দৃষ্টান্ত হিসাবে সিদ্ধ নয়। ফলে দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হওয়ায় নৈয়ায়িক এই অনুমানটি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অনুমান করা হবে সেই পক্ষটিই যদি অসিদ্ধ হয় তা হলে অনুমান যথার্থ হবে না। এখানে পৃথিবী প্রভৃতি ন্যায়মতে পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। পৃথিবী বললে ন্যায়মতে কেবলমাত্র স্থূল পৃথিবীকেই বোঝা যায় না, পার্থিব পরমাণুকেও বোঝায়। সুতরাং ন্যায়মতে যা পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে তার দুটি ধর্ম দেখা যায়—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্যত্ব নামক একটি ধর্ম (পার্থিব পরমাণুতে যা থাকে) এবং দ্বিতীয় ধর্মটি হচ্ছে দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। পৃথিবী চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের যোগ্য বলে দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নামক ধর্ম পৃথিবীতে রয়েছে। সুতরাং দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্যতা এই দুটি ধর্মই পক্ষরূপে নির্দিষ্ট পৃথিবীতে রয়েছে—এই হল নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত। পরমাণু ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং পরমাণু ন্যায়মতে নিত্য বলে স্বীকৃত; সুতরাং সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে সকর্তৃকত্ব ধর্ম থাকে না একথা নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। কিন্তু স্থূল পৃথিবীতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সকর্তৃকত্ব রয়েছে এটা নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। শান্তরক্ষিত দৃঢ়ভাবেই বলতে চান এমন কোনো ধর্মী বা পক্ষ নেই যেখানে ইন্দ্রিয়দ্বয়গ্রাহ্যত্ব ধর্ম রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, চাক্ষুষজ্ঞান এবং স্পার্শনজ্ঞান দুটি ভিন্ন বিষয়েরই জ্ঞান হয়। রূপ চাক্ষুষজ্ঞানের এবং কঠিনতা, কোমলতা ইত্যাদি স্পর্শজাত জ্ঞানের বিষয়। এর যে কোনো একটি বিষয় দু'টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে না। রূপ এবং স্পর্শ এই দু'টির ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে না। রূপ এবং স্পর্শ এই দু'টির অতিরিক্ত এদের আশ্রয় হিসাবে দ্রব্য নামক পদার্থ পাওয়া যায় না একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং চক্ষুর সাহায্যে প্রাপ্ত এবং স্পর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান দু'টি পৃথক বিষয়ের জ্ঞান বলেই এই দু'টি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক।[৮৭]

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় চক্ষু রূপকেই গ্রহণ করে; অন্য কিছুকে

৮৬। প্রতিটি বিশুদ্ধ অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু, পক্ষ ও সাধ্যের প্রসিদ্ধি থাকা চাই। কল্পিত বস্তু বা কল্পিত ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নিয়ে কোনো অনুমান করা চলে না। যদি বলা হয় 'গগনারবিন্দ সরোজারবিন্দের মতোই সুগন্ধি কেননা সকল অরবিন্দই সুগন্ধি' তা হলে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ ঘটবে; কারণ গগনারবিন্দ বলে কোনো বস্তুই নেই। কাজেই এই অনুমানে হেতুর আশ্রয় বা পক্ষ বলে এই অনুমান আশ্রয়াসিদ্ধি দোষে দুষ্ট।

৮৭। ন্যায়মতে রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি দ্রব্যের গুণ। দ্রব্য ও গুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং একই পদার্থে রূপ এবং স্পর্শ বিদ্যমান থাকায় চক্ষুদ্বারা রূপের আশ্রয় হিসাবে পৃথিবী নামক দ্রব্যকে যেমন গ্রহণ করা যায় তেমনই ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যেও

নয়। ত্বগিন্দ্রিয় শুধু স্পর্শকেই গ্রহণ করে, অন্য কিছুকে নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রতিটি বস্তু একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দু'টি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোনো বস্তু হয় না। সুতরাং যে যে জ্ঞানে যে যে বিষয়ের প্রতিভাস হয় সেই সেই জ্ঞান প্রতিভাস-সম্পর্ক সেই সেই বিষয়েরই গ্রাহক হয়। অতএব কোনো একটি বস্তুই দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দু'টি-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হতে পারে না। এর ফলে অবয়বী একটি বস্তু এবং তা একাধিক ইন্দ্রিয়ের গৃহীত এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।[৮৮]

কিন্তু ন্যায়মতে দৃশ্যবস্তু দু'টি-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হতে পারে। বৌদ্ধমতে দৃশ্যবস্তু অবয়বী নয় এবং দ্রব্য ও তার গুণ পৃথকও নয়। সুতরাং প্রতিটি বস্তুই যে কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় এই হচ্ছে দৃশ্যবস্তুর নিয়ম। অতএব অবয়বী দৃশ্যবস্তুরূপে স্বীকৃত হওয়ায় তা দু'টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হতে পারে না। এতে অবয়বী অসিদ্ধ হবে।

প্রতিবাদে নৈয়ায়িকেরা বলেন, যে ঘটকে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, বর্তমান সেই ঘটকেই স্পর্শ করছি এই প্রতীতি অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় তা-ই স্পর্শের বিষয় একথা মানা যায়। ফলে রূপ এবং রূপের আশ্রয়, স্পর্শ এবং তার আশ্রয় ভিন্ন হিসাবেই সিদ্ধ হবে। কারণ চক্ষু রূপকে গ্রহণ করে এবং ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শকে গ্রহণ করে। রূপ ও স্পর্শ যে ভিন্ন ও বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই ; কিন্তু যা দেখেছি তাকেই স্পর্শ করছি এরূপ অনুভবের মধ্যে চাক্ষুষজ্ঞান ও স্পার্শনজ্ঞানের অভিন্ন বিষয়রূপে যার প্রতীতি হয় সে রূপ ও স্পর্শ থেকে ভিন্ন। সুতরাং অবয়বী নামক দ্রব্য না থাকলে রূপ এবং স্পর্শগুণ থেকে ভিন্ন অথচ উভয় প্রতীতির বিষয় অভিন্ন বস্তু সিদ্ধ হতে পারে না। অতএব অবয়বীকে মানতেই হয়। এর উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন যাকে স্পর্শ করেছি তাকেই দেখছি অথবা যাকে দেখেছি তাকে স্পর্শ করছি এরূপ দুটি জ্ঞানের

স্পর্শের আশ্রয় পৃথিবীকে গ্রহণ করা যায়। এখানে অবিদ্ধকর্ণের অভিমতটি স্মরণীয়। সুতরাং ন্যায়মতে পৃথিবী নামক দ্রব্য দু'টি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। কিন্তু বৌদ্ধমতে রূপ, স্পর্শ প্রভৃতির অতিরিক্ত দ্রব্য নামক কোনো আশ্রয় নেই। সুতরাং একটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে *একটি বস্তুকেই জানা সম্ভব। কোনো বস্তুই দু'টি-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হতে পারে না।* দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব তাই অগ্রহণযোগ্য। (তত্ত্বসংগ্রহঃ কারিকা, ৫৮)

৮৮। নৈয়ায়িক মতে রূপবিশিষ্ট দ্রব্য স্পর্শগুণবিশিষ্টও হয়। সুতরাং একই দ্রব্য *চক্ষু এবং ত্বক এই উভয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হতে পারে।*

মধ্যে অনুগত একটি বিষয় নেই। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট এক একটি বিষয়েরই গ্রাহক এবং প্রত্যেকটি সৎ পদার্থ ক্ষণিক বলে প্রসিদ্ধ। অতএব চক্ষু যে বিষয়টিকে গ্রহণ করে সেই বিষয়টি পরবর্তী ক্ষণে থাকতেই পারে না এবং চক্ষুগ্রাহ্য যে বিষয় তা-ই যদি ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় তা হলে জ্ঞানকে নির্দিষ্ট বিষয়ের নিয়ন্ত্রক বলা যাবে না। প্রত্যেকটি জ্ঞান তার বিষয়কেই প্রকাশ করে অন্যকে নয়। ঘট-জ্ঞান ঘটকেই প্রকাশ করে অন্য কিছুকে নয়; সুতরাং চাক্ষুষজ্ঞানের যা বিষয় তা কেবলমাত্র চাক্ষুষজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হবে, স্পার্শনজ্ঞানের দ্বারা তা প্রকাশিত হবে না। তাছাড়া বস্তুটি ক্ষণিক বলে বিভিন্ন ক্ষণে তার অবস্থিতি অসম্ভব বলে এক একটি ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান তার সমকালোৎপন্ন বিষয়েরই গ্রাহক হতে পারে, অন্য কালে উৎপন্ন বিষয়ের তা গ্রাহক হতে পারে না। অতএব রূপজ্ঞান যেই ক্ষণে হল সে ক্ষণে জ্ঞানের বিষয় যে রূপ তা পরবর্তী ক্ষণে থাকে না। অতএব পরবর্তী ক্ষণে ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হবে তা রূপজ্ঞানের বিষয় থেকে ভিন্ন। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে বিচার করলে **যা দেখেছি** এবং **যা স্পর্শ করছি** এই দুটি জ্ঞানের বিষয় অভিন্ন নয়। সুতরাং অভিন্নতার যে প্রতীতি তা ভ্রান্তিমাত্র। আচার্য শান্তরক্ষিতের ভাষায় ঃ তৎসামর্থ্যসমুদ্ভূতকল্পনানুগতাত্মকম্। প্রতিসন্ধানবিজ্ঞানং সমূদায়ং ব্যবস্যতি॥ (তত্ত্বসংগ্রহ; ৫৯ কারিকা;)।

এই আলোচনা থেকে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত হল রূপ প্রভৃতি দ্রব্য নামক বস্তু থেকে পৃথক নয় সুতরাং রূপ-রসাদির আশ্রয় দ্রব্য নামক অবয়বী সিদ্ধ হয় না। অবয়বী সিদ্ধ না হলে ও অবয়বের প্রত্যক্ষের সাহায্যে অবয়বীর নির্মাণকৌশল না জানলে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎ নির্মাণকর্তা এই মূল সিদ্ধান্তই ব্যাহত হবে। অবয়বী বলে একটি বস্তু সিদ্ধ হলেই অবয়বীর উপাদান অবয়বসমূহের পরিজ্ঞাতা ও নির্মাণকৌশলে অভিজ্ঞ একজন কর্তা স্বীকার করার অবশ্যকতা থাকে। কিন্তু অবয়বী বলে কিছুই যদি সিদ্ধ না হয় তা হলে নৈয়ায়িকগণ-কথিত একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া সর্বত্রই অবয়ব-সন্নিবেশের জন্য একজন কর্তার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক; কেননা এই *সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হলে প্রমাণ করা চাই যে যেখানে অবয়ব সন্নিবেশ রয়েছে সেখানেই এই সন্নিবেশ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্তার* প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু তা প্রমাণিত হয় না; প্রত্যক্ষের সাহায্যেই

এরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করতে হবে অথচ প্রত্যক্ষ এ ধরনের ব্যাপ্তির বিরোধী। পর্বত, নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অবয়ব সন্নিবেশের দৃষ্টান্ত একথা নৈয়ায়িক-সম্মত ; কিন্তু এসবের মূলে যে একজন কর্তা রয়েছেন তাঁকে কি কেউ কখনও প্রত্যক্ষ করেছেন? উল্টো, একথাই বলা যায় যে কোনো কর্তা ভিন্নই এইসব বস্তু নিষ্পন্ন হয়েছে। যদি বলা হয় যে এই সব ক্ষেত্রে কর্তা সাধারণ প্রত্যক্ষ গোচর না হলেও একজন কর্তা অবশ্য রয়েছেন, কেননা—ঘট, গৃহ, বস্ত্র প্রভৃতি অবয়ব-সন্নিবেশজাত বস্তু কর্তার প্রযত্নে নির্মিত বলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এ ধরনের একটা ব্যাপ্তি-নির্ণয় করা চলে যে অবয়ব-নিষ্পন্ন সকল বস্তুই কর্তৃজন্য। সুতরাং যেখানে কর্তা প্রত্যক্ষগোচর নন সেখানেও অদৃশ্যকর্তা অনুমিত হবে। কোনো শস্যভারনম্র ক্ষেত্র দেখতে পেয়ে ঐ শস্যের কর্তাকে দ্রষ্টা প্রত্যক্ষ না করলেও একথা সহজে অনুমান করা চলে যে তা একজন কর্তার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। অতএব, নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, পর্বত, নদী প্রভৃতির স্থলেও কর্তা অবশ্য অনুমিত হবেন।

এই প্রশ্নে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের মূল প্রশ্ন তুলে ধরতে চান। তাঁদের মতে ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের ক্ষেত্রে সাধ্য হেতুর মধ্যে অব্যভিচারী সম্বন্ধ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক ; এবং তারই জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের মূলে বিদ্যমান থাকে। প্রত্যক্ষের সাহায্যেই হেতু ও সাধ্যের অব্যভিচারিত সম্বন্ধ নির্ণীত হতে পারে কিন্তু এখানে যে প্রত্যক্ষের সাহায্যে অবয়ব সন্নিবেশের সঙ্গে কর্তার ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করা হয়েছে তা ঠিক নয়, কেন না কতিপয় ক্ষেত্রে অবয়ব সন্নিবেশ ও কর্তার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করলেও যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ না হয় তা হলে সর্বত্রই অবয়ব-সন্নিবেশ কর্তৃজন্য এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। যেমন, ঘট, পট প্রভৃতির ক্ষেত্রে কর্তার প্রত্যক্ষ হয় অথচ পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোনো কর্তা দেখা যায় না—এই অবস্থায় অবয়ব-সন্নিবেশ সর্বত্র কর্তৃজন্য এই প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আশ্রয় করে অবয়ব-সন্নিবেশের সঙ্গে কর্তার সম্বন্ধ নির্ণীত হবে সেই প্রত্যক্ষই এ রূপ সম্বন্ধের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাই এই ব্যাপ্তিগ্রহণ করার কোনো যুক্তি নেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে ঐ ব্যাপ্তির সাহায্যে অন্যত্র অনুমান করতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের ব্যাঘাতক হয় তা হলে কোনো কোনো স্থলে অবয়ব-সন্নিবেশ ও কর্তা প্রত্যক্ষ করে তার সাহায্যে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করে অন্য অবয়ব সন্নিবেশের ক্ষেত্রে

অদৃশ্য-কর্তা অনুমান করা যায় না। নৈয়ায়িকগণ যদি বলেন ব্যাপ্তি-নিশ্চয় কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিষ্পন্নই হবে না, অনুমান প্রমাণের দ্বারাও ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হতে পারে তবে তা যুক্তিসহ হবে না ; কেন না অনুমান তো ব্যাপ্তির ওপরই নির্ভরশীল। স্বভাবতঃই ব্যাপ্তি-নিশ্চয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোনো রকমে সম্ভব নয়। ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অনুমান-নির্ভর হলে সেই অনুমানকেও অন্য একটি ব্যাপ্তি-নির্ভর হতে হবে এবং ঐ ব্যাপ্তি যদি আবার অনুমান নির্ভর হয় তাহলে অপরিহার্য অনবস্থা দোষ ঘটবে। সুতরাং ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অনুমান-নির্ভর হলে চলে না। কিন্তু ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকলে তাকেও হেতু ও সাধ্যের তাদাত্ম্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধ গ্রহণ করেই করতে হবে, অন্যভাবে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব নয়। ''প্রমাণ-বার্তিক''-এর সুখ্যাত কারিকাটি সহজেই মনে পড়বে ঃ

কার্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোহদর্শনান্ন, ন দর্শনাৎ।।[৮৯]
(**প্রমাণ-বার্তিক** ; স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ ; কারিকা-৩১)

অতএব অবয়ব-সন্নিবেশ ও কর্তৃপ্রযত্ন এই দুয়ের মধ্যে কার্য-কারণভাব, স্বভাব বা তাদাত্ম্য যদি প্রমাণিত হয় তা হলেই অবয়ব-সন্নিবেশ কর্তা অনুমাপক হতে পারে ; কিন্তু অবয়ব-সন্নিবেশের সঙ্গে কর্তৃপ্রযত্নের 'তাদাত্ম্য' বা 'কার্য-কারণভাব'-এর কিছুই নেই।

এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বৌদ্ধ-দার্শনিক জ্ঞানশ্রীমিত্র বলেছেন, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সহচার বহুস্থলে প্রত্যক্ষ হলে ও ব্যভিচার কোথাও প্রত্যক্ষ না হলে উভয়ের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে হয় এই হচ্ছে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য। ব্যভিচারের অদর্শন বোঝাতে নৈয়ায়িকগণ বলেন বিপক্ষে অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যাভাব নিশ্চিত রয়েছে সেখানে হেতু নেই—অনুরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই হচ্ছে ব্যভিচারের অদর্শন। কিন্তু হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচার নেই এরূপ নিশ্চয় করতে হলে হেতুতে কোনো উপাধি নেই এই নিশ্চয়তা আবশ্যক।[৯০]

৮৯। প্রসঙ্গতঃ অবতরণিকাংশের পাদটীকা ৭ দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধ কার্য-কারণ সম্বন্ধের কোনো আলোচনায় এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ।

৯০। সাধ্য ও হেতু এই দুয়ের মধ্যে যদি এমন একটি জিনিস থাকে যা সাধ্যের ব্যাপক অথচ হেতুর অ-ব্যাপক তা হলে সেই জিনিসটিকে 'উপাধি' বলা হয় ; যেমন, 'ধূমবান বহ্নি' এই স্থলে ধূম সাধ্য, বহ্নি হেতু। এখানে 'আর্দ্র ইন্ধন সংযোগ' উপাধি হবে কেননা যেখানে ধূম সেখানেই আর্দ্র ইন্ধন সংযোগ অবশ্যই থাকে ; সুতরাং

আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচ্য ক্ষেত্রে 'যা অবয়ব-সন্নিবেশ-জন্য তা কর্তার প্রযত্ন থেকে উৎপন্ন' এই উদাহরণে 'অবয়ব-সন্নিবেশ-জন্যত্ব' হচ্ছে হেতু; 'সকর্তৃকত্ব' হচ্ছে সাধ্য। এখানে কোনো উপাধি আছে কিনা তা নির্ধারিণ করা অসম্ভব, কারণ কেবলমাত্র দৃশ্য বস্তুই উপাধি হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আর অদৃশ্য উপাধি থাকলে তার অভাব প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে না। তাই আপাত-দৃশ্য উপাধি নেই বলেই এক্ষেত্রে ব্যভিচারের অভাব নির্ধারিণ করা সম্ভব নয়—এই হচ্ছে জ্ঞানশ্রী মিত্রের সিদ্ধান্ত।[৯১] সুতরাং সাধ্য এবং হেতুর মধ্যে কোনো উপাধি আছে কিনা তা নির্ণয় করা অসম্ভব বলে এই স্থলে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন অবয়ব সন্নিবেশ-জন্যত্ব যেখানে থাকে সেখানে প্রযত্নবান একজন কর্তা অবশ্যই থাকবেন এটা তো একটা সাধারণ নিয়ম। সুতরাং জগতের যাবতীয় উৎপন্ন বস্তু অবয়ব-সন্নিবেশের জন্য উৎপন্ন বলে এদের একজন কর্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় কারণ কর্তার প্রযত্ন ব্যতীত অবয়ব-সন্নিবেশ সম্ভব নয়। ঘট কুম্ভকারের প্রযত্ন ভিন্ন উৎপন্ন হয় না সুতরাং যেখানে প্রযত্নশীল কর্তা নেই সেখানে অবয়ব-সন্নিবেশের ফলে কোনো কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি সম্ভব নয়। এখানে হেতু হচ্ছে **স্বপক্ষবৃত্তি**[৯২] এবং বিপক্ষে অ-বৃত্তি অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যাভাব নিশ্চিত সেখানে হেতুর অবিদ্যমানতা নির্ধারিত হলেই হেতু সাধ্যের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি নির্ধারণের বাধা না থাকায় অনায়াসেই ন্যায়-সম্মত অনুমান সিদ্ধ হবে। এর উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকদের বক্তব্য হল ঘট-কুম্ভকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যেসব দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে তা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষস্থলীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু যেখানে অবয়ব-সন্নিবেশ-জন্য বস্তু প্রত্যক্ষ হলেও কর্তার প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার নেই এটা কিভাবে নির্ধারিত হবে?

আর্দ্রেন্ধন সংযোগ ধূমের ব্যাপক কিন্তু বহ্নির অধিকরণ লৌহগোলকে আর্দ্রেন্ধন সংযোগ নেই অথচ বহ্নি আছে বলে তা বহ্নির অব্যাপক হল। এরূপ উপাধি থাকার ফলে হেতু সাধ্যের ব্যাভিচারী বলেই নির্ধারিত হয়।

৯১। যৎ পুনরেতৎ উপাধেঃ অনুপলম্ভেন ব্যাভিচারাসিদ্ধিরিতি তত্র ন উপাধিঃ নাম দৃশ্যচিহ্নস্থানীয়ং কিঞ্চিদস্তি যৎ অনুপলম্ভঃ অব্যভিচারং ব্যবহারয়েৎ। (**জ্ঞানশ্রীমিত্র নিবন্ধাবলী : ঈশ্বরবাদদূষণম্**; পৃঃ ২৪৩; কাশীপ্রসাদজয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, পাটনা, ১৯৫৯।)

৯২। **পক্ষের অতিরিক্ত স্থলে সাধ্যের অস্তিত্ব যেখানে নিশ্চিত জানা যায় তা হচ্ছে স্বপক্ষ।**

বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি অবয়ব-সন্নিবেশ-জন্য হলেও তাদের উৎপাদক কোনো কর্তা প্রত্যক্ষ হয় না। এই হচ্ছে জ্ঞান শ্রীমিত্রের যুক্তি ঃ ''অত্র হি প্রত্যক্ষানুপলম্ভযোগ্যস্বরূপস্বীকারাৎ অভিব্যক্তঃ অনুপলব্ধ-পুরুষব্যাপারৈঃ বৃক্ষ-বীরণাদিভিঃ ব্যভিচারঃ।'' (**জ্ঞানশ্রীমিত্র নিবন্ধাবলী** ; সূত্র পূর্ববৎ।)

নৈয়ায়িকগণ বলবেন, বৃক্ষ, বীরণ (একপ্রকার তৃণ) প্রভৃতি সাবয়ব কার্যবস্তু বলে তা পক্ষের অন্তর্গত হবে কারণ যাবতীয় সাবয়ব বস্তুই পূর্বোক্ত অনুমানের পক্ষরূপে নির্দিষ্ট। সুতরাং পক্ষের একদেশে সাধ্যের সঙ্গে হেতুর ব্যভিচার দেখিয়ে অনুমানের দোষ প্রমাণিত হয় না কারণ পক্ষে বা পক্ষস্থানীয় বস্তুতে সাধ্য এবং হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন অনুমানের বাধক হয় না। এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে যা পক্ষরূপে নির্দিষ্ট সেখানে হেতু রয়েছে এটা জানা থাকলেও সাধ্য রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না হওয়ায় সাধ্য-নিশ্চয়ের জন্যই অনুমান করা হয়। সুতরাং পক্ষে সাধ্যের অভাব রয়েছে এরূপ দোষ দেখিয়ে হেতুকে সাধ্যের ব্যভিচারী বললে কোনো স্থলেই অনুমান হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অনুমানের পূর্বে নির্দিষ্ট পক্ষে সাধ্য আছে কিনা তার সঠিক নির্ধারণ না হওয়ায় সাধ্যাভাব রয়েছে একথা বলা সম্ভব নয় ; কেননা সাধ্যাভাব পক্ষের এক দেশে নিশ্চিত হলেও সর্বাংশে নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ, সমগ্রভাবেই একটি বস্তুকে পক্ষ করা হয়। সুতরাং বৌদ্ধগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত পক্ষের এক দেশে সাধ্যাভাব আছে বলে ব্যভিচার দোষ হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ বলেন, পক্ষ কী হবে তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যেখানে প্রমাণান্তরের দ্বারা সাধ্যের নিষেধ হয় না, সেই রকম স্থলেই পক্ষ নির্দিষ্ট হতে পারে অর্থাৎ যেখানে সাধ্য আছে কিনা এই সন্দেহ থাকে এমন অধিকরণ পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হতে পারে ; কিন্তু কোনো প্রমাণের দ্বারা সাধ্য অথবা তার অভাব নিশ্চিত হলে সেখানে সন্দেহ সম্ভব নয় বলে এ রকম স্থলে পক্ষ নির্দিষ্ট হতে পারে না। সুতরাং যা অন্য কোনো প্রমাণের বিরোধী নয় এমন স্থলেই পক্ষ হবে। আবার স্মরণ করতে হয় আচার্য ধর্মকীর্তিকে ঃ

অনিষিদ্ধঃ প্রমাণাভ্যাং স চোপগম ঈষ্যতে।
সন্দিগ্ধে হেতুবচনাদ্ ব্যস্তো হতোরনাশ্রয়ঃ।।
(প্রমাণবার্তিক, ৪।৯১)

প্রত্যক্ষ বা অনুমান এর যে কোনো একটি প্রমাণের দ্বারা যেখানে

সাধ্যের অভাব নিশ্চিত হয় না সে রকম স্থলেই পক্ষ হতে পারে, সুতরাং যেখানে সাধ্যের সন্দেহ রয়েছে সেখানে হেতু বিদ্যমান থাকলে তা পক্ষরূপে গ্রাহ্য হয়। এই নিয়ম অস্বীকার করলে 'বহ্নি অনুষ্ণ যেহেতু তা প্রমেয়' (বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ প্রমেয়ত্বাৎ) এই অনুমানও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বহ্নির উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলেই অনুষ্ণত্ব সাধ্যের অনুমান করার জন্য বহ্নিকে পক্ষ করা যায় না। সুতরাং এখানে বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতির কেহ কর্তা নেই এটা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত অনুমানের পক্ষরূপে বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতিকেও গ্রহণ করা যায় না। যে সমস্ত স্থলে প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তু নিশ্চিত হতে পাবে না সেই সব স্থলেই প্রত্যক্ষের দ্বারা অনিশ্চিত বস্তুকে নির্ধারণ করাব জন্য অনুমান স্বীকৃত হয়।[৯৩]

নৈয়ায়িকগণ বললেন, কর্তা কেবল দৃশ্য পদার্থ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। কেননা, বুদ্ধি ও প্রযত্ন যার রয়েছে সে-ই কর্তা হবে। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির সম্পর্ক ভিন্ন বুদ্ধি বা প্রযত্ন কোনো আত্মাতে থাকে না—কিন্তু শরীর কেবল যে দৃশ্যই হবে এমন তো কোনো নিয়ম নেই; কারণ যা পার্থিব শরীর তা-ই পার্থিব শরীরধারী মানুষের পক্ষে দৃশ্য। কিন্তু শরীর অপার্থিব হলে তা মানুষের পক্ষে দৃষ্ট হবে না। সুতরাং বুদ্ধি ও প্রযত্ন দৃশ্য এবং অ-দৃশ্য দ্বিবিধ শরীরেই থাকতে পারে। দৃশ্য শরীর না পেলে অদৃশ্য শরীরের অস্তিত্বই বোঝা চাই। অতএব বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতি স্থলেও কোনো কর্তা রয়েছে কিনা এই সন্দেহ অবশ্যই দেখা দিতে পারে; সুতরাং বৌদ্ধ-সম্মত ভাবেই বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতিও পক্ষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। বৌদ্ধগণ এর জবাবে বলেন, এ ধরনের যুক্তি অসার, কেননা ব্যাপ্তি-নির্ধারণের জন্য তারাই প্রত্যক্ষকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন প্রত্যক্ষের দ্বারা যদি হেতু ও সাধ্যের সহচার নির্ধারিত ও ব্যভিচার দৃষ্ট না হয় তা হলেই ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হবে। অথচ এখন অদৃশ্য কর্তার অবতারণা করে তাঁরা ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রামাণ্য রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছেন। একে বলা যায়—'অন্যের নিকট বিক্রীত গরুটিকে রক্ষা করার অর্থহীন প্রয়াস'! ব্যাপ্তিজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চিত হবে বলেই বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষের অ-বিষয় রূপেও ব্যাপ্তি থাকতে পারে—তাই এই প্রচেষ্টা

৯৩। অধ্যক্ষমেব প্রতিযোগিনঃ প্রতিযোগ্যন্তরাপেক্ষয়া অনুপলব্ধিরুচ্যতে, তত্ঃ অনুপলব্ধিবাধিতমপি প্রত্যক্ষবাধিতমেব। (**জ্ঞানশ্রীমিত্র নিবন্ধাবলী**; পৃঃ ২৪৪)

অসঙ্গত।[৯৪] অদৃশ্য কর্তার অনুমান করার জন্য ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের কোনো উপায় না থাকায় সেখানে অদৃশ্য কর্তা রয়েছে এরূপ কল্পনা একান্ত নিরর্থক।

নৈয়ায়িকগণ এ সমালোচনা মেনে নিয়েও বলবেন, ঈশ্বরানুমানের জন্য কেবলমাত্র এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে যা সবয়ব, জন্য-বস্তু তা অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান কর্তার সৃষ্টি। বুদ্ধিমানের প্রযত্ন সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তির কারণ হবে সুতরাং ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্য বা অদৃশ্য শরীর কল্পনা অনাবশ্যক। কিন্তু ব্যাপ্তি-নিশ্চিত হওয়ার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অদৃশ্য কর্তাও সিদ্ধ হবে মাত্র। অতএব এ যুক্তিতে দোষ নেই।

বিতর্কের সূত্রে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রযত্নের সঙ্গে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি অবিনাভাব সম্বন্ধে আবদ্ধ এটা নিশ্চিত হলেই নৈয়ায়িকদের বক্তব্য গ্রাহ্য হবে। কিন্তু সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তির মূলে বুদ্ধিমান কর্তার প্রযত্ন রয়েছে এই নিয়ম গৃহীত হওয়ায় পক্ষেই বাধা রয়েছে। সুতরাং বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতির স্থলে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হলেও সেখানে বুদ্ধিমানের প্রযত্ন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নয়; তাই এখানে ব্যাপ্তি নির্ধারিত হতে পারে না। অন্যদিকে দৃশ্যত্ব ও অদৃশ্যত্ব দু'টি ভিন্ন জাতি। অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা দৃশ্যত্ব জাতির যা আশ্রয় কেবলমাত্র তারই ব্যাপ্তি নির্ধারিত হতে পারে; কিন্তু অদৃশ্যত্ব জাতির আশ্রয় উক্ত ব্যাপ্তির বিষয় হবে না বলে এই ব্যাপ্তির সাহায্যে অদৃশ্য কর্তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হবে না। সুতরাং মানতেই হবে যে প্রত্যক্ষের দ্বারা যেখানে ব্যাপ্তি নিশ্চিত হয় সেখানে ঐ প্রত্যক্ষ-মূলক ব্যাপ্তির সাহায্যে দৃশ্য অ-দৃশ্য এই উভয় সাধারণ কর্তৃত্ব-ধর্মের সিদ্ধি সম্ভব নয়।[৯৫]

ন্যায়মতে আত্মাই প্রযত্নের আশ্রয় এবং আত্মা সর্বব্যাপক হলেও সর্বত্র প্রযত্ন উৎপন্ন হয় না; কেবলমাত্র শরীরের অভ্যন্তরেই মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগের ফলে প্রযত্ন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং

৯৪। তদেতৎ বিক্রীত গবীরক্ষণম্। ব্যাপ্তিসাধনায় অধ্যক্ষানুপলম্ভো ববকাশদানাদেব দৃশ্যবিষয়তাঙ্গীকাবস্য প্রসহ্য আয়াতত্বাৎ। (**জ্ঞানশ্রীমিত্র নিবন্ধাবলী**; পৃঃ ২৪৪)

৯৫। যো যঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ কারণত্বনিশ্চয়ঃ, নাসৌ দৃশ্যাদৃশ্যাকপপর্যবসায়ঃ। (**জ্ঞানশ্রীমিত্র নিবন্ধাবলী**; ২৪৫)

ন্যায়-সম্মত ঈশ্বর যদি কর্তা হন তা হলে শরীরাদি ব্যতীত তাঁর কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু শরীর সাবয়ব বলে তার উৎপাদক অপর একজন কর্তার আবশ্যক হবে এবং ঈশ্বর-শরীরের উৎপাদক সেই কর্তাও শরীর ভিন্ন অপর শরীর উৎপাদন করতে সমর্থ হবেন না। এভাবে অনবস্থা দোষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই নৈয়ায়িকগণের নিজেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের ঈশ্বর-স্বীকারের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ দেখিয়ে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, কোনো অচেতন বস্তু চেতন কর্তার সাহায্য ভিন্ন নিজেরা স্বয়ং মিলিত হয়ে কার্যরূপে উৎপন্ন হতে পারে না। অচেতন জগতের মূল বস্তু অচেতন পরমাণু, তাই চেতন ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন তারা পরস্পর মিলিত হয়ে জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি করতে পারে না। সমগ্র জড় জগতের উৎপাদক এই চেতন কর্তাই ঈশ্বর। সংক্ষেপে এই হচ্ছে মূল নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধগণ বলেন, আত্মা স্বভাবতঃ অচেতন; কেবলমাত্র মনের সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় এবং ঐ অবস্থায় আত্মা চেতন এই হচ্ছে ন্যায় সিদ্ধান্ত। কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্ট না হলে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ সম্ভব নয়; তাই সৃষ্টির পূর্বে শরীরাদি না থাকায় আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ অসম্ভব বলে আত্মাতে জ্ঞান নামক গুণের উৎপত্তি হতে পারে না। তার ফলে সৃষ্টির পূর্বে আত্মা অচেতনই থাকবে। ন্যায়-মতে বিশেষ একটি আত্মাই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে আত্মা ও মনের সংযোগের সম্ভাবনা না থাকায় ঈশ্বর নামক আত্মাও তখন জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ অচেতনই থাকবে। এ অবস্থায় অচেতন পরমাণুসমূহ এবং ঈশ্বর এ উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। অতএব অচেতন ঈশ্বর অজ্ঞ বলেই কোনো কার্যের প্রেরক-কর্তা হতে পারেন না। তাই ঈশ্বর স্বীকার অসিদ্ধ—এই হচ্ছে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভিমত।[৯৬]

ন্যায়মতে ঈশ্বর-সিদ্ধির আলোচনা কালে এর আগে নৈয়ায়িক অবিদ্ধকর্ণপাদ নামক আচার্যের ঈশ্বর-সাধক দু'টি প্রমাণ এবং বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত কর্তৃক সেগুলোর খণ্ডনাত্মক বক্তব্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তাই এখানে সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ নন—এই হচ্ছে মূল বৌদ্ধ প্রতিপাদ্য।

৯৬। যাবৎ হি তস্য শরীরেন্দ্রিয়াদিঃ কার্যকারণসংঘাতঃ ন উৎপদ্যতে, তাবৎ অয়মজ্ঞঃ উপলভ্যানপি রূপাদীন্ বিষয়ান ন উপলভতে। (**তত্ত্বসংগ্রহ**; পঞ্জিকাটীকা, কারিকা-৪৬)

বৌদ্ধ ও তৎসহ জৈন দার্শনিক সম্প্রদায় **নিত্য-সর্বজ্ঞ** অস্বীকার করেছেন ; তার ফলে ঈশ্বরও অস্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণভাবে নিজের প্রযত্নের দ্বারা জ্ঞানাবরণ ক্ষয় করতে পারলে মানুষ সর্বজ্ঞ হতে পারে—এই হচ্ছে বৌদ্ধ ও জৈন সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধমতে বুদ্ধদেব এবং জৈনমতে মহাবীর প্রমুখ সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্যগণ সর্বজ্ঞ ; কিন্তু নিত্যসর্বজ্ঞ বলে কিছু নেই। মীমাংসক সম্প্রদায়ও সর্বজ্ঞ-খণ্ডন করেছেন। সুতরাং এঁদের সকলের মতেই ঈশ্বর অস্বীকৃত।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মুখ্যতঃ নৈয়ায়িক সম্প্রদায় স্বীকৃত ঈশ্বরানুমান আনুপূর্বিকভেবে খণ্ডন করেছেন। নৈয়ায়িক আচার্যগণের মতে ঈশ্বর অনুমান-গম্য। তাই বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন ঈশ্বর-সাধক প্রমাণ সমূহকে খণ্ডন করলে ঈশ্বর প্রমাণ-সিদ্ধ হবে না। তারই জন্য বৌদ্ধ আচার্যগণ অতি দুরূহ, নিপুণ তর্ক বিচারের আয়োজন করেছেন এবং এই বিতর্ক ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ ও নৈয়ায়িক পারদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘতর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। সাধারণভাবে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তের মর্মকথা হল, (১) জগৎকর্তা রূপে ঈশ্বর-সিদ্ধির জন্য যে ব্যাপ্তি গৃহীত হয়েছে তা ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট। 'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ'-এই অনুমানই ঈশ্বর সাধনের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই অনুমানে প্রদর্শিত 'কার্যত্ব' হেতু 'সকর্তৃকত্ব' সাধ্যের ব্যভিচারী—এই হচ্ছে তাদের মূল কথা। (২) নিরবয়ব বস্তুকে নৈয়ায়িকগণ 'নিত্য' বলে স্বীকার করেন সুতরাং নৈয়ায়িকমতে একমাত্র সাবয়ব বস্তুই কার্য হতে পারে। আবার সাবয়বত্ব সিদ্ধ না হলে সাবয়বত্বের দ্বারা কার্যত্ব সিদ্ধ হবে না এবং কার্যত্ব সিদ্ধ না হলে অসিদ্ধ-হেতুক অনুমানের দ্বারা সাধ্য নির্ধারিত হতে পারে না। সুতরাং হেতু সিদ্ধ হয় না বলে অনুমান সম্ভব নয়-এই হ'ল নৈয়ায়িক ঈশ্বরানুমানের বিরুদ্ধে বক্তব্য। (৩) যা উৎপন্ন হয় তা-ই কার্য ; এভাবে কার্যত্ব স্বীকার করলেও হেতুটি সকর্তৃকত্ব রূপ সাধ্যের ব্যভিচারী হবে কারণ অরণ্যের বৃক্ষতৃণাদির ক্ষেত্রে কার্যত্ব হেতু থাকলেও কোনো কর্তা পাওয়া যায় না এবং নৈয়ায়িক মতে সচেতন প্রাণীই কর্তা হতে পারে। তাই নৈয়ায়িক ঈশ্বরানুমান বৌদ্ধমতে অগ্রাহ্য। (৪) ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদের মতে প্রত্যেক সৎ বস্তুই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় অথচ প্রতিক্ষণেই এক একজন কর্তা সেই বস্তুটির কর্তা হতে পারেন না। অন্যদিকে একজন কর্তা প্রতিক্ষণে স্থির থেকে নিত্য-নূতন বস্তু উৎপাদন করেন তাও বৌদ্ধমতে

যুক্তি-বিরুদ্ধ কেননা 'স্থির' বলে কোনো কিছু থাকতেই পারে না। এই যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিত্যত্ব দুই-ই অস্বীকৃত হয়েছে। (৫) বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৃষ্টি-পদ্ধতি ঈশ্বর-নিরপেক্ষ। বৌদ্ধ-দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ সৃষ্টির প্রতিপাদকরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী কতগুলো সংঘাত মিলিত হয়েই 'সৃষ্টি' হয়। 'প্রতি প্রাপ্ত্যর্থম্, সমুদিতশ্চ প্রতীত্যশব্দম্; প্রাপ্তাবেব বর্ণয়তি'। মধ্যমক শাস্ত্র: ১/১ প্রসন্ন পদাব্যাখ্যা; পৃঃ ৩) এবং সমুৎপূর্বঃ পদি প্রাদুর্ভাবার্থ ইতি সমুৎপাদ শব্দঃ প্রাদুর্ভাবে বর্ততে। ততশ্চ হেতু প্রত্যয়াপেক্ষঃ ভাবানুমুৎপাদঃ প্রতীত্য-সমুৎপদার্থঃ'-ঐ; পৃঃ ২। প্রতীত্যসমুৎপাদ্ তত্ত্বানুসারে প্রতিটি কার্যই কতকগুলো সংঘাতের মিলনের ফলে উদ্ভূত। উদাহরণ হিসাবে ক্ষেত্রে বীজ বপনের পর মাটি, বাতাস, আলো, জল প্রভৃতি বস্তুর মিলিতভাবের ফলে বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূত পদার্থের একটা নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। এই সৃষ্টিক্রমের বেলায় বৌদ্ধ-সম্মত প্রক্রিয়া অনুযায়ী চেতন ঈশ্বরের কোনোই আবশ্যকতা নেই। পঞ্চস্কন্ধ মিলিত হলেই কার্যোৎপত্তি ঘটে; অন্য কিছুই সৃষ্টির জন্য অপেক্ষণীয় না হওয়ায় জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বর-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। (৬) একজন সর্বজ্ঞ অনাদিকাল হতে বিদ্যমান আছেন এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। বৌদ্ধমতে দেহধারী জীবের পক্ষেই দোষশূন্য চিত্তে সমস্ত বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতীতি সম্ভব। অথচ যারা নিত্যসর্বজ্ঞ স্বীকার করেন তারা এই নিত্যসর্বজ্ঞকে দেহধারী বলতে সম্মত নন; কারণ তারা জানেন দেহধারী মাত্রেই সাবয়ব এবং সাবয়বত্ব মানেই অনিত্যত্ব!

এই মূল বৌদ্ধ যুক্তিসমূহের ভিত্তিতে ঈশ্বরখণ্ডনের উপসংহারে বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিতের বক্তব্যের উল্লেখ করে বলা যায়ঃ ঈশ্বরকে নিত্য-সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করলে সমস্ত বস্তুর যুগপৎ সৃষ্টিতে কোনো বাধা হয় না। যদি ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানই হন তা হলে সৃষ্টির জন্য অন্য কিছুর জন্য তাঁর অপেক্ষার প্রয়োজন না থাকায় তিনি সর্বদাই সমস্ত সৃষ্টি করতে পারেন। একথা স্বীকার না করলে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ হয় না। অন্যদিকে যদি ন্যায়মতানুযায়ী বলা হয় জীবের ভোগজনক অদৃষ্ট অনুসারেই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন তবে সমস্ত রকম অদৃষ্টের ফলভোগ একই সময়ে হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি শর্তাধীন হয়ে পড়ে। অদৃষ্টের ওপর নির্ভরশীলতা ঈশ্বরীয় সর্বশক্তিমত্তার পক্ষে বিঘ্নকর।

অদৃষ্টকে নিত্য বলে মেনে নিলে বা অনিত্য বলে অভিহিত করলে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথম ক্ষেত্রে অদৃষ্ট 'নিত্য' হলে ঈশ্বর সর্বদাই সমস্ত সৃষ্টি করতে কেন পারেন না তার কোনো সদুত্তর মিলে না। অন্যদিকে অদৃষ্ট 'অনিত্য' হলে অদৃষ্টের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করতে হয়। জীবের কর্মানুষ্ঠানের সমগ্র কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব ব্যাহত হবে। অন্যদিকে ঈশ্বরেচ্ছায় জীব কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় বললে ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব রক্ষা পায় বটে, কিন্তু সুখদুঃখজনক ফলদায়ী কর্মানুষ্ঠানের প্রেরণাদাতা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ এতে করে হয়ে পড়ে অনিবার্য। আর এই পক্ষপাতদুষ্টতা ঈশ্বরের আসক্তি ও বিদ্বেষেরই সূচক হয়ে দাঁড়ায় যা ঈশ্বরত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব দু'য়ের পক্ষেই ব্যাঘাতক। তাই বৌদ্ধসম্মত আলোচনান্তে বলতে হয় নিত্য সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হতে পারে না বলে ঈশ্বর স্বীকার করা চলে না।

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন-মতে ঈশ্বর-খণ্ডন

ঈশ্বর অনাদিমুক্ত তথা নিত্যমুক্ত একথা সিদ্ধ হলেই ঈশ্বরকে নিত্যসর্বজ্ঞ বলা চলে। বদ্ধ জীবকে কখনও সর্বজ্ঞ বলা যায় না কেননা জ্ঞানের আবরক কোনো দোষ না থাকলে বন্ধন থাকতে পারে না। সুতরাং যার বন্ধন রয়েছে তার জ্ঞানের আবরক দোষও রয়েছে। যিনি বা যাঁরা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, সমস্ত দোষ দূর হওয়ার পর মুক্ত হলেও তাঁদের কোনো মতেই নিত্যসর্বজ্ঞ বলা চলে না। এইজন্যই ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত এবং তারই ফল হিসাবে তাকে নিত্যসর্বজ্ঞ বলা হয়।[৯৭]

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতো জৈন দার্শনিকগণও নিত্যমুক্ত বলে কা'কেও স্বীকার করেন না। জৈন আচার্যদের মতে ঈশ্বর অনাদি-মুক্ত এরূপ সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন; কেননা মুক্তি বন্ধনসাপেক্ষ। যার কোনোদিন বন্ধন ছিল না তার মুক্তি সম্ভবই নয়। আকাশ এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। যদি ঈশ্বরকে মুক্ত বলতে হয় তবে এক সময় তাঁরও বন্ধন ছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। আর একথা মেনে নিলে ঈশ্বরের নিত্যমুক্ততা অর্থহীন এবং তাঁর নিত্যসর্বজ্ঞতা অসিদ্ধ হয়ে পড়ে।[৯৮]

নৈয়ায়িক আচার্যগণ বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি কার্যদ্রব্যের মূল কারণ নিত্য পরমাণু। সুতরাং ঐ নিত্য পরমাণুর প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকলে কোনো কর্তার পক্ষেই পরমাণু-সংযোজন পদ্ধতি অনুসারে কার্যদ্রব্যের নির্মাণ সম্ভব নয়। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতি কার্যদ্রব্যের কর্তারূপে একজন নিত্যসর্বজ্ঞ যুক্তিসিদ্ধ।

প্রতিবাদে জৈন দার্শনিকগণ বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি কার্যদ্রব্য তা সিদ্ধ হলেই তার কর্তা নিত্যসর্বজ্ঞ হতে পারেন। সাবয়ব বলেই পৃথিবী প্রভৃতিকে কার্যদ্রব্য বলা হয় সুতরাং ঈশ্বরবাদীদের বক্তব্য এই যে,

---

৯৭। পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদে ঈশ্বর-বোধক সূত্রে ভাষ্যকার মুক্তপুরুষ ঈশ্বর কিনা এই আশঙ্কার উত্তরে বলেছেন যাঁরা পূর্ব বদ্ধ ছিল তারা ঈশ্বর হতে পারে না; অথবা যাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানশালী হওয়ায় আরেকবার জন্মগ্রহণ করেই মুক্ত হন তাঁরাও ঈশ্বর নন; কারণ ঈশ্বর সর্বদাই মুক্ত অর্থাৎ তিনি নিত্যমুক্ত। (**পাতঞ্জল দর্শন**, সমাধিপাদ; সূত্র ২৪; ব্যাসভাষ্য)।

৯৮। ন ঈশ্বরঃ অনাদিমুক্তঃ মুক্তত্বাৎতদন্যমুক্তবৎ। বন্ধাপেক্ষয়া চ মুক্তব্যপদেশঃ তৎ রহিতে চাস্যাপ্যভাবঃ স্যাৎ আকাশবৎ। (**প্রমেয়কমলমার্তণ্ড**; প্রভাচন্দ্র; ২।১২ সূত্র; পৃঃ ২৬৬)

পৃথিবী প্রভৃতি কার্যদ্রব্য বলেই তা সাবয়ব। তারপর, পৃথিবী প্রভৃতি কর্তার দ্বারা নির্মিত বলেই তা কার্যদ্রব্য। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতির সাবয়বত্ব স্থাপন করতে না পারলে তাদের কার্যদ্রব্যত্ব সিদ্ধ হবে না; আর কার্যদ্রব্যত্ব সিদ্ধ না হলে ঈশ্বরও সিদ্ধ নয় এবং সাবয়বত্ব সিদ্ধ নয় বলে কার্যদ্রব্যরূপে পৃথিবী প্রভৃতিকে নির্ধারিত করা চলে না; ফলে ঈশ্বরও সিদ্ধ হবেন না। এজন্য জৈন দার্শনিকগণ প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন 'সাবয়বত্ব' শব্দের অর্থ কী। (১) যা অবয়বের সঙ্গে বর্তমান তা-ই কি সাবয়ব? (২) যা অবয়ব থেকে উৎপন্ন তা-ই কি সাবয়ব? এবং (৩) 'এটি সাবয়ব'-এরূপ জ্ঞানের দ্বারাই কি সাবয়বত্ব সিদ্ধ হবে?

এর মধ্যে প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হতে পারে না কারণ যা অবয়বের সঙ্গে বর্তমান তাকেই সাবয়ব বললে ন্যায়-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'গোত্ব' প্রভৃতি জাতিও সাবয়ব হবে। কারণ 'গোত্ব' প্রভৃতি জাতি গরুতে থাকে, গরুর অবয়ব রয়েছে, অতএব একই অধিকরণে অবয়বের সঙ্গে বর্তমান বলে প্রথম মত অনুসারে 'গোত্ব'ও সাবয়ব হয়ে পড়বে। অথচ কোনো বিচারেই তা কার্যদ্রব্য নয়। ফলে যা-ই সাবয়ব তা-ই কার্যদ্রব্য এই নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় পক্ষও গ্রহণ করা যায় না। কেননা যা-ই অবয়ব-জন্য তা-ই সাবয়ব এই পক্ষ সিদ্ধ করতে হলে কার্যের আরম্ভক একটি নিরবয়ব অণু স্বীকার করতে হয়; নৈয়ায়িকগণ একেই পরমাণু বলেন। এই পরমাণু প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হলেও অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ — এই হচ্ছে নৈয়ায়িকগণের বক্তব্য। নৈয়ায়িকগণের অনুমানটি এই রূপ ঃ দ্ব্যণুক প্রভৃতি কার্যদ্রব্য নিজ পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণ অবয়বের দ্বারা নির্মিত—যেহেতু তা কার্য। ঘট, পট প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।[৯৯] এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ ঘট একটি কার্যদ্রব্য; কিন্তু তার কারণ 'কপাল' 'কপালিকা' ঘটের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণযুক্ত; বস্ত্র অপেক্ষা তার কারণ যে সূত্র তা অল্প পরিমাণ-যুক্ত। এই সব প্রত্যক্ষ কার্যকারণ ভাব থেকে অনায়াসে বলা যায় দ্ব্যণুক প্রভৃতির কারণও তার চেয়ে অল্প পরিমাণ-যুক্ত। সুতরাং দ্ব্যণুকের কারণরূপে যা পাওয়া যায় তাকে অতি সূক্ষ্ম পরমাণু বলে

৯৯। দ্ব্যণুকাদিকং স্বপরিমাণাৎ অল্পপবিমাণোপেত কারণারদ্ধং, কার্যত্বাৎ পটাদিবৎ। (**প্রমেয়কমল মার্তণ্ড**; প্রভাচন্দ্র; সূত্র ২।১২; পৃঃ ২৭০)

স্বীকার করতেই হয়।

জৈন দার্শনিকগণ বলেন, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরমাণু সিদ্ধ হলেই পরমাণু থেকে উৎপন্ন হিসাবে কার্যদ্রব্য সিদ্ধ হতে পারে; অথচ কার্যদ্রব্যকেই হেতু করে পরমাণু অনুমিত হয়েছে। সুতরাং আগে কার্যদ্রব্য না পরমাণু—তা-ই হচ্ছে প্রশ্ন। অনুমান করতে হলে হেতুটি পূর্বে প্রসিদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে পরমাণু সিদ্ধ না হলে কার্যদ্রব্যরূপে কোনো বস্তুকেই নির্ধারিণ করা যায় না। সুতরাং যে কার্যদ্রব্যটি পরমাণু-সাধনের হেতু হবে তা-ই যদি পরমাণুর পূর্বে সিদ্ধ না হয় তা হলে তা পরমাণু সাধনের হেতু হতে পারে না। তাই প্রশ্নটি দাঁড়াচ্ছেঃ পরমাণু সিদ্ধ হলেই পরমাণু থেকে উৎপন্ন বলে ঘট প্রভৃতিকে সাবয়ব বলা যেতে পারে; এবং সাবয়বত্ব সিদ্ধ হলেই তার কার্যদ্রব্যত্ব সিদ্ধ হবে। অতএব কার্যদ্রব্যত্ব সাবয়বত্বের অপেক্ষা করে এবং সাবয়বত্ব পরমাণু-সাপেক্ষ। এই অবস্থায় কার্যদ্রব্যত্বকে হেতু করে পরমাণু সাধনের চেষ্টা করলে চক্রক-দোষ ঘটে। বিশেষ করে প্রতিটি কার্যদ্রব্য নিজের অপেক্ষা অল্প পরিমাণযুক্ত কারণ-দ্রব্য থেকে উৎপন্ন এরূপ নিয়ম হতেই পারে না। জমাট তূলোর অবয়ব সংযোগ শিথিল করার ফলে তা প্রলম্বিত হয়; এই প্রলম্বিত তূলোর সাহায্যে একটি তূলোর পিণ্ড তৈরী করা যায়। এই নির্মিত তূলোর পিণ্ডটি একটি কার্যদ্রব্য সন্দেহ নেই; কিন্তু তার আরম্ভক অবয়ব তার পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণযুক্ত নয়।[১০০] সুতরাং যে অনুমানের সাহায্যে নৈয়ায়িকেরা পরমাণু প্রতিষ্ঠা করেছেন তা জৈন দার্শনিকদের বিচারে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট হওয়ায় তাঁদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না।

তৃতীয় পক্ষও গ্রহণযোগ্য নয়। 'এটি সাবয়ব'-এই জ্ঞান হতেই যদি সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় তা হলে নিত্যরূপে স্বীকৃত আত্মাকেও সাবয়ব বলে জ্ঞাত হলে তাকেও কার্যদ্রব্য বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আত্মা কার্যদ্রব্য নয়।[১০১] সুতরাং সাবয়বত্ব কার্যদ্রব্যের সাধক হতে

১০০। মহাপরিমাণোপেত প্রশিথিলাবয়বকর্পাসপিণ্ডোপাদানেন অতিনিবিড়াবয়বাল্পপরিমাণোপেতকর্পাসপিণ্ডেন অনেকান্তশ্চ। (**প্রমেয়কমলমার্তণ্ড** :- সূত্র ২।১২; পৃঃ ২৭১)

১০১। জৈন দর্শনে যা নিরবয়ব তাকে ব্যাপক বলা চলে না। সুতরাং আত্মাকে ব্যাপক বললে তাকে সাবয়ব বলতে হয়; অথচ আত্মা কার্যদ্রব্য নয়। জীব বোধস্বরূপ ও অবয়ব সংযোগের দ্বারা সম্পন্ন। জীবের অবযব সমূহ কখনও অতি দৃঢ় সংযুক্ত অবস্থায় থাকে, কখনও বা সেই অবয়ব সংযোগ শিথিল অবস্থায় থাকে। কর্মানুষ্ঠান

পারে না। এই প্রসঙ্গে মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে আর্হত (জৈন) দর্শন আলোচনাকালে একটি সুন্দর বিচারের উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা চলে। জৈন দার্শনিকগণ নিত্যসর্বজ্ঞ বলে কিছু স্বীকার করেন না; কিন্তু সাধনার প্রভাবে জ্ঞানের আবরক সমস্ত মলিনতা বা দোষ দূর হলে কোনো কোনো মহাপুরুষ সর্বজ্ঞ হতে পারেন। 'জিন' হলেন এরকমই একজন সর্বজ্ঞ।[১০২]

নিত্যসর্বজ্ঞ খণ্ডন করাই জৈনাচার্যদের অভিপ্রায়। নৈয়ায়িক-দার্শনিকগণ কিন্তু নিত্য-সর্বজ্ঞকেই ঈশ্বর বলতে চান। তারই জন্য জৈন সম্প্রদায় আনুপূর্বিক যুক্তিসহ নিত্যসর্বজ্ঞ খণ্ডন করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে সাবয়বত্ব মানেই কার্যদ্রব্যত্ব এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত খণ্ডনের ওপর তাঁরা প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ এই মতে সাবয়বত্ব সিদ্ধ না হলে কার্যদ্রব্যত্ব সিদ্ধ হবে না এবং কার্যদ্রব্যত্ব সিদ্ধ না হলে জগৎস্রষ্টারূপে নৈয়ায়িকসম্মত ঈশ্বরানুমানও সিদ্ধ হবে না।

এখানে সাবয়বত্ব কাকে বলে এই বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে সাবয়বত্বের সম্ভাব্য পাঁচটি পক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ (১) অবয়ব সংযোগিত্বই সাবয়বত্ব; (২) অবয়ব সমবায়িত্বই সাবয়বত্ব; (৩) অবয়ব-জন্যত্বই সাবয়বত্ব; (৪) সমবেত দ্রব্যত্বই সাবয়বত্ব; এবং (৫) সাবয়বত্ব বুদ্ধিবিষয়ত্বই সাবয়বত্ব। এরমধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চমটির বিচার এর আগেই করা হয়েছে; এখন অন্যগুলো আলোচনা করে দেখা যাকঃ

প্রথম পক্ষ—অবয়ব সংযোগিত্বই কি সাবয়বত্ব? জৈনদের কাছে সাবয়বত্বের এই সংজ্ঞা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় কেন না আত্মা, আকাশ প্রভৃতি ব্যাপক বস্তুকে তাঁরা অবয়ব সংযোগ থেকে উৎপন্ন বলে

করলে কর্ম-পুদগল সমূহ আত্মার শিথিল অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে আত্মাকে কখনও সংকুচিত বা কখনও প্রসারিত করে। কোনো মানুষ স্বকৃত কর্মফল ভোগের জন্য যদি নিজ শরীর অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত শরীর গ্রহণ করে তা হলে অনুষ্ঠিত কর্মপুদগল মনুষ্য শরীরের অবস্থিত জীবাবয়বের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে হস্তীশরীরের মতো বৃহদাকারে প্রসারিত করে। তুল্য যুক্তিতেই নিজের শরীর অপেক্ষা ছোটো শরীর ধারণ করতে হলে বড় শরীরে অবস্থিত জীবের অবয়ব সমূহ পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত হয়ে সংকুচিত হয়। এই জন্যই জৈনমতে আত্মা দেহ-পরিমাণ হয়েও নিত্য; আত্মা সাবয়ব হলেও নিত্য।

১০২। সর্বজ্ঞোজিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদীচ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ।
(**সর্বদর্শনসংগ্রহ**; আর্হত দর্শন।)

স্বীকার করেন কেননা সাবয়ব না হলে বস্তু নির্দিষ্ট একটি স্থানেই থাকতে পারে, তা সর্বব্যাপক হতে পারে না—এই হল জৈনদের অভিমত। আত্মা, আকাশ ইত্যাদি সর্বব্যাপক বস্তু সাবয়ব কিন্তু ঐগুলো কার্যদ্রব্য নয় অথচ নিত্য। সুতরাং যা অবয়ব সংযোগ ঘটিত তা-ই সাবয়ব এ কথা স্বীকার করলে সাবয়ব বস্তুকে কার্যদ্রব্য বলা যায় না। দ্বিতীয় পক্ষ—অর্থাৎ 'অবয়ব-সমবায়িত্বই সাবয়বত্ব' একথাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ অবয়বে যা সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাকেই যদি সাবয়ব বলা হয় তা হলে ন্যায়মতে 'নিত্য' বলে স্বীকৃত 'ঘটত্ব' 'দ্রব্যত্ব', 'গোত্ব' প্রভৃতি জাতিও সাবয়ব হয়ে পড়বে; কেননা ঐ সমস্ত জাতি যেমন দ্রব্যে বিদ্যমান তেমনই দ্রব্যের অবয়বেও সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ঘটের অবয়বে ঘটত্ব জাতি না থাকলে অবয়ব সমষ্টিরূপে ঘটেও ঘটত্ব জাতি থাকতে পারবে না। অর্থাৎ সমগ্র বস্তুতেই যা থাকে বস্তুর একদেশেও তা থাকে। সুতরাং ঘট ও জাতি-ঘটের অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে সাবয়বের পূর্ব নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে ঘটত্ব জাতিও সাবয়ব হবে। অথচ তা নিত্য হলেও কার্যদ্রব্য নয়। তাই অবয়ব-সমবায়িত্বই সাবয়বত্ব এই পক্ষ স্বীকার করলে যা সাবয়ব তা-ই কার্যদ্রব্য এই নিয়ম ব্যাহত হবে। যদি **তৃতীয় পক্ষ**—অর্থাৎ অবয়ব-জন্যত্বই সাবয়বত্ব হয় তবে পূর্বে আলোচিত চক্রক দোষ ঘটবে। **চতুর্থ পক্ষ**—অর্থাৎ সমবেত দ্রব্যত্বই সাবয়বত্ব তা-ও যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য নয়। সমবেত-দ্রব্যত্বের নানা অর্থ করা যায়। সমবায় সম্বন্ধ যুক্ত দ্রব্যত্বই কি সমবেত-দ্রব্যত্ব? অথবা অন্যত্র সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে যে দ্রব্যত্ব তা-ই কি সমবেতদ্রব্যত্ব? এসব কথার তাৎপর্য হচ্ছে 'সমবেতত্ব' এবং 'দ্রব্যত্ব' এই দুটি বাক্যাংশ মিলিত হয়েই সমবেত-দ্রব্যত্ব নামে একটি ভাব-বাক্যে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে 'সমবেতত্ব' ও 'দ্রব্যত্ব' এই দুটি অংশকে পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে যা সমবায়-সম্বন্ধে থাকে এবং যা দ্রব্যত্ব তা-ই 'সমবেত-দ্রব্যত্ব'। অন্যভাবে অর্থ করলে বোঝা যায় যে সমবায়-সম্বন্ধ যার আছে তা-ই সমবেত সুতরাং যে দ্রব্যত্বটি সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত তা-ই সমবেত দ্রব্যত্ব। সমবেত-দ্রব্যত্ব বললে এই দুটি ভিন্ন অন্য কোনো অর্থ হতে পারে না। **এর মধ্যে সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্যত্ব এই অর্থ গ্রহণ করলে সাবয়বত্ব শব্দের যা অর্থ হবে তার দ্বারা সাবয়ব বস্তুমাত্রই অনিত্য এরূপ অনুমান সম্ভব হবে না। কারণ সমবায় সম্বন্ধ 'আকাশে' রয়েছে;**

ন্যায়মতে শব্দ, পরিমাণ প্রভৃতি গুণ সমবায় সম্বন্ধেই আকাশে থাকে এবং দ্রব্যত্বও আকাশে আছে। সুতরাং সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্যত্ব যদি সাবয়ব শব্দের অর্থ হয় তা হলে এই অর্থ অনুযায়ী 'আকাশ'ও সাবয়ব হয়ে পড়ে ; অথচ আকাশ অনিত্য নয়। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করলে সমবেত-দ্রব্যত্ব নামক সাবয়বত্ব অনিত্যত্ব সাধ্যের ব্যভিচারী হবে। কারণ আকাশে অনিত্যত্ব নেই কিন্তু কথিত সাবয়বত্ব রয়েছে ; ফলে নৈয়ায়িকদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না।

যদি সমবেত দ্রব্যত্ব শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ 'অন্যত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকে যে দ্রব্যত্ব' এরূপ বস্তুই সমবেত দ্রব্যত্ব বা সাবয়বত্ব নামে গৃহীত হবে তা-হলেও অন্য দোষ ঘটে। সেই দোষটি নিম্নরূপ ঃ 'অন্যত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকে অথচ দ্রব্যত্ব' এ কথার অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পদার্থে দ্রব্যত্বটি নির্ধারিত হবে সেই পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে উক্ত দ্রব্যত্ব রয়েছে এ কথাই এখানে বলা হচ্ছে ; যেমন, 'ঘটে দ্রব্যত্ব রয়েছে' একথা বলা হলে প্রমাণ করতে হবে যে ঘটের অন্যত্র অর্থাৎ ঘটের সমবায়ীকারণ কপালদ্বয়ে যেহেতু সমবায় সম্বন্ধের দ্রব্যত্ব আছে সুতরাং ঘটেও সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব রয়েছে। এর ফলে বোঝা যাবে যে ঘট একটি সমবায় পদার্থ ; কারণ ঘটের অবয়বে যা সমবায়-সম্বন্ধে ছিল ঘটেও তা সমবায়-সম্বন্ধে রয়েছে বলেই বোঝা যায় ঘট একটি অবয়ব-যুক্ত বস্তু। এভাবে 'সমবেত-দ্রব্যত্ব' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করলে ঘট প্রভৃতিকে সাবয়ব বস্তু বলা যায়। কিন্তু তা নির্ধারণ করতে হলে প্রথমত ঃ প্রমাণ করতে হবে যে ঘটের অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব থাকে। কারণ তা প্রমাণিত না হলে ঘটে এরূপ 'সমবেত-দ্রব্যত্ব' আছে তা বলা চলবে না। তার ফলে সাবয়বত্ব নামক হেতুর সাহায্যে বস্তুর কার্যতা বা অনিত্যতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হবে না। কারণ অনুমান যে হেতুর সাহায্যে নির্ধারিত হয় সেই হেতুটি একটি সিদ্ধ বস্তু হওয়া প্রয়োজন। হেতু-নিশ্চয় না হলে অনুমান হতে পারে না। 'ধূম' হেতু দ্বারা বহ্নির অনুমান করতে হলে 'এটা ধূম' এ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রথমেই প্রয়োজন। কিন্তু এটা ধূম কিনা এরূপ অনিশ্চয়তা থাকলে ধূমের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত অনুমান করা চলবে না। অর্থাৎ যে ধূমের সাহায্যে বহ্নির অনুমান করা হবে সেই ধূমই যদি নিশ্চিত না হয়ে থাকে তা হলে প্রথমতঃ অন্য একটি অনুমানের দ্বারা 'এটা ধূম' তা নিশ্চয় করতে হবে। তারপর সেই নিশ্চিত ধূমকে হেতু করে

বহ্নির অনুমান করা চলবে। যতক্ষণ ধূম নিশ্চিত না হয় ততক্ষণ তা বহ্নির অনুমানের হেতু হতে পারে না। অতএব অনিশ্চিত ধূমকে হেতু করে যদি কেউ বহ্নির অনুমান করতে প্রবৃত্ত হয় তা হলে উক্ত প্রয়াস ব্যর্থ হবে কারণ সেখানে যে ধূম-কে হেতু করে বহ্নিরূপ সাধ্যের অনুমান করা হবে সেই ধূম নিশ্চিত না হওয়ায় তা আরেকটি অনুমানের বিষয় হবে অর্থাৎ অন্য একটি অনুমানের দ্বারা ধূমকে সাধ্য করে 'এটা ধূম' এরূপ অনুমান করতে হবে; তার ফলে এরূপ হেতু প্রয়োগ করলে তা সাধ্যের মতোই অনিশ্চিত বলে সাধ্যের চেয়ে হেতুর কোনো নিশ্চয়াত্মক বৈশিষ্ট্য না থাকায় তা সাধ্যের মতোই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে; কাজেই এ হেতুর সাহায্যে অনুমান করা যায় না। এই দোষের নাম 'সাধ্যাবিশেষ দোষ'। নৈয়ায়িকদের কাছে এই পক্ষও তাই গ্রহণযোগ্য নয়।

সমবেত দ্রব্যত্ব শব্দের আলোচ্য অর্থ গ্রহণ করলে সাধ্যাবিশেষ দোষ ঘটবে। কারণ সাবয়বত্বকে হেতু করেই কার্যত্ব বা অনিত্যত্ব সাধ্যের অনুমান করা হয়েছে; কিন্তু সাবয়বত্ব যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে এটাই বোঝা যায়, যে পক্ষে সাবয়বত্বকে হেতু করে সাধ্যের অনুমান করা হবে সেই পক্ষে সাবয়বত্ব দৃঢ়রূপে নিশ্চিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যদি অনুমানটি এ রকম হয়—ঘট একটি কার্যবস্তু; যেহেতু তা সাবয়ব (ঘটঃ কার্যম্; সাবয়বত্বাৎ) তবে এই অনুমান করতে হলে ঘটে সাবয়বত্ব রয়েছে এটাই প্রথমে বুঝতে হবে। কিন্তু সাবয়বত্ব বস্তুটি যদি আলোচ্যরূপেই নির্ধারণ করতে হয় তাহলে বুঝতে হবে ঘটের অবয়বে দ্রব্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে আছে বলে ঘটেও সমবেত দ্রব্যত্ব নামক সাবয়বত্ব রয়েছে। কিন্তু ঘটের অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব রয়েছে এটা কিভাবে বোঝা যাবে? বিশেষ করে এটা হচ্ছে পরার্থানুমান; প্রতিবাদীর কাছে বাদী নিজের পক্ষ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে অনুমান সম্ভব হবে না। সাবয়বত্ব শব্দের অর্থ আলোচ্যরূপে উপস্থিত করলে প্রতিবাদী পক্ষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলবেন 'ঘটের অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব রয়েছে' তার প্রমাণ কী? বাদী তখন অন্য একটি অনুমানের সাহায্যে তা নির্ধারণ করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই অনুমানে উপস্থাপিত প্রকারে সাবয়বত্বকে হেতু করলে সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধ হয় অবিশেষ অর্থাৎ সাধ্য যেমন প্রমাণের দ্বারা অনিশ্চিত বলে নির্ধারণের যোগ্য তেমনি হেতুও অন্য প্রমাণ-সাপেক্ষ হওয়ায় সাধ্যের সাথে তার কোনো পার্থক্য থাকবে

না এবং উভয়ই তুল্যরূপে সাধ্য হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে এ জাতীয় হেতু কখনও অনুমানের উপযুক্ত হতে পারে না। আরো একটি কথা, জৈনগণ বলেন সমবেত দ্রব্যত্ব সমবায়-সাপেক্ষ। সমবায় স্বীকার না করলে সমবেত-দ্রব্যত্ব ,সিদ্ধ হয় না। পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে হেতু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের দ্বারাই স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। এখানে নৈয়ায়িকগণ বাদী এবং জৈনসম্প্রদায় প্রতিবাদী। জৈনরা 'সমবায়' নামক সম্বন্ধই স্বীকার করেন না। সুতরাং সমবেত-দ্রব্যত্বকেই যদি সাবয়বত্ব বলা হয় তা হলে জৈনসম্প্রদায়ের নিকট এরূপ হেতু গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হবে। সুতরাং আলোচ্য পরার্থনুমানের ক্ষেত্রে এরূপ হেতুর উল্লেখই করা চলে না।

এরপর পঞ্চম পক্ষটি বিচার করে দেখা যায়। 'সাবয়ব বুদ্ধি বিষয়ত্বই সাবয়বত্ব'—এই হচ্ছে পঞ্চম পক্ষ। কিন্তু এ পক্ষ গ্রহণ করলেও জৈন মতানুসারে দোষ ঘটবে, কেননা জৈনমতে আত্মা সাবয়ব। অতএব সাবয়ব-বুদ্ধির বিষয় আত্মাও হয়; কিন্তু আত্মা অনিত্য নয়; জৈনগণও আত্মাকে নিত্য বলে স্বীকার করেন। সুতরাং যা সাবয়ব বুদ্ধির বিষয় তা-ই অনিত্য—নৈয়ায়িকের এ সিদ্ধান্ত জৈনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জৈনমতে আত্মা সাবয়ব হলেও অনিত্য নয়। নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিরবয়ব। কিন্তু সাবয়ব শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে আত্মাকেও সাবয়বরূপে ব্যবহার করা হয় মাত্র সুতরাং আত্মা প্রকৃতপক্ষে সাবয়ব না হলেও সাবয়বত্বের গৌণ ব্যবহার সেখানে রয়েছে। কিন্তু মুখ্য সাবয়বত্বই এই অনুমানের হেতু। সুতরাং আত্মাতে মুখ্য সাবয়বত্ব না থাকায় কোনো দোষ হয় না। এর উত্তরে জৈন আচার্যগণ বলেন—আত্মা নিরবয়ব—নৈয়ায়িকগণ তা সিদ্ধ করতে পারেন না কারণ যা নিরবয়ব তা কখনও ব্যাপক পদার্থ হতে পারে না; ন্যায় এবং জৈন উভয় পক্ষের সম্মত পরমাণু এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। সুতরাং আত্মা ব্যাপক বলে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তা কখনও নিরবয়ব হতেই পারে না। আত্মা যদি পরমাণুর মতো নিরবয়বই হত তা হলে শরীরের যে কোনো একটি সূক্ষ্মতম অংশেই আত্মার অবস্থান সম্ভব হত বলে ঐ অংশ ভিন্ন শরীরের অন্য অংশের ব্যবহারিক চৈতন্য সম্ভব হত না। অতএব স্বীকার করতেই হয় আত্মা ব্যাপক পদার্থ। যা ব্যাপক তা নিরবয়ব নয়; সুতরাং আত্মাও সাবয়ব। অতএব সাবয়ব বুদ্ধির বিষয় হলেই যদি তাকে সাবয়ব বলা হয় তবে ঐরূপ সাবয়বত্ব কার্যত্বের

সাধক হবে না। জৈনমতে কেবল আত্মাই নয়, আকাশও সাবয়ব। কিন্তু আকাশ নিত্য। সুতরাং জৈনগণ জগৎকর্তারূপে ন্যায়-সম্মত প্রক্রিয়া অনুসারে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। কারণ ন্যায়মতে পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু কার্যদ্রব্য বলেই তার একজন কর্তা স্বীকার করতে হয় এবং বিভিন্ন যুক্তি অনুসারে ঐ কর্তাকেই নিত্যসর্বজ্ঞ বা ঈশ্বর বলা হয়।

জৈনগণ প্রথমতঃ কর্তৃত্ব সাধনের অনুমানে হেতুরূপে প্রদর্শিত 'কার্যত্ব' বললে কী বোঝায় সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ একটি অনুমানের সাহায্যে কার্যত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন; এবং সেই কার্যত্বসিদ্ধির অনুমানে সাবয়বত্বকে হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ যা সাবয়ব তা-ই কার্য, যা কার্য তা কোনো একজন কর্তা-জন্য এবং এইরূপ কর্তাকেই ফলতঃ নিত্যসর্বজ্ঞ বলা হবে।

এই নৈয়ায়িক-সম্মত যুক্তিপদ্ধতির বিরুদ্ধে জৈন আচার্যগণ প্রথমেই সাবয়বত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন; বিভিন্ন যুক্তিতর্কের আনুপূর্বিক উপস্থাপনের সাহায্যে বিচার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সাবয়বত্ব শব্দের সম্ভাব্য সমস্ত রকম অর্থের মধ্যে কোনোটিই অসংকোচে, দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ দেখা যায় তাতে পদে পদে বহুবিধ নৈয়ায়িক অনুপপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ জৈন-সিদ্ধান্ত অনুসারে সাবয়বত্ব কী তা-ই নির্ধারিত হতে পারে না। সাবয়বত্ব নির্ধারিত না হলে সাবয়বত্বকে হেতু করে কার্যত্বের অনুমান করা যায় না; এবং কার্যত্ব সিদ্ধ না হলে কার্যত্বকে হেতু করে জগতের সকর্তৃকত্ব সিদ্ধ হয় না; তাই জগৎকর্তা রূপে নিত্য-সর্বজ্ঞ বা ঈশ্বর সিদ্ধ নন— এই হচ্ছে জৈনদের মৌলিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদের মূল্যায়ন

জগতের কর্তারূপেই ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বর স্বীকার করেন। সুতরাং জগতের কার্য-কারণভাব বা উৎপত্তি-প্রণালীর দিক থেকেই প্রধানতঃ ঈশ্বরের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছেন। কিন্তু জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি কোনো চেতনের প্রচেষ্টাকে অপেক্ষা করে না—এই মত যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা বলেন জগতের উৎপত্তির জন্য ঈশ্বরের কোনোই প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধমতের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অনুসারেই বৌদ্ধগণ জাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি-প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন; সুতরাং বৌদ্ধমতে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন।

মহর্ষি কপিল-প্রবর্তিত বলে প্রসিদ্ধ সাংখ্যমতের আলোচনায়ও দেখা যায় যে জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি প্রধানতঃ জড়-কেন্দ্রিক। যদিও সাংখ্যমতে সৃষ্টি-প্রণালীর ব্যাপারে চেতন পুরুষের সান্নিধ্য স্বীকৃত, তা হলেও সেই চেতন পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলেই চিহ্নিত। অতএব এ চেতন পুরুষ জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণ নন। ত্রিগুণাত্মিকা অচেতন প্রকৃতিই চেতনের সান্নিধ্যের ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। এই অচেতন প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ বলে কোনো চেতন ঈশ্বর অভিধেয় পুরুষকে জগতের কর্তারূপে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

সাংখ্য সৃষ্টি-প্রণালী 'পরিণামবাদ' অনুসারে কোনো একটি দ্রব্য চিরন্তন হলেও তার অবস্থা সমূহের নিয়ত পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের ফলেই প্রয়োজন সিদ্ধির বাস্তব রূপ উদ্ভূত হয়। কোনো একটি দ্রব্য চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও তার পূর্বাবস্থার নিবৃত্তি ও পরবর্তী অন্য অবস্থার আবির্ভাবকেই 'পরিণাম' বলে।[১০৩]

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎ; মহতের পরিণাম অহংকার; অহংকার তত্ত্বের সত্ত্ব-প্রধান অংশ থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ-প্রধান অংশ থেকে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর

১০৩। অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ। (**পাতঞ্জল দর্শন**; ব্যাসভাষ্য, সূত্র ৩।১৩)।

এই উভয় অংশ থেকে মন ও তম-প্রধান অংশ থেকে পঞ্চতন্মাত্রার সৃষ্টি হয়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এই পাঁচটির সূক্ষ্ম অবস্থাকেই তন্মাত্রা বলে। পঞ্চতন্মাত্রা থেকে পঞ্চ-মহাভূতের আবির্ভাব। এই হচ্ছে সাংখ্য-প্রসিদ্ধ সৃষ্টি-প্রণালী।[১০৪]

পরস্পর-বিপরীত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ অন্যূন ও অনতিরিক্ত অবস্থা প্রকৃতি রূপে স্বীকৃত। এই সাম্যাবস্থার প্রথম বিক্ষোভ বা পরিণাম কেন হয় তা-ই হল প্রশ্ন। সাংখ্য দর্শনের 'প্রবচন ভাষ্য' রচয়িতা বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন— ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন প্রকৃতির প্রথম বিক্ষোভ সম্ভব নয়। সাম্যাবস্থাই তার স্বভাব ; তার বিক্ষোভ বিশেষ কোনো কারণ ভিন্ন হতে পারে না। সুতরাং এই বিক্ষোভের কারণরূপেই ঈশ্বর স্বীকার করা প্রয়োজন। সাংখ্যকারের সুপরিজ্ঞাত ঈশ্বরাসিদ্ধি সত্ত্বেও প্রবচনভাষ্যকারের এই ঈশ্বরানুমান কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা নিশ্চয়ই আমাদের অন্যতম বিচার্য হওয়া উচিত।

লক্ষ্য করার বিষয়, ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত 'সাংখ্যকারিকা'-য় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকেই সৃষ্টির কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সাংখ্যকারিকা'-য় বলা হয়েছে, ভোগ এবং মুক্তি পুরুষার্থ। সাংখ্যমতে এই পুরুষার্থ দুই প্রকারের—ব্যক্ত ও অ-ব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্ট নামে প্রসিদ্ধ। এই পুরুষার্থ অনাদি। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ; সুতরাং প্রকৃতির সাহায্য ভিন্ন তার ভোগ বা মুক্তি-রূপ পুরুষার্থ সম্ভব নয়। অনাদি পুরুষার্থই প্রকৃতিকে পুরুষের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ করে রেখেছে। অব্যক্ত পুরুষার্থ অভিব্যক্তির জন্য উন্মুখ হলে প্রকৃতির প্রথম বিক্ষোভ বা পরিণাম আরম্ভ হয়—এইটিই হল সৃষ্টি। প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে সম্মিলিত হয়ে পুরুষ সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে। সুখ সত্ত্বগুণের এবং দুঃখ রজগুণের বিকাশ ; সুতরাং তা প্রকৃতির ধর্ম। কিন্তু ভোক্তা না থাকলে সুখ বা দুঃখ ভোগ্য বলে নির্বাচিত হতে পারে না। অতএব ভোগের জন্য ভোক্তা ও ভোগ্য এই দুই-ই অপেক্ষণীয়। এরূপ ভোগের ফলে পুরুষ যখন বুঝতে পারে যে সাংসারিক দুঃখের গ্লানি সুখের মাধুর্য অপেক্ষা অধিক কষ্টকর তখনই পুরুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তথা বৈরাগ্যের উদয় হয়। মুক্তিলাভ করতে হলে প্রকৃতি ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এই বিষয়ে সুদৃঢ় সাক্ষাৎকার

১০৪। প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহংকারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।। (সাংখ্যকারিকাঃ ২২)

প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারও বুদ্ধির বৃত্তি-বিশেষ। সুতরাং দেখা যায় যে বুদ্ধি না হলে ভোগ বা মোক্ষ কিছুই হয় না। সুতরাং ভোগ ও মোক্ষের জন্য পুরুষ প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে কারণ প্রকৃতি না হলে বুদ্ধি সম্ভব নয়। এভাবে পরস্পারের অপেক্ষা-জন্য প্রকৃতি-পুরুষের যে সম্বন্ধ তা-ই সৃষ্টির ও মোক্ষের কারণ। প্রশ্ন হতে পারে, পুরুষ চেতন হলেও নিষ্ক্রিয়; অন্যদিকে প্রকৃতি সক্রিয় হলেও অচেতন। সুতরাং এই অবস্থায় পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ কী করে সিদ্ধ হয়? এই সঙ্গত প্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ একটি প্রসিদ্ধ লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টিশক্তিবিহীন হলেও একজন দৃষ্টিশক্তিশালী পঙ্গুকে নিজস্কন্ধে বসিয়ে স্কন্ধারূঢ় দৃষ্টিশক্তিশালীর নির্দেশ অনুসারে চলে উভয়ে মিলে যেমন একজন অন্ধ ও একজন খঞ্জ অবিকলেন্দ্রিয় একজন মানুষের ন্যায় কার্য সম্পাদন করতে পারে —অনুরূপভাবে নিষ্ক্রিয় অথচ দৃষ্টিশক্তিশালী পুরুষ দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়ে একজন অবিকল-ইন্দ্রিয় চেতন-ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতে পারে। এই কার্যের ফলেই প্রকৃতির পরণাম মহৎ-তত্ত্ব ইত্যাদি রূপে সৃষ্টি হয়।[১০৫]

সুতরাং সাংখ্য-সিদ্ধান্ত অনুসারে চেতন পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টির কারণ; তাই তাঁদের মতে সৃষ্টি-প্রণালীর হেতু হিসাবে ঈশ্বরের কোনোই প্রয়োজন নেই। 'সাংখ্যাকারিকা'-র শেষভাগে ঈশ্বর-অস্বীকারসূচক সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র সেই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাবেই ঈশ্বর অস্বীকার করেছেন। কারিকায় বলা হয়েছে, মহৎ তত্ত্ব থেকে স্থূল পঞ্চভূত পর্যন্ত সবই প্রকৃতির কার্য; তা পুরুষের বন্ধনমোচনের জন্যই সংঘটিত হয়। সুতরাং পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই প্রকৃতি এরূপ সৃষ্টি করে থাকেন। এই কারিকার **তত্ত্বকৌমুদী টীকায়** বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, মহৎ থেকে আরম্ভ করে স্থূল পঞ্চভূত পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব প্রকৃতিই সম্পাদন করে এই বিষয়ে ঈশ্বরের কোনোই প্রয়োজন নেই। এ থেকে বোঝা যায়, এ সৃষ্টি কোনো কারণ ব্যতীত সংঘটিত হয় নি; কিন্তু বেদান্ত মতানুসারে ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ হিসাবে স্বীকৃত হলেও বাচস্পতি মিশ্র মনে করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা জাগতিক কার্যবস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই

১০৫। পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।। (সাংখ্যকারিকাঃ২১)

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই সৃষ্টির হেতু। ঈশ্বর অচেতন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হিসাবে জগতের কর্তা স্বীকৃত হতে পারেন না ; কারণ সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের নিজস্ব কোনো চেষ্টা আছে কি না। যদি তাঁর নিজস্ব কোনো চেষ্টা না থাকে তবে এরকম অধিষ্ঠাতা একজন ঈশ্বর স্বীকার করার কোনো আবশ্যকতা নেই। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং প্রযত্ন-শূন্য হলে তিনি কারো অধিষ্ঠাতা রূপে কল্পিত হতে পারেন না ; ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট হলে তাঁর পক্ষে জগতের কারণ হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে যদি ঈশ্বরকে প্রযত্নশীল বলে স্বীকার করা হয় তাহলে তাঁকে শরীরধারী হতে হবে কারণ শরীরহীন কোনো চেতন প্রযত্নশীল হতে পারেন না। তাই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হিসাবে ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

তারপর এই যুক্তিধারা অনুসরণ করে আরো একটু অগ্রসর হয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, যদি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হিসাবে ঈশ্বর স্বীকৃত হন তা হলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অহেতুক করুণা বা বিদ্বেষ রয়েছে। তিনি করুণাময় হলে জগতে দুঃখের লেশমাত্র থাকত না, অন্যদিকে বিদ্বেষপূর্ণ হলে জগতের সকলেই দুঃখভোগ করত। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এ দুটোর একটাও বলা চলে না ; কারণ তাতে তাঁর ঈশ্বরত্বই নষ্ট হয়ে যায় ; অথচ করুণা বা বিদ্বেষ না থাকলে কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। ঈশ্বর তাই জগৎকর্তা হতে পারেন না।[১০৬]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর স্বীকৃত হন নি। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর 'প্রবচনভাষ্যের' ভূমিকায় সাংখ্য নিরীশ্বরবাদের সমর্থক নয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'-য় এবং তাঁর

১০৬। ইত্যেষপ্রকৃতিকৃতো মহদাদি-বিশেষভূত-পর্যন্তঃ। প্রতি পুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ।। (সংখ্যকারিকা-৫৬)

নেশ্বরাধিতিষ্ঠিতপ্রকৃতিকৃতঃ, নির্ব্যাপার-স্যাধিষ্ঠাতৃত্বাসম্ভাবাৎ। ন হি নির্ব্যাপারস্তক্ষা ব্যাস্যাদাধিষ্ঠতিষ্ঠতি (তত্ত্বকৌমুদীটীকা-সূত্র পূর্ব্ববৎ)।

ন চ ক্ষীর প্রবৃত্তেরপীশ্বরাধিষ্ঠাননিবন্ধনত্বেন সাধ্যবত্তান্ন সাধ্যেন ব্যভিচার ইতি সাম্প্রতৎ, প্রেক্ষাবং প্রবৃত্তেঃ স্বার্থকারুণ্যাভ্যাং ব্যাপ্তত্বাৎ। তে চ জগৎসর্গাদ্ব্যাবর্ত্তমানে প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্তিপূর্বকত্বমপি ব্যাবর্ত্তয়তঃ। নহি অবাপ্ত-সকলেপ্সিতস্য ভগবতো জগৎ সৃজতঃ কিমপ্যভিলষিতং ভবতি, নাপি কারুণ্যাদস্য সর্গে প্রবৃত্তিঃ। প্রাক্ সর্গোত্তরকালং দুঃখিনোহবলোক্য কারুণ্যাভ্যুপগমে দুরুত্তরমিতরেতরাশ্রয়ত্বং ; কারুণ্যেন সৃষ্টিঃ সৃষ্ট্যা চ কারুণ্যমিতি। (তত্ত্বকৌমুদী টীকা ; সাংখ্যকারিকা ৫৭)।

'তত্ত্ব কৌমুদী' টীকায় ঈশ্বর খণ্ডনের কথাই বলা হয়েছে। বিজ্ঞান—ভিক্ষু কোন যুক্তির ভিত্তিতে ঈশ্বর স্বীকারে ব্রতী হয়েছেন তা বিচার করে দেখা যাক।[১০৭]

মনে করা চলে, সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে যোগদর্শন ও বেদান্তদর্শনের মতভেদ পরিহার করার জন্যই বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনকেও ঈশ্বরবাদী দর্শন বলেছেন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে (সমাধিপাদ-২৪ সূত্রে) ও বেদান্তদর্শনে (২।৩।৪১) ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন। অথচ, সাংখ্য-দর্শনের ১।৯২ সূত্রে ঈশ্বর অস্বীকার করে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে ঃ 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। ফলে, যোগদর্শন ও বেদান্তদর্শনের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের বিরোধ ঘটে। তাই দার্শনিকক্ষেত্রে সমন্বয় প্রয়াসী বিজ্ঞান-ভিক্ষু এ দ্বন্দ্ব বিরোধ পরিহারের জন্য বলেছেন, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' ইত্যাদি সূত্রে সাধারণ যুক্তির দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ নন শুধু একথাই বলা হয়েছে, ঈশ্বর এতে অস্বীকৃত হন নি। কারণ ঈশ্বরের অনঙ্গীকার যদি অভিপ্রেত হত তা হলে সূত্রটি 'ঈশ্বরাভাবাৎ' ঐ রকমই হত। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' এ কথা বলায় এইমাত্র বোঝা যায় যে লৌকিক যুক্তির দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন না।

বিজ্ঞানভিক্ষুর আরেকটি যুক্তি হচ্ছে বিভিন্ন শাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদ নিন্দিত হয়েছে ; মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্যশাস্ত্র অযথা এই নিন্দিত মহলের অংশ হতে যাবে কেন? তাই ঈশ্বরের অসিদ্ধতাসূচক সূত্র রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরূপ বলে বিজ্ঞানভিক্ষু মনে করেনঃ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত না হলে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর স্বীকার করলে তার নিত্য-ঐশ্বর্যাদিও স্বীকার করতে হয়। ভোগ্য বিষয় অনিত্য বলে তাঁর প্রতি বৈরাগ্যের উদয় সম্ভব ; যখন এ বৈরাগ্য উদয়ের ফলে আত্মা নিত্য এ বোধ জন্মে তখনই মোক্ষের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নিত্য ঐশ্বর্য রয়েছে এটা জানার ফলে সাধকের মনেও ঐ নিত্য-ঐশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা

১০৭। প্রসঙ্গতঃ অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন সাংখ্যদর্শন বলে প্রচারিত সূত্র-সমূহ আদৌ মহর্ষি কপিল প্রণীত কিনা। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র ষড়দর্শনের টীকাকার বলে সুপ্রসিদ্ধ ; অথচ- তিনি সাংখ্য দর্শনেব টীকা না কবে ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকা-র টীকা রচনা করায় একথাই সাধারণভাবে মনে করা হয় যে সাংখ্যদর্শন কপিল-প্রণীত নয়। যাই হোক, বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মতগ্রহণ করেই সাংখ্য-দর্শনের সূত্র অনুসারে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের আলোচনা আমরা করব।

দেখা দিতে পারে ; এতে করে বৈরাগ্যই বিঘ্নিত হতে পারে। তাই যোগীর পক্ষে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নিত্য নয় এই দৃঢ় প্রতীতি আবশ্যক। এই প্রতীতি ও জ্ঞানের সহায়তার জন্যই আদিবিদ্বান সাংখ্যকার কপিল চার্বাক-মতানুসারী ঈশ্বর অসিদ্ধি পূর্ণাঙ্গ অপনোদনের জন্যই অনুরূপ সূত্রটি রচনা করেছেন। সুতরাং ''ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'' সূত্র থেকে যে নিরীশ্বরবাদের ইঙ্গিত তা আপাতদৃষ্টিতে লোক ব্যবহারিকভাবে বলা হয়েছে মাত্র, পারমার্থিকভাবে এতে করে নিরীশ্বরবাদ স্বীকৃত হয় নি।[১০৮]

কিন্তু বহুপ্রযত্নে রচিত বিজ্ঞানভিক্ষুর এ বক্তব্য কতখানি সাংখ্য-সম্মত সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বর নিষিদ্ধ হন নাই, কারণ 'ঈশ্বরাভাবাৎ' একথা বলা হয় নি —বিজ্ঞানভিক্ষুর এ যুক্তি সমীচীন বলে মনে হয় না। কোন বস্তু দার্শনিক মতে 'অসিদ্ধ' বললে তার অভাবই সূচিত হয় ; অর্থাৎ 'অসিদ্ধি' ও 'অভাব' প্রায় সমার্থক। সাংখ্যদর্শনে কোথাও নৈয়ায়িক-সম্মত পরমাণুর অভাব বর্ণিত হয় নি। তাহলে কি একথা বলা চলে যে সাংখ্যদর্শনে নৈয়ায়িক-সম্মত পরমাণুবাদ স্বীকৃত হয়েছে ? বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদনই মুখ্যতঃ দর্শনশাস্ত্রের রীতি। সাংখ্যের প্রকৃতি বা বহুপুরুষবাদ এ ধরনের বহু যুক্তিতর্কের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে। ঈশ্বর একটি মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই সেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ বহু লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের কোথাও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নেই। তাই বোঝা যায় সাংখ্যমতে ঈশ্বর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত নয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়েই 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' এই সূত্রটির উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যক্ষের লক্ষণ অনুযায়ী ঈশ্বরের অব্যাপ্তি হয় বলে সূত্রকার 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের উদ্ধার করেছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষলক্ষণের একটি আপত্তি দূর করার জন্যই সূত্রটি উপস্থিত করা হয়েছে। আর এই জন্যই বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রটি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর অস্বীকৃতি সূচক নয় একথা বলেন ; তাঁর মতে ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ নন, সূত্রকার শুধু এটুকুই বলতে চেয়েছেন।

১০৮। অত্রাপি ব্যবহারিক পারমার্থিকভাবো ভবতি... সেশ্বরবাদস্য ন ক্বাপি নিন্দাদিকমস্তি। (প্রবচনভাষ্যভূমিকাঃ সাংখ্যদর্শন।)

কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা তাঁর সঙ্গে যুক্তির বিরোধ রয়েছে। প্রমাণসিদ্ধ না হলেও যদি অস্তিত্ব স্বীকার্য হয়, তবে 'আকাশ কুসুম'-এর অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ না হওয়া এবং বস্তুর অভাব স্বীকৃত হওয়া একই কথা। তাই সাংখ্যকারের 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' সূত্রের যথার্থ তাৎপর্য হল ঈশ্বরের অসিদ্ধি ও অভাব।

এই সূত্র ভিন্ন প্রথম অধ্যায়ে অন্য তিনটি সাংখ্য-সূত্রও এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়ঃ

''মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।'' ১।৯৩

''উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।'' ১।৯৪

''মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।'' ১।৯৫

এখানে প্রথম সূত্রটির (১।৯৩) অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর মুক্ত বা বদ্ধ এই দুয়ের একটি হবেন কারণ তিনি অন্যতর কিছু হতে পারেন না। ঈশ্বরকে চেতন বলে স্বীকার করতেই হবে, সুতরাং ঈশ্বরও পুরুষ। পুরুষ নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ ও চৈতন্যস্বরূপ; শুধু তা-ই নয়, সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও কূটস্থ অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় স্বভাববিশিষ্ট। কেবলমাত্র অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ায় ইতরেতরাধ্যাসবশতঃ পুরুষকে সংসারী বা বদ্ধ বলা হয়। ঈশ্বর নামক পুরুষকে মুক্ত অথবা বদ্ধ এ দুয়ের যে কোনো একটি হতেই হবে। মুক্ত স্বভাব হলে তাঁর ইচ্ছা, প্রযত্ন, প্রবৃত্তি ইত্যাদি থাকবে না; এই অবস্থায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা সৃষ্টি ক্ষমতার অভাব স্বীকার করতেই হয়। অন্যদিকে বদ্ধ হলেও তিনি সাধারণ জীবের মতোই সর্বজ্ঞ ও জগৎকর্তা হতে পারবেন না। অতএব ঈশ্বর-স্বীকৃতি অসম্ভব এই হচ্ছে ১।৯৩ সূত্রের নির্গলিতার্থ।

প্রশ্ন হতে পারে, ঈশ্বর যদি প্রমাণ-সিদ্ধই না হন তাহলে বহু মনীষী ও অসংখ্য শাস্ত্রকারের এই ঈশ্বর-সাধন প্রয়াস কেন? তারই উত্তরে ১।৯৪ সূত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্ত ঈশ্বর বলতে আত্মাকেই বোঝায়; সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণাবলীসম্পন্ন হিসাবে এই মুক্তাত্মার স্বরূপলাভের প্রবৃত্তি সাধারণের মনে জন্মাবার জন্যই তাঁকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই হচ্ছে বক্তব্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ যে ঈশ্বর অভিধায় আখ্যায়িত হন তার অর্থ হচ্ছে যথাযথ উপাসনা ও যোগানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা মুক্তাত্মা হওয়ায় তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য জন্মেছে। আপামর জীবের পক্ষে অনুরূপ উৎকর্ষলাভ

অসম্ভব। অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব উপাসনা প্রভাবে লব্ধ একটি পরম অবস্থা বিশেষ। নিত্য-ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তারই জন্য সাংখ্য দর্শনের ৩।৫৭ সূত্রে বলা হয়েছেঃ 'ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা'। এই সূত্রের অভিপ্রায়, যে সমস্ত যোগীর অন্যান্য বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য হলেও যাঁরা প্রকৃতিকে সারবস্তুজ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁদের দেহপাতের পর প্রকৃতিতেই তাঁদের লয় হয়। এইসব যোগীদের বলা হয় 'প্রকৃতিলয় যোগী'। (পাতঞ্জল দর্শন, ১৯ সূত্র দ্রষ্টব্য।)

এই প্রকৃতি-লীন যোগীরা প্রকৃত মুক্ত নন কেননা তাঁদের আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়ায় তাঁরা বদ্ধই থেকে যান। কিন্তু সুচিরকাল প্রকৃতি-লীন অবস্থায় থাকলেও তাঁদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়; যদিও ঐ জন্মই হয় তাঁদের শেষ জন্ম। এই বক্তব্য পুরাণ-সম্মত। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর 'প্রবচনভাষ্যে'ও একথা বলেছেন, এ যেন জলমগ্ন ব্যক্তির পুনরুত্থান; এ ধরনের আবির্ভূত পুরুষকেই ঈশ্বর বলা চলে, কেননা তাদের বৈরাগ্যপরিশুদ্ধ নির্মল চিত্তে বিষয়-বাসনা না থাকায় তাঁদের মধ্যে প্রাকৃতিক সমূহগুণের চরম উৎকর্ষ ঘটে।[১০৯] সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষু নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বর নামে পরিচিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির ফলেই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, এরূপ প্রকৃতি-লীন পুরুষকেই 'সর্ববিৎ সর্বকর্তা' ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন শ্রুতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সাংখ্যসূত্রেও বলা হয়েছে 'স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা' (৩।৫৬)। তার অর্থ হচ্ছে-পূর্বকল্পে প্রকৃতি-লীন পুরুষ কল্পান্তরে আবির্ভূত হয়ে সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। সূত্রকারের এই বক্তব্যের জন্য আশঙ্কা হতে পারে যে অন্যান্য ঈশ্বর নিষিদ্ধ হলেও এই সূত্রে সর্বকর্তা রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায় স্ব-বিরোধ ঘটেছে। এই সম্ভাব্য আশঙ্কার উত্তরেই আলোচ্য সূত্র দুটি ১।৯৪ ও ১।৯৫ রচিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'জন্য-ঈশ্বর' প্রমাণ-সিদ্ধ হলেও 'নিত্যসর্বজ্ঞ' ঈশ্বর প্রমাণ-সিদ্ধ নন। যথার্থ ঈশ্বর-স্বীকৃতি বলতে ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকৃতিই বোঝায়। তাই সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত এই অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

তারপর সাংখ্য দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার প্রসঙ্গে সূত্রকার পরপর একাদশটি সূত্র উত্থাপন করে ঈশ্বর-নিষেধ করেছেনঃ

১০৯। যথাজলমগ্নঃ পুরুষঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি এবমেব প্রকৃতি-লীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বরভাবেন পুনরাবির্ভবন্তি। (প্রবচনভাষ্য ;৩।৫)

'নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ।' ৫।২
'স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।' ৫।৩
'লৌকিকেশ্বর বদিতরথা।' ৫।৪
'পারিভাষিকো বা।' ৫।৫
'ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।' ৫।৬
'তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ।' ৫।৭
'প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ।' ৫।৮
'সত্তামাত্রাচ্চেৎ সৰ্ব্বৈশ্বৰ্য্যম্।' ৫।৯
'প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।' ৫।১০
'সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্।' ৫।১১
'শ্রুতিরপি প্রধানকার্যত্বস্য।' ৫।১২

প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর অসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ নন তা-ই ছিল বক্তব্য। ঈশ্বরবাদীরা বলেন ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ। কর্মের তারতম্যানুসারে ফলভোগ নিয়ন্ত্রণ করার মতো কেউ না থাকলে যে কোনো কর্মানুষ্ঠান করে চিরকালের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ফল কেউ ভোগ করে ফেলতে পারেন। অথচ নির্দিষ্ট কর্মের নির্দিষ্ট ফললাভই উপযুক্ত ব্যবস্থা। সুতরাং কর্মানুরূপ ফল নির্ধারিণ করার মতো অভিজ্ঞ কেউ না থাকলে 'এই কর্মের এই ফল' তা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। সুতরাং অতীত, অনাগত ও বর্তমান কালের সমস্ত প্রাণীর অনন্ত বৈচিত্র্যময় কর্মের বিভিন্ন ফল প্রদানের জন্য একজন সর্বজ্ঞ কর্মফলদাতা রয়েছেন, তাই ঈশ্বরের অনুমান যুক্তিসিদ্ধ।

এই প্রশ্নের উত্তরেই সাংখ্য সূত্রকার উপরে উল্লিখিত যুক্তিরাজি হাজির করেছেন। ঈশ্বর ফলদান করেন এই যুক্তি কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম কথা, ঈশ্বর যদি কর্মের ফল স্বাধীনভাবে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন তা হলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ অবশ্যম্ভাবী। কর্মের শুভাশুভ বিচার ঈশ্বরের কল্পিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ ঈশ্বরত্ব কার্যতঃ স্বৈরাচারেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে। ৫।৪ সূত্রের থেকে এই পরিণতিই ঘটে। তা হলে ঈশ্বরকে আপ্তকাম বলা চলে না। অন্যদিকে ঈশ্বর নিজের উপকারের জন্যই যদি জগৎসৃষ্টি করেন তবে তাপ ক্লেশ দুঃখময় পৃথিবীর স্রষ্টাকে করুণাময় বলা চলে না। শ্রুতিতেও সাক্ষ্য রয়েছে যে ঈশ্বরেচ্ছাতেই কোনো ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করার জন্য তিনি শুভকর্মানুষ্ঠান করান

আবার যাকে ঈশ্বর নিম্নগামী করতে চান তাকে অ-শুভ কর্মানুষ্ঠান করান। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৩।৮ দ্রষ্টব্যঃ 'এষ হি এব সাধু কর্মকারয়তি তং যম্ এভ্যঃলোকেভ্যঃ উন্নিনীষত এষ উ এবাসাধু কর্মকারয়তি তং যমধো নিনীষতে।' এই শ্রুতিতে সুস্পষ্টভাবেই ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রকট। অথচ পক্ষপাতিত্ব দোষদুষ্ট হয়েও যদি ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হতে পারেন তাহলে দোষদুষ্ট সংসারী মানুষও এক একটি জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু মানুষ নিজে জগৎস্রষ্টা হলে কেউই দুঃখময় জগৎসৃষ্টি করতেন না। কোনো বুদ্ধিমান মানুষ দুঃখভোগ করার জন্য যন্ত্রণাদায়ক এই কারাগার নিজে রচনা করবেন এটা যুক্তি ও অনুভব-বিরুদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বর কর্মফল রচনা করে জগৎসৃষ্টি করেছেন এটা কোনোমতেই স্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে যদি বলা হয় ঈশ্বর কর্ম ও কর্মজন্য ফল সৃষ্টি করেন নাই, তিনি কর্মের সঙ্গে ফলের সংযোগকারী, তাহলে ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব দোষমুক্ত হন বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে তখন জগৎকর্তা বলা চলে না কারণ তিনি সর্বকর্তা নন। এতে তাঁর ঈশ্বরত্বই ব্যাহত হয়।

তাছাড়া সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঈশ্বরের যদি প্রয়োজন তথা অভাব-বোধ না থাকে তবে তিনি সৃষ্টির এই বিরাট প্রয়াসে অবশ্যই লিপ্ত হতেন না। বিনা প্রয়োজনে লীলার ছলে এই দুঃখময় জগৎসৃষ্টি যুক্তিসিদ্ধ হয় না। আবার প্রয়োজন-বোধ থাকলে ঈশ্বরের অনুরাগ ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ঈশ্বর তাহলে আর পূর্ণ থাকেন না।[১১০] পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যেও এই প্রশ্নের অবতারণা করে বলা হয়েছে ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি নিজের প্রয়োজনে নয়, তা তিনি করেন জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ।[১১১] কিন্তু জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে অনুগ্রহাদি প্রবৃত্তি স্বীকার করলে রাগদ্বেষ প্রভৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ায় এমন ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত বলা চলে না। স্বভাবতঃ ঈশ্বরসিদ্ধি যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা রূপেই ঈশ্বর স্বীকৃত হয়ে থাকেন। রাগ, ভয়, দুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদি আন্তর বস্তুসমূহও সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্গত;

১১০। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লীলাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছেঃ 'লোকবৎ তু লীলা কৈবল্যম্'-বেদান্তদর্শন, ২।৩৩।

১১১। তস্য আত্মানুগ্রহভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।' পাতঞ্জলদর্শন; ব্যাসভাষ্য, ১।৫

সুতরাং এইসব সৃষ্ট পদার্থের অনুভবও ঈশ্বরের থাকা চাই। ঈশ্বর স্বাধীন ও শক্তিমান স্বতন্ত্র হলে অনভিপ্রেত দুঃখ প্রভৃতির সৃষ্টি করতেন না। সুতরাং এই দিক থেকেও ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। তাই উপরে উল্লিখিত সূত্র সমূহে বলা হয়েছে -প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ ; ব্যাপ্তির অভাব থাকায় ঈশ্বরানুমান গ্রাহ্য নয়। অন্যদিকে শ্রুতিপ্রমাণেও প্রকৃতি-কার্যতা প্রমাণিত।

আসলে সাংখ্য দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গেই ঈশ্বরের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। সাংখ্য মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি চেতন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য মহৎ প্রভৃতিরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়। চেতন পুরুষ কূটস্থ, নির্বিকার, অসঙ্গ ও অপরিণামী হলেও তার সান্নিধ্য-বশতঃই জগৎ রচিত হয়। এর মধ্যে ঈশ্বর কাকে বলা হবে? প্রকৃতি অচেতন তা ঈশ্বর হতে পারে না ; অন্যদিকে পুরুষ অসঙ্গ ও নির্বিকার বলে তাকে জগৎকর্তা বলা চলে না। তাই সাংখ্যমতে কল্পিত ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় অসাধ্য। সূত্রকার বলেছেন পুরুষ নির্গুণ বলেই চৈতন্য তার ধর্মমাত্র নয়, অর্থাৎ পুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ।[১১২] পুরুষকে ঈশ্বর বললে তার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হবে না ; কারণ সাংখ্যমতে পুরুষ কর্তা নন।

পুরুষের পক্ষে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম বাস্তবে সম্ভব না হলেও অন্তঃকরণ বৃত্তির সঙ্গে ইতরেতরাধ্যাসবশতঃই পুরুষ বা অহংপদবাচ্য বস্তুতে কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হয়।[১১৩]

ঈশ্বর নিরাকরণের শেষ যুক্তি হল, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য যাঁর আছে তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু চেতন পুরুষরূপী ঈশ্বরের এ রকম ঐশ্বর্য যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তবে সমস্ত পুরুষেরই এই ঐশ্বর্য স্বতঃসিদ্ধ হবে না কেন? যদি অন্যান্য পুরুষেরও এই ঐশ্বর্য স্বতঃসিদ্ধ হয় তবে সকল পুরুষকেই ঈশ্বর বলা চলে। তাহলে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য কিছুই থাকল না। আবার যদি বলা হয় এরূপ ঐশ্বর্য সমস্ত পুরুষের ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ হলেও রজঃ ও তমঃ গুণের

১১২। 'নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্মা' ; সাংখ্যদর্শন, ১।১৪৬ সূত্র।

১১৩। সাংখ্য মতানুসারে পুরুষের নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং অসঙ্গ হলেও বিষয়াকারে পরিণত -বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে তার ফলে অচেতন বুদ্ধিবৃত্তিকে চেতন এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষকে সক্রিয় কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতি রূপে মনে হয়। এই অবস্থাই সংসার বা বন্ধন। প্রকৃতি পুরুষ ভেদ সাক্ষাৎকার হলেই এরূপ ভ্রম দূর হয়, তখনই পুরুষ মুক্ত হন। সুতরাং ঈশ্বরকে এই প্রণালীতে কর্তা মনে করলে ঈশ্বর সাংসারী জীবের মতোই বদ্ধ-পুরুষ হয়ে পড়েন।

আধিক্যবশতঃ তার স্বতঃস্ফূর্তি ঘটেনা; কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের জন্য এই ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এরূপ ঐশ্বর্য সমূহ পুরুষের স্বরূপের অন্তর্গত হলে পুরুষকে নির্গুণ, নির্লিপ্ত প্রভৃতি বলা যায় না। সুতরাং অন্তঃকরণের ধর্মই ঐশ্বর্য তা মেনে নিতে হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ প্রকৃতিপ্রজাত বলে জড় পদার্থ। তাই অন্তঃকরণ বৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে পরস্পর অধ্যাসমূলক ব্যবহার হিসাবেই অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য পুরুষের আছে স্বীকার করতে হয় অতএব ঈশ্বরের ঐরূপ ঐশ্বর্য স্বীকার করলেও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের ঐশ্বর্য ঈশ্বরের আছে বলে স্বীকার করলেও ঈশ্বরও অধ্যাসমূলক ব্যবহার-জাত বস্তু হয়ে দাঁড়াবেন— সুতরাং এমন ঈশ্বরকে মুক্তপুরুষ বলা চলে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকলেও অধ্যাস ব্যতীত এরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম পুরুষের ধর্মরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। যোগের চরম উৎকর্ষ যাদের ঘটেছে সেই অলৌকিক প্রজ্ঞাশীল যোগীরাই এরূপ শুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত অন্তঃকরণের অধিকারী হন, তাহলে এঁরাও ঈশ্বর বলে নির্দিষ্ট হন। অন্তঃকরণের সঙ্গে অধ্যাস ব্যতীত পুরুষের পক্ষে ঐশ্বর্যশালী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার অন্তঃকরণ স্বীকার করলে ঈশ্বরকে দেহধারী বলে মানতেই হয়, ঈশ্বর তার ফলে সাবয়ব ও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁর অনিত্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে কোনো যুক্তিতেই তাই সাংখ্যসম্মতভাবে জগৎকর্তা রূপে ঈশ্বর সিদ্ধ হন না!

'প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ' অর্থাৎ প্রমাণের অভাবহেতু ঈশ্বর অসিদ্ধ এই সূত্র (৫।১০) থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে সূত্রকার ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিলেন না। 'সাংখ্যকারিকা'-র ভাষ্যকার গৌড়পাদ ভাষ্যের শেষাংশে ঈশ্বর বিষয়ে তবু বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এতে কোনো সংশয় নেই যে গৌড়পাদের মনোভাব ঈশ্বরসিদ্ধিরই অনুকূল। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকায় ঈশ্বরের নাস্তিত্বসূচক যে আলোচনা রয়েছে তা খণ্ডনের মতো উপযুক্ত যুক্তিসন্নিবেশ গৌড়পাদের রচনায় পাওয়া যায় না। একই দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যেরা এ ধরনের পরস্পর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করায় খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া অপ্রত্যাশিত নয় এবং কার্যতঃ তা-ই হয়েছে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনায় যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের ওপরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সেই বিচারে সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় ঈশ্বর স্বীকৃতির অনুকূলে গ্রাহ্য কোনো যুক্তি ও প্রমাণ মেলে না।

বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও সাংখ্যসূত্রের 'প্রবচনভাষ্যে' সাংখ্য দর্শনকে সেশ্বর বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তাঁর যুক্তি গ্রহণযোগ্য ও সবল নয়। 'প্রবচনভাষ্যে' বিজ্ঞানভিক্ষু মুখ্যতঃ যে যুক্তির ওপর নির্ভর করেছেন তা হ'ল সাংখ্য একটি উৎকৃষ্ট দর্শন তাই তা নিন্দনীয় নিরীশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। নিরীশ্বরবাদের এই নিন্দা ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে না। 'সেশ্বরবাদই শ্রেষ্ঠ' বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মানদণ্ড দার্শনিক বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে মানা যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে যুক্তিসিদ্ধ বিচারের, বিশ্বাসের দৃঢ় ঘোষণাতেই তা পর্যবসিত হলে চলে না। প্রতিপাদ্যকে যুক্তি সহকারে স্বীয় দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চয়ই উত্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হবে, সেক্ষেত্রে যুক্তির সারবত্তাই প্রধান বিবেচ্য। সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব ঈশ্বর-নির্ভর কিনা এটাই এক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য হওয়া উচিত। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সাহায্যে যেভাবে সৃষ্টি প্রণালীর প্রশ্নটি আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থানই নেই। বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্য তাই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে বলাই সঙ্গত।

প্রসঙ্গতঃ 'পাতঞ্জল' যোগদর্শনের ঈশ্বর সিদ্ধির প্রশ্নটি আমরা বিচার করে দেখতে চাই। পাতঞ্জল দর্শনে সাংখ্যতত্ত্বকে দার্শনিক অবস্থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই পাতঞ্জল দর্শন 'সেশ্বরসাংখ্য' বলে প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জল দর্শনকে 'সেশ্বর' বলে আখ্যায়িত করার মধ্য দিয়ে কার্যতঃ সাংখ্যদর্শনের 'নিরীশ্বরত্বই' স্বীকৃত হয়েছে বলা চলে।

পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত ; তাই কেউ কেউ মনে করেন কপিলোক্ত সাংখ্যদর্শনেও ঈশ্বর অস্বীকৃত হতে পারেন না। এই আশংকা যে যথার্থ নয় তা-ই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। পাতঞ্জল দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে কোনো প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করেনি ; তাই পাতঞ্জল দর্শন ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সুনির্দিষ্ট কোনো তর্কপ্রণালী অনুসরণ করে নি। ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ এই মনোভাব নিয়েই যোগদর্শনে ঈশ্বরের কথা আলোচিত হয়েছে। তাই পাতঞ্জল যোগদর্শনের সেশ্বরত্ব নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলছি না। দেখা যায় ঈশ্বরকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েও সাধারণের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টতর করে তোলার জন্যই পাতঞ্জল দর্শনে বিভিন্ন ঈশ্বর-লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ঈশ্বর কী তা-ই বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নন বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু

অনুমানের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে মাত্র। অবিদ্যা ইত্যাদি পঞ্চক্লেশ, কর্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম, বিপাক অর্থাৎ কর্মফল, আশয় অর্থাৎ ফলভোগের অনুকূল চিত্তস্থিত সংস্কার এ সবের সঙ্গে কোনো কালেই যাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই সেই অপরামৃষ্ট অর্থাৎ সম্বন্ধহীন পুরুষবিশেষকেই ঈশ্বর বলা হয়েছে[১১৪]। তারপরই অন্য একটি সূত্রে বলা হয়েছে, সর্বজ্ঞত্বের যা বীজ অর্থাৎ মূলকারণ সেই নিরতিশয় অর্থাৎ চরম ও পরম জ্ঞান ঈশ্বরে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।[১১৫] ঈশ্বরের লক্ষণ-বর্ণনাত্মক এই উক্তিনিচয় যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ নিশ্চয়ই নয়।

আসলে পাতঞ্জলদর্শনে যোগই মুখ্য লক্ষ্য। সুতরাং যোগসিদ্ধির অনুকূল উপায় হিসাবেই বৈকল্পিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।[১১৬] এক কথায় ঈশ্বরের প্রতি সর্বতোভাবে চিত্ত সমর্পণ করলে ঈশ্বরানুগ্রহে যোগসিদ্ধি হতে পারে এই অবিচল প্রত্যয়ের কথাই এখানে ঘোষিত হয়েছে। আবার এই সূত্র থেকে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বোঝা যায় যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যথোক্ত যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যোগসিদ্ধি সম্ভব। তারই জন্য ঈশ্বর প্রণিধানকে যোগসিদ্ধির বিকল্প উপায় হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ; তাঁর প্রতিকূলে আশঙ্কার অবতারণা করে অনুকূল যুক্তির সাহায্যে সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে খণ্ডন করা হয় নি অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধি সংক্রান্ত বিচার বিতর্ককে কার্যতঃ পরিহারই করা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, যোগ একটি অসাম্প্রদায়িক বিষয়। সেশ্বর বা নিরীশ্বর সমস্ত মতানুসারীদের কাছেই যোগ আদরণীয় ও স্বীকৃত। সুতরাং এই সর্বসম্মত পথের বর্ণনা কালেই পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। এতে করে সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরানুসারী একথা আদৌ প্রমাণিত হয় না।

১১৪। ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ। পাতঞ্জলদর্শন ; সমাধিপাদ, ১।১২৪ সূত্র।

১১৫। তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্। ঐ ; ঐ ; ১।২৩ সূত্র।

১১৬। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ধা। ঐ ;ঐ ; ১।২৩ সূত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বর ও সর্বজ্ঞ-খণ্ডন

মীমাংসা দর্শনের মতে বেদ অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য; সুতরাং শব্দময় বেদও নিত্য। এই জন্যই মীমাংসক মতে বেদ অপৌরুষেয়। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বেদবক্তারূপে নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বীকারের কোনো প্রয়োজন হয় না। বেদ নিত্য বলেই তা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ সুতরাং বৈদিক পদ্ধতি অনুযায়ী বিচারের ফলে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'বেদের রচয়িতা নিত্যসর্বজ্ঞ' কোনো প্রমাণের দ্বারাই তা সিদ্ধ হয় না; অতএব নিত্যসর্বজ্ঞ প্রমাণ-সিদ্ধ না হলে জগৎ-কর্তা রূপে ঈশ্বরও সিদ্ধ হন না।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রধানতঃ শব্দ-নিত্যবাদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসা দর্শনের সূত্রকার আচার্য জৈমিনি শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন[১১৭]। শব্দ-নিত্যতাবাদের পক্ষে প্রধান যুক্তি হল, কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত থেকে উৎপন্ন হয় বলে শব্দ অনিত্য; কিন্তু অভিঘাতের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে শব্দ ধ্বনিত হয় তাকে উৎপত্তি না বলে, অভিব্যক্তি বলার পথে কোনো বাধা নেই। সুতরাং কণ্ঠ তালু, প্রভৃতির অভিঘাত ও তার মূলীভূত প্রযত্ন এই উভয়কেই উৎপত্তির কারণ না বলে অভিব্যক্তির কারণও বলা যেতে পারে। এতে করে এ কথাই সিদ্ধ হয় যে শব্দ অনিত্য, কেননা তা পুরুষ প্রযত্ন-জন্য[১১৮] এই অনুমান শব্দের অনিত্যতা স্থাপনে সমর্থযোগ্য নয় কারণ এই হেতুটি উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি উভয় পক্ষেই তুল্যভাবে প্রয়োজক হতে পারে। অভিব্যক্তির অর্থ পূর্বে অবস্থিত অথচ অনভিব্যক্ত বস্তুর প্রকাশের উপযোগী অবস্থা সম্পাদন। আবরণে আবৃত থাকলে সূর্যালোকেও বস্তুর উপলব্ধি সম্ভব হয় না। ঐ আবরণ অপসারিত হলেই বস্তুর উপলব্ধি হয়। আবরণ অপসারণের জন্য পুরুষ-প্রযত্ন অবশ্যক; সুতরাং বস্তুর অভিব্যক্তি পুরুষ-প্রযত্ন-জন্যই হয়ে থাকে। এতএব এক্ষেত্রে বস্তুর অভিব্যক্তিকে উৎপত্তি বলা যায় না বলেই

১১৭। মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১২ সূত্র থেকে ২৩ পর্যন্ত সূত্রাবলীতে শব্দের নিত্যত্ব আলোচিত হয়েছে।

১১৮। শব্দঃ অনিত্যঃ পুরুষপ্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ।

'প্রযত্নজন্যত্ব' হেতুটি উৎপত্তির ব্যভিচারী হওয়ায় 'অনিত্যত্ব' সাধনের হেতু বলা যায় না। শব্দকে অনিত্য বলতে হলে পুরুষ প্রযত্নের ফলে শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়, কারণ যা পূর্বে ছিল না তার আবির্ভাবকেই উৎপত্তি বলা চলে। শব্দ উৎপন্ন হলে তা অবশ্যই 'অনিত্য' হবে, কিন্তু মীমাংসা দর্শনের অন্যতম মূল সিদ্ধান্ত হল—শব্দ উৎপন্ন হয় না, তা অভিব্যক্ত হয় মাত্র।

প্রশ্ন হতে পারে, শব্দ উচ্চারিত হওয়ার পর তা বিনষ্ট হয়ে যায় এতো অনুভব—সিদ্ধ। শব্দ যদি নিত্য হত তা হলে অভিব্যক্তির পরও শব্দ থাকত অর্থাৎ উচ্চারণের বহুক্ষণ পরে উচ্চারিত শব্দটি শোনা যেত, কিন্তু উচ্চারণের কিছুক্ষণ পরেই শব্দ শোনা যায় না, শব্দ বিনষ্ট হয়ে যায় তাই শব্দকে নিত্য বলা যায় কেমন করে? তাছাড়া শব্দ একটি ভাব বস্তু ; তার বিনাশ আছে এতএব শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকার করতেই হয় ; যে ভাবপদার্থের বিনাশ আছে তার উৎপত্তিও থাকবে, যার উৎপত্তি ও বিনাশ রয়েছে তা অবশ্যই অনিত্য বলে গণ্য। অতএব শব্দ 'অনিত্য'।

মীমাংসকগণ তাদের দর্শন বিচারের শুরুতেই কেন এত গুরুত্ব সহকারে শব্দের নিত্যত্ব আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন তা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু শব্দ-নিত্যত্ব প্রমাণ করা মীমাংসা দর্শনের অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বেদের সত্যত্ব প্রশ্নাতীত হবে বলে তারা মনে করেন এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর অহেতুক হয়ে দাঁড়ান। একদিকে বেদের প্রতি অচলা আস্থা এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা খণ্ডনের প্রতি প্রবল আগ্রহ মীমাংসা দর্শনের এই আপাত-বিরুদ্ধ অবস্থানের উপলব্ধির দিক থেকেও প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

শব্দের অনিত্যতা নির্দেশক উল্লিখিত যুক্তির উত্তরে মীমাংসা দার্শনিকগণ বলেন, শব্দ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তা গ্রাহ্য। সুতরাং বক্তার মুখ থেকে যখন শব্দের উচ্চারণ হয় তখন তা শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে ক্ষণকাল থেকেই তিরোহিত হয়। এই শ্রুত শব্দ তিরোহিত হল বলেই আপাত-প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শব্দ আসলে কিছুক্ষণের জন্য অভিব্যক্ত হয়ে পুনরায় আবরকের দ্বারা আবৃত হয় মাত্র—এই হচ্ছে মীমাংসা-সিদ্ধান্ত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কোনো বস্তু যে

কারণে অভিব্যক্ত হয় সেই কারণের তিরোধান ঘটলে বস্তুর স্বরূপটি পুনরায় অনভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে তৃণাদি পদার্থ অভিব্যক্ত হয় কিন্তু বিদ্যুতালোক অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও অদৃশ্য হয়। বায়ুর সঙ্গে কণ্ঠ, তালু ইত্যাদির সংযোগ ও বিভাগ-জন্য যে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তা-ই শব্দের অভিব্যক্তির কারণ। এই ধ্বনিই বর্ণময় শব্দকে অভিব্যক্ত করে; সুতরাং ধ্বনি বিনষ্ট হলে বর্ণময় শব্দের অভিব্যক্তি থাকে না।[১১৯] লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শ্রবণেন্দ্রিয় স্বস্থানে থেকেই শব্দকে গ্রহণ করে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মতো বহির্গত হয়ে বিষয়কে গ্রহণ করার শক্তি তার নেই; সুতরাং ধ্বনির দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দ-অভিব্যক্ত না হলে তার গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই কণ্ঠতালু প্রভৃতির সঙ্গে বায়বীয় অভিঘাতের ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তা-ই শব্দ-গ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে উপনীত হয়ে বর্ণময় শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়। অভিঘাত-জনিত ধ্বনির পার্থক্য অনুসারে অভিব্যক্ত বর্ণেরও পার্থক্য হয়। সুতরাং শব্দের অভিব্যক্তিবাদের পক্ষেও উচ্চারণের ক্ষণকাল পরে শব্দের নিত্যত্ব সত্ত্বেও **অনুপলব্ধি** সম্ভব। তাই শব্দের উৎপত্তি বা বিনাশ যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায় শব্দকে নিত্যই বলতে হয়।[১২০]

শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হলে শব্দময় বেদকেও নিত্য বলা যায়। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপনের আরো একটি যুক্তি হচ্ছে, শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থের বোধক। যে কোনো শব্দই যে কোনো অর্থকে বোঝাতে পারে না। যে অর্থের সঙ্গে যে শব্দের সম্বন্ধ রয়েছে সেই শব্দ সেই অর্থের বাচক এবং সেই শব্দ-সূচিত অর্থ ঐ শব্দের বাচ্য হয়। শব্দ ও অর্থের মধ্যবর্তী বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নিত্য বা স্বাভাবিক। অর্থাৎ একক কোনো পুরুষ 'এই শব্দ এই অর্থের বাচক' অথবা 'এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য' তা নির্ধারণ করেন না। অসংখ্য শব্দের সঙ্গে সংখ্যাতীত

১১৯। ধ্বনি ও বর্ণময় শব্দ এক নয়—এই হচ্ছে মীমাংসকদের বক্তব্য। শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থকেই ধ্বনি বলা হয়, তা বর্ণময় নয়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত-জন্য অকারাদি ক্রমঃঅভিব্যক্ত শব্দই বর্ণময় শব্দ। সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও ধ্বনি-ব্যতীত তার অভিব্যক্তি ঘটেনা এই হচ্ছে মীমাংসকদের প্রতিপাদ্য।

১২০। বর্ণময় শব্দের নিত্যতা স্থাপনের দীর্ঘ জটিল বিচার এক্ষেত্রে অনাবশ্যক বোধ করে এই আলোচনাকে দীর্ঘতর করছি না। তবে শব্দ নিত্যত্ব প্রমাণের জন্য মীমাংসকদের মৌল আগ্রহের প্রাসঙ্গিকতার কথা আমরা এরমাঝেই আলোচনা করেছি।

অর্থের সম্বন্ধ নির্ধারণ করতে হলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে প্রচলনযোগ্য যাবতীয় শব্দ ও অর্থের জ্ঞান আবশ্যক। বলা বাহুল্য, কোনো পুরুষ বিশেষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। অথচ প্রতিটি শব্দের সঙ্গে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এক একটি অর্থের সম্বন্ধ রয়েছে, সুতরাং শব্দ ও অর্থের এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক বা অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করতেই হয়।[১২১]

এভাবে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শব্দময় বেদের সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধও নিত্য বলে স্বীকার করতে হয়। এই হিসাবেও বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলা কর্তব্য।

বেদের পৌরুষেয়ত্ববাদী নৈয়ায়িক প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন পদসমষ্টিরূপ বাক্য থাকলেই অর্থবোধ হয় না; কারণ পদ-পদার্থ সম্বন্ধজ্ঞান যার নেই বাক্য শ্রবণ করলে তার প্রথমে অর্থবোধ হয় না। কিন্তু তারপর অনুসন্ধানের দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞান হলেই অর্থবোধ জন্মে। সুতরাং বোঝা যায় অর্থবোধের ক্ষেত্রে পদ-পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান অপরিহার্য ও আবশ্যক। লৌকিক বাক্যার্থ বোধের ক্ষেত্রে পদ-পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান সংকেতমূলক হয়ে থাকে। সংকেত একটি বিশেষ ইচ্ছার প্রকাশমাত্র—'এই পদ থেকে এই অর্থ বুঝতে হবে' অথবা 'এই পদ এই অর্থকে বোঝাক' এ ধরণের ইচ্ছাকেই সংকেত বলা হয়।[১২২] ইচ্ছা পুরুষ-ভিন্ন সম্ভব নয়। ত্রিকালের যাবতীয় বস্তু এবং সমগ্র পদ জানা না থাকলে সেই সমস্ত বস্তুর সঙ্গে পদের সম্বন্ধ নির্ধারণ করার ইচ্ছা সম্ভব হয় না সুতরাং এইরূপ ইচ্ছাশালী যে হবে তাঁকে নিত্যসর্বজ্ঞ বলতেই হয়। সুতরাং বেদ পদ-পদার্থের সম্বন্ধবোধক বাক্য বলেই তা পৌরুষেয় হবে; এবং মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও অন্যান্য কাব্যাদি তার উদাহরণ। সুতরাং এখানে অনুমানটি হবে নিম্নরূপ ঃ বেদ পৌরুষেয় (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তা বাক্যময় (হেতু), যেমন, মহাভারত, পুরাণ, রঘুবংশ প্রভৃতি (দৃষ্টান্ত)। (বেদঃ পৌরুষেয়ঃ বাক্যত্বাৎ মহাভারতাদিবৎ।) এভাবে বেদ-প্রণেতা নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর সিদ্ধ হলে

১২১। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ। (**মীমাংসাদর্শনম্**–১।১।৫)

১২২। 'ইদংপদমিমমর্থং বোধয়তু' ইতি বা ইচ্ছা সংকেতরূপা বৃত্তিঃ। (**শক্তিবাদ**; সামান্যকাণ্ড)।

তাঁকে জগৎকর্তারূপে নির্ধারিণ করা সম্ভব। সুতরাং বেদ-প্রামাণ্যবাদী মীমাংসক সম্প্রদায়ের কাছে পূর্বোক্ত যুক্তিতে বেদের প্রামাণ্য রক্ষার জন্যই ঈশ্বর স্বীকৃত হবেন—এই হচ্ছে পূর্বপক্ষ।

তার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন বাক্যার্থবোধ অহেতুক নয়; পদ পদার্থ সম্বন্ধজ্ঞান বাক্যার্থবোধের নিমিত্তকারণ। এই সম্বন্ধ কোনো পুরুষের দ্বারা নির্ণীত কিনা তা-ই হচ্ছে প্রশ্ন। নৈয়ায়িকগণ ইচ্ছা বা সংকেতকেই এই সম্বন্ধ রূপে নির্ধারিণ করেছেন; এখানে প্রশ্ন হচ্ছে,—বাক্য বাক্যার্থের বাচক, না পদসমষ্টি বাক্যার্থের বাচক। যদিও পদসমষ্টির মিলিত রূপকেই বাক্য বলা হয়, বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অতিরিক্ত সমষ্টি বলে অন্য কিছু নেই। সুতরাং প্রত্যেকটি পদের অর্থজ্ঞান হলেই বাক্যার্থ বোধ হবে এটাই স্বীকার করতে হয়। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে গৌরব, অদৃষ্টকল্পনা ও দৃষ্টিহানি এই ত্রিবিধ দোষ ঘটে। কারণ পদ সমষ্টি পদার্থের বোধ জাগাবে, আবার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপাদন করবে—এতে পদের দু'ধরনের ব্যাপার বা কার্যকারিতা স্বীকার করতে হয়; প্রথমতঃ পদসমষ্টি পদার্থের বোধ জন্মাবে বলে একবার পদের ব্যাপার স্বীকার করতে হবে, আবার ঐ পদসমষ্টি বাক্যার্থের বোধ জন্মাবে এখানেও আরেকবার পদের ব্যাপারে স্বীকার করতে হবে—এই হচ্ছে **গৌরব দোষ**। কারণ দ্বিতীয়বার পদসষ্টির বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাবার ব্যাপার অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে অদৃষ্ট-কল্পনাও করতে হয়, কেননা প্রতিটি পদ থেকে পদার্থের বোধ দৃষ্ট বা অনুভূত হয়; কিন্তু পদসমষ্টির মিলিতভাবের মধ্যে বাক্যার্থবোধ দৃষ্ট নয় বলে এরূপ কল্পনা **অদৃষ্ট-কল্পনা** হবে। তার ফলে আবার দৃষ্টিহানি দোষও ঘটে; কারণ পদার্থ থেকেই বাক্যার্থের প্রতীতি দৃষ্ট অর্থাৎ যুক্তি ও অনুভব-সিদ্ধ; সুতরাং পদসমষ্টির বাক্যার্থবোধ স্বীকার করলে **দৃষ্টিহানি** দোষ হবে। তাই, 'প্রত্যেকটি পদের অর্থজ্ঞান থেকেই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে'— পৃথকভাবে পদসমষ্টি বাক্যার্থবোধের জনক নয়। এর স্বপক্ষে যুক্তিও রয়েছে; পদের অর্থজ্ঞান থাকলেই বাক্যার্থবোধ জন্মে; পক্ষান্তরে পদার্থজ্ঞান না থাকলে বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে না—একথা সর্ববাদী সম্মত। সুতরাং পদশ্রবণের পর পদার্থজ্ঞান এবং পদার্থসমূহের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা বাক্যার্থবোধ হয়—এই হচ্ছে নিয়ম। বিশেষতঃ দীর্ঘ বা অতিদীর্ঘ বাক্যের ক্ষেত্রে মানসিক দৌর্বল্যবশতঃ প্রথমোক্ত পদ বিস্মৃত হলেও পদার্থজ্ঞান হতে বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে। পদার্থজ্ঞানের স্মরণ না হলে

বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে না। অতএব পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থের বোধক; পদসমষ্টিজ্ঞান পৃথকভাবে বাক্যার্থের বোধক নয়।

কুমারিল ভট্ট এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছেন, স্থল বিশেষে বাক্যশ্রবণ ব্যতীতও বাক্যার্থবোধ জন্মাতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দূর হতে শ্বেত বর্ণের একটি জীব দেখা গেল; কিন্তু তা গরু না ঘোড়া তা স্পষ্ট বোঝা গেল না; এখানে প্রথমে শ্বেত পদার্থের জ্ঞান হল; তারপর, হ্রেষাধ্বনি শুনে ঐ জীবটি যে ঘোড়া তা অনুমিত হল। সুতরাং এখানে ঘোড়া সম্পর্কে জ্ঞান হল, তারপর ভালোভাবে দেখে তা অন্য প্রাণী নয় এটা উপলব্ধি করে এবং ঘোড়ার ক্ষুর-নিক্ষেপ জনিত শব্দ শুনে ধাবমান ঐ জন্তুটি যে অশ্ব তা বোঝা গেল। এখানে পরপর শ্বেতবর্ণ, অশ্ব ও ধাবমানতা এই পদার্থের উপস্থিতি থেকে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা বোঝা গেল 'শ্বেত অশ্ব দৌড়াচ্ছে'। এটিকে নিশ্চয়ই বাক্যার্থজ্ঞান বলতে হবে কারণ 'শ্বেত অশ্ব দৌড়াচ্ছে' বাক্য শুনলে যে অর্থজ্ঞান হত এখানে সেই অর্থজ্ঞানই হচ্ছে। অতএব বোঝা যায় যে বাক্য বা পদ বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ নয়; কিন্তু পদার্থবোধকেই বাক্যার্থবোধের কারণ বলতে হয়।[১২৩] এভাবে পদ বা বাক্যকে বাক্যার্থবোধের কারণ না বলে পদার্থকেই বাচক বলতে হয়।

এই মতানুসারে বিভক্তিযুক্ত যতগুলো পদ শোনা যায় প্রত্যেকটি পদ হতে ততগুলো অর্থবোধ জন্মে। তারপর অন্য একটি জ্ঞানের দ্বারা সেই পদার্থগুলোর পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রভৃতি বোঝা যায়। কারণ পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থসমূহ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত না হলে তাদের অর্থবোধ হয় না, সুতরাং তার মধ্যে একটি বিশেষ্য এবং অপরগুলো তার বিশেষণরূপে প্রতীত হয়। এভাবে পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব না হলে বাক্যার্থবোধ জন্মে না; সুতরাং এরকম বাক্যার্থবোধের জন্য পদার্থজ্ঞান আবশ্যক; এতএব কোনো স্থলেই বাক্যার্থবোধের জন্য একজন বাক্যোচ্চারক বক্তার প্রয়োজন নেই। যখন কেউ বোধগম্য কিছু লিখলেন বা ঐরূপ কোনো বাক্য

১২৩। পশ্যতঃ শ্বৈতিমারূপং হ্রেষা-শব্দং চ শৃন্বতঃ।
ক্ষুরনিক্ষেপশব্দং চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ।
দৃষ্টা বাক্যবিনির্মুক্তা ন পদার্থৈর্বিনা ক্বচিৎ ॥
(কুমারিল ঃ শ্লোকবার্তিক)

উচ্চারণ করলেন তখন ঐ বাক্যগুলো প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে একমাত্র তখনই যদি একথা নিশ্চিত হয় যে সেই লেখক বা বক্তা সকল ভ্রম-প্রমাদ দোষ-শূন্য ; কিন্তু পদ বা বাক্যকে অর্থবোধক না বলে পদার্থকেই বাক্যার্থবোধক বলায় রচয়িতা পুরুষ বা বক্তার প্রামাণ্য অপেক্ষণীয় নয়। পদার্থ যদি ঠিক হয় তা' হলেই বাক্যার্থবোধ যথার্থ হবে ; সুতরাং বেদবাক্যসমূহ কোনো কর্তার দ্বারা রচিত না হলেও ঐ বাক্য-জন্য পদার্থবোধ হওয়ার পথে বাধা না থাকায় বাক্যার্থ-বোধের কোনো অসুবিধে নেই। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে কোনো অসুবিধে হয় না। মীমাংসকদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই—বেদ অপৌরুষেয় (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ না হওয়ায় বেদের মূল প্রবক্তা স্মর্তব্য হওয়ার যোগ্য হলেও স্মৃত হচ্ছেন না (হেতু), আকাশ, আত্মা প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

এ ভাবে মীমাংসকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ করেছেন। আর বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণিত হওয়ায় বেদের প্রবক্তা হিসাবে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার করার কোনোই আবশ্যকতা নেই। ঈশ্বরস্বীকৃতির অন্যান্য যুক্তিও ভাট্টসম্প্রদায় খণ্ডন করেছেন। তার মধ্যে প্রধান যুক্তি হল এই যে ঈশ্বর-স্বীকার করার মতো কোনো প্রমাণ নেই। কুমারিল ''শ্লোকবার্তিকে'' যে যুক্তি দিয়েছেন তা সংক্ষেপে হল, 'সর্বজ্ঞ-সিদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই ; কারণ মানব সমাজের মধ্যে কাউকে সর্বজ্ঞ বলে জানা যায় না। যা কোথাও প্রত্যক্ষ হয় না তার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। সুতরাং 'সর্বজ্ঞ' প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হওয়ায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রত্যক্ষ সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর-বিরোধী।' প্রশ্ন হতে পারে অতীন্দ্রিয় বহু পদার্থ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হলেও অনুমান-সিদ্ধ ; যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁরাও অনুমানকে ঈশ্বর-সিদ্ধির প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ না হলেও অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হতে পারেন। তার উত্তরে কুমারিল বলেন, ঈশ্বর স্বীকারের উপযুক্ত অনুমান সম্ভব নয়। ঈশ্বরসাধক এমন কোনো নির্দোষ হেতু নেই, যার সাহায্যে ঈশ্বরানুমান সম্ভব। বরং ঈশ্বর-বাধক অনেক হেতুই রয়েছে। কুমারিল বলেন অতীতে কোনো সর্বজ্ঞ ছিলেন না এমন অনুমান করা যায়, বর্তমানেও কোনো সর্বজ্ঞ নেই, তাই 'কাল'-কে সর্বজ্ঞত্ব শূন্য রূপে নির্ধারণ করা সম্ভব। কুমারিলের যুক্তিটি নিম্নরূপঃ অতীতঃ সর্বজ্ঞ-শূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ। (**শ্লোক বার্তিক**, ন্যায় রত্নাকর ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় সূত্র, ১১৭ কারিকা।) এভাবে অতীতকালে

সর্বজ্ঞের অভাব থেকে কালত্ব-কে হেতু করে অনুমানের সাহায্যে ভবিষ্যত কালকেও সর্বজ্ঞ-শূন্য বলা চলে। অতএব অনুমানের দ্বারা কোনোকালেই সর্বজ্ঞের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা যে পদার্থ সিদ্ধ হয় না, আগম অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা তা সিদ্ধ হয় একথা মীমাংসকেরাও স্বীকার করেন। সুতরাং ঈশ্বর সিদ্ধি শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধ—এই প্রশ্নের উত্তরে কুমারিল বলেন—শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সর্বজ্ঞ সিদ্ধি হয় না; কারণ শাস্ত্র প্রবক্তা রূপে সর্বজ্ঞের বাক্য হিসাবেই শাস্ত্র-প্রামাণ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু আগম বা শাস্ত্রের দ্বারাই যদি সর্বজ্ঞ সিদ্ধি স্বীকার করতে হয় তা হলে অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ হবে। কারণ সর্বজ্ঞ-সিদ্ধ হলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হবে; অপরদিকে শাস্ত্র-প্রামাণ্য থেকেই শাস্ত্র-স্বীকৃত সর্বজ্ঞ সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ সর্বজ্ঞ-সিদ্ধি শাস্ত্র প্রামাণ্য সাপেক্ষ এবং শাস্ত্র-প্রামাণ্য সর্বজ্ঞ-সিদ্ধি-সাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ হবে। অপৌরুষেয় বেদ ঈশ্বর প্রণীত না হলেও শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যদি ঈশ্বর প্রমাণিত হয় তা হলে পূর্বে উল্লিখিত অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ হবে না। কিন্তু কুমারিল বলেন বেদে কোথায়ও নিত্য-সর্বজ্ঞসিদ্ধির অনুকূলে কিছু নেই। 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য (মুণ্ডক উপনিষৎ ১।১।৯) নিত্য সর্বজ্ঞের প্রতিপাদক এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ সর্বজ্ঞ বললে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানশালীকেই বোঝায়; এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয় ব্যতীত সম্ভব নয়।[১২৪] সুতরাং শরীরধারী না হলে কেউ কখনও সর্বজ্ঞ হতে পারে না। অথচ শরীর স্বীকার করলে ঈশ্বরকে নিত্য বলা যাবে না কারণ শরীরের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অতএব পূর্বোক্ত শ্রুতি নিত্য-সর্বজ্ঞের সাধক নয় তা প্রশংসাসূচক অর্থবাদী উক্তি মাত্র এই হচ্ছে মীমাংসকদের অভিমত। বেদকে নিত্য বলে স্বীকার করলেও বেদ-প্রবক্তা রূপে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। অপৌরুষেয় বেদ নিত্য—সর্বজ্ঞ বোধক নয়।

প্রশ্ন হতে পারে নিত্য-সর্বজ্ঞ সিদ্ধ না হলেও যথার্থ-দর্শী অ—প্রবঞ্চকের উক্তিকে নিশ্চয়ই প্রমাণ রূপে স্বীকার করা যায়। তাই ঋষি পতঞ্জলি কথিত 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ

১২৪। ''তস্মাৎ যদিন্দ্রিয়ং যস্য গ্রাহকত্বেন কল্পিতম্। তেনৈব সতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষং নান্যথা ভবেৎ।।'' (**শ্লোকবার্তিক**; প্রত্যক্ষসূত্র, শ্লোক-২৫৩)। এ থেকে কুমারিল যে অতীন্দ্রিয় ও যোগজ প্রত্যক্ষ অস্বীকার করেন তা বোঝা যায়।

ঈশ্বরঃ (পাতঞ্জলদর্শনম্, সমাধিপাদঃ, ১।১।২৪) ঈশ্বরসিদ্ধি সূচক বলে গণ্য হবে না কেন? অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে কুমারিল বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ঋষিবাক্যের সত্যতা থেকে যদি অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে হয় তা হলে এরূপ প্রামাণ্য স্বয়ংসিদ্ধ না হয়েও বক্তার প্রামাণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে; তাই এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। মীমাংসক মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্য অর্থাৎ যে সব কারণ থেকে সত্য-জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই সব কারণের ফলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়—এ ছাড়া জ্ঞানের প্রামাণ্য অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই আলোচ্য যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রে ঋষি পতঞ্জলির প্রামাণ্য সিদ্ধ হলেই তাঁর উক্তির প্রামাণ্য সিদ্ধ হবে, সুতরাং এক্ষেত্রে প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ নয় বলে মীমাংসক সম্প্রদায়ের কাছে এ যুক্তি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব কোনো যুক্তিতেই ঈশ্বর প্রমাণিত হন না।[১২৫]

প্রভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় ঈশ্বর অস্বীকৃতির পক্ষে বলেন, মীমাংসা শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ মীমাংসা মতে পুরুষার্থ সাধনের জন্য ধর্মই একমাত্র প্রয়োজন। ধর্ম বেদবাক্যগম্য। বেদোক্তর বিধি বাক্যের দ্বারা পুরুষের অভিলষিত বস্তুর কারণকেই ধর্মরূপে জানা যায় (মীমাংসাদর্শন; প্রথমপাদ; ২য় সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফলে যাতে করে মানুষের অভিলাষ পূর্ণ হয় তা-ই ধর্ম এবং এই ধর্ম অপৌরুষেয় বেদবাক্যগম্য।[১২৬]

বেদ অপৌরুষেও বলে ধর্ম সম্বন্ধে বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ; কারণ শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। মীমাংসকদের এই অভিমত আমরা আগেই আলোচনা করেছি তাই এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর স্বীকারের তাই কোনো প্রয়োজনই নেই। ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হলে তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে মানতে হয় এবং ধর্ম ঈশ্বরের পরিজ্ঞাত বিষয় হয়ে পড়ে। আবার ধর্ম যদি ঈশ্বরের পরিজ্ঞাত বিষয় না হয় তা হলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ

১২৫। সর্বজ্ঞঃ কল্পানাদৈঃ তু বেদে চাপৌরুষেয়তা। তুল্যতা কল্পিতা যেন তেনেদং সংপ্রধার্যতাম্।। সর্বজ্ঞোদৃশ্যতে তাবৎ নেদানীম্ অস্মাদাদিভিঃ। নিরাকরণবৎ শক্যা ন চাসীদিতি কল্পনা।।...তেনাপি পারতন্ত্র্যেণ বাধিতা স্যাৎ প্রমাণতা। প্রামাণ্যং চেৎ স্বয়ং তস্য কাহপেক্ষাহন্যেন্দ্রিয়াদিষু।। (**শ্লোকবার্তিক**; সূত্র-২; ১১-৬-১২২ কারিকা)।

১২৬। ‘‘চোদনা লক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ’’ মীমাংসা দর্শনম্ ১।১।২ সূত্র।

বলে স্বীকার করলে 'অপৌরুষেয় বেদবাক্যই ধর্ম বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ' এই মীমাংসক সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়ে পড়ে। সুতরাং অপৌরুষেয় বেদবাক্যের স্বতঃ-প্রামাণ্য স্বীকার করে মীমাংসক সম্প্রদায় যেভাবে পুরুষার্থ সাধনের পথনির্দেশ করেছেন তাতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর-স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজনই নেই এবং ধর্ম ঈশ্বরের পরিজ্ঞাত বিষয় হওয়া সম্ভব নয় বলে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হতে পারেন না। এতএব ধর্ম প্রভৃতি বেদবিধি দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয় সমূহ অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বরকে স্বীকার করলে তাঁকে অ-সর্বজ্ঞই বলতে হবে। আবার অ-সর্বজ্ঞ হলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে ধর্মাদি বিষয়ের জন্যই যে ঈশ্বর স্বীকার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অথচ কর্মফলদাতা হিসাবে এবং অচেতন পরমাণু ইত্যাদির মিলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগৎসৃষ্টির হেতু হিসাবেও ঈশ্বর স্বীকার করা আবশ্যক—এই হচ্ছে ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্ত। যাগ যজ্ঞাদি ফলদান করে—একথা মীমাংসকগণ মানেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভ হয় না। দীর্ঘকাল পরেও যজ্ঞের অভিলষিত ফললাভ হতে পারে অথচ যজ্ঞানুষ্ঠান একটি অচিরস্থায়ী ক্রিয়া। সম্পাদনের পর যজ্ঞ থাকে না ; সুতরাং যজ্ঞ কিভাবে স্বর্গাদিরূপ ফল দান করবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন একটি অদৃষ্ট শক্তি (ধর্ম) স্বীকৃত হয়েছে। যজ্ঞ না থাকলেও ঐ যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন শক্তিই যথাকালে ফলদান করে। মীমাংসকগণ এই পর্যন্ত স্বীকার করেন। তার উত্তরে নৈয়ায়িকগণের বক্তব্য হচ্ছে যজ্ঞ—জন্য এই শক্তি অচেতন পদার্থ ; কোনো চেতনের সম্পর্ক ছাড়া এ শক্তি নির্দিষ্ট ফলদান করতে পারে না ; অতএব কর্মফল-দাতা হিসাবে ঈশ্বর-স্বীকার করতেই হয়।

এই প্রসঙ্গেই ন্যায়-বৈশেষিকগণের দ্বিতীয় যুক্তি হল বিশ্বসৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আবশ্যক। অতিসূক্ষ্ম পরমাণু ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত আকার লাভে অসমর্থ। তাই এই দু'টি কারণেই মূলতঃ ঈশ্বর-স্বীকৃতি প্রয়োজন।

মীমাংসকগণ বলেন, চেতন পুরুষ যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফললাভ হয়। অধ্যয়নান্তে অধীত বিষয়ের সংস্কার দীর্ঘকাল পরেও কার্যকর থাকে ; এটা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং অধীত বিষয়ের সংস্কারের ফলদান যেমন ঈশ্বর-সাপেক্ষ নয়, তেমনই অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি থেকে সমুৎপন্ন সংস্কারও ফলদানে সমর্থ। অতএব তারজন্য

ঈশ্বর স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

মীমাংসা মতে, ঈশ্বরকে সমস্ত জন্য-পদার্থের কর্তা বলা হয়; সাক্ষাৎভাবে সর্বত্র ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দৃষ্ট না হলেও, পরম্পরা অনুসারে ঈশ্বর কর্তা বলে স্বীকৃত হয়ে থাকেন। স্পষ্টতঃ ঈশ্বরকে প্রয়োজক কর্তা বলে মানা হয়; তাহলে মানুষের সকল কর্মানুষ্ঠানই ঈশ্বরেচ্ছা—বশতঃ একথা অবশ্য স্বীকার্য; তাহলে জীবের পাপ-কর্মানুষ্ঠানও ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পাদিত একথা মানতে হয়। তাহলে কোথায় থাকে ঈশ্বরের নিরপেক্ষতা, পবিত্রতা? এতে করে ঈশ্বরের পূর্ণতাও বিঘ্নিত হয়। তাই ঈশ্বরকে সর্ব কর্মের প্রেরণাদাতা রূপে মান্য করা চলে না।[১২৭]

পরমাণুসমূহের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি-প্রণালী বাখ্যার ক্ষেত্রে ঈশ্বর অপ্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা কিভাবে দু'টি পরমাণুকে সংযুক্ত করবে তা-ই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য। ঈশ্বরেচ্ছা কেবল ঈশ্বরেই নিহিত, পরমাণুতে নয়। অথচ পরমাণু-সংযোগের জন্য স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া প্রয়োজন। এ স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া যদি পরমাণুতে নিত্যই বিদ্যমান থাকে তাহলে পরমাণু-সংযোগের জন্য ঈশ্বরেচ্ছার কোনো আবশ্যকতাই নেই। অন্যদিকে ঈশ্বরেচ্ছা ঈশ্বরে বিদ্যমান আর ক্রিয়া উৎপন্ন হচেছ পরমাণুতে সুতরাং এই দু'টি এক অধিকরণে নেই। তাই ঈশ্বরেচ্ছাকে পরমাণু সংযোগের কারণ বলা যায় না। শুধুমাত্র ইচ্ছাতেই কোনো ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না; তার জন্য চাই প্রযত্ন এবং প্রযত্ন অশরীরীর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ঈশ্বরকে শরীরী বললে তিনি অনিত্য হয়ে পড়বেন, তাই তাঁকে ঈশ্বর বলা চলে না।[১২৮]

অন্যভাবে বলা যায়,—ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য বা অনিত্য এই দুয়ের একটি না হয়ে পারে না। এই ইচ্ছা নিত্য হলে, বিশ্বজগতের বিনাশ কখনও সম্ভব নয়। ঈশ্বরেচ্ছা ঈশ্বরানুসারীদের মতে অনিত্য হতে পারে না। অথচ এ ইচ্ছা নিত্য হওয়ায় সংহার—সম্ভাবনা নেই বলে সৃষ্টির নিত্যতার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নিত্য সৃষ্টির ফলে অনন্ত কালে অনন্ত সৃষ্টি অব্যাহত ভাবে চলতেই থাকবে। মীমাংসক দার্শনিকদের মতে এটা প্রত্যক্ষ-বিরোধী, অবাস্তব; তাই অগ্রাহ্য।

১২৭। "দেশকালাবস্থাদিসহকারিসহিতাভ্যাং ধর্মাধর্মাভ্যামেব ফলম্, ন চেতনব্যাপারাপেক্ষম্।" (**প্রকরণপঞ্চিকা**; নবম প্রকরণ; পৃষ্ঠা—৩০৮; বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৬১)।

১২৮। "ন চ তস্য ইচ্ছামাত্রেণ প্রবৃত্তিঃ কিন্তু প্রযত্নবশাৎ" (সূত্রঃ পূর্ববৎ)।

সপ্তম অধ্যায়

অদ্বৈত-বেদান্ত মতে ঈশ্বর

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল বক্তব্য হল, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ কেবলাদ্বৈত বলে প্রসিদ্ধ শাঙ্কর বেদান্তে বস্তুর মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ দু'টি ভাবের অবস্থান অস্বীকৃত অর্থাৎ যা সৎ তা কখনও অসৎ হতে পারে না। এই মূলনীতি অনুসারে স্বপ্রকাশ, বিশুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই হচ্ছে অদ্বৈত বেদান্তের বহুবিধ শ্রুতি-সম্মত দার্শনিক অবস্থান।

অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্ম তাই অসীম, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব এবং স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ-রহিত স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ-চৈতন্য মাত্র। জগৎ ও জীবের নানাত্ব মিথ্যা ; অথচ ব্যবহারিক জীবনে এদের সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এখানে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হল, জগৎ ও জীবের নানাত্ব মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও তারা সত্য বলে কী করে প্রতিভাত হয়? এই প্রশ্নের সমাধান কল্পেই শংকরাচার্য অদ্বৈত বেদান্তে **মায়াবাদ, বিবর্তবাদ** ও **সত্তাত্রৈবিধ্য-বাদের** অবতারণা করেছেন।

শঙ্করের মতে সত্তা ত্রিবিধ ঃ প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন সর্প সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। সন্দেহ নেই, ভ্রমকালে সর্পের এই সত্তা প্রাতিভাসিক মাত্র কারণ জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত সর্পের আর সত্তা থাকে না। জগতের ব্যবহারিক সত্তা অনস্বীকার্য কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সত্তা থাকে না। ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান দ্বারা প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যাহত হয় আর ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জগতের ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয়। তাই ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা।

শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম ও ক্রমিক বিকাশ নয়। তাঁর মতে ব্রহ্ম যেহেতু নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও অপরিণামী তাই জগতের কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই। তারই জন্য শঙ্কর বিবর্তবাদের কথা বলেছেন। সৎ কারণ থেকে অসৎ কার্যের সৎরূপে প্রতীয়মানতাই বিবর্ত।[১২৯] সৎ রজ্জুর সর্পরূপে প্রতীয়মান হওয়াটাই

১২৯। 'অতাত্ত্বিকোহন্যথাভাবো বিবর্তঃ।' (**বেদান্ত পরিভাষা ঃ প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ**)।

বিবর্ত, তা রজ্জুর পরিণাম হতে পারে না। শাঙ্কর মতে ব্রহ্ম জগতের কারণ তাতে সন্দেহ নেই। তবে সৎ ব্রহ্ম মিথ্যা জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন বলেই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত।

আর এই বিবর্ত সম্ভব হয়েছে মায়া নামে অভিহিত এক ভ্রম-সংঘটনকারী শক্তির জন্য। নির্বিকার ব্রহ্ম এই শক্তিপ্রভাবেই জগৎরূপে প্রকাশিত হন। মায়ার শক্তি দ্বিবিধ ঃ মায়া তার আবরণ শক্তি দিয়ে ব্রহ্মকে আবৃত করে আর বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে জগৎ রচনা করে। মায়া এক অনির্বচনীয় শক্তি, তাকে সৎ বলা চলে না, কেননা ব্রহ্ম প্রকটিত হলে মায়া বা জগৎ কিছুই থাকে না; আবার তা অসৎও নয়, কেননা মায়ার সৃষ্টি এই জগৎ তো প্রত্যক্ষের বিষয়। মায়া অনাদি কেননা জগৎপ্রবাহ অনাদি, কিন্তু মায়া সান্ত; কারণ জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হলেই মায়া নষ্ট হয়ে যায়।

এই দার্শনিক অবস্থান থেকেই শ্রুতি-ভিত্তিক অদ্বৈত বেদান্তমতে শ্রুতি-বিহিত ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন।[১৩০] অবিদ্যাবশতঃ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মাভিমানী ও তত্ত্ব নির্ধারণে অসমর্থ জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি দেখা দেয় এবং জীবের কর্ম অনুসারে জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার বিহিত করার জন্য শংকরাচার্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এক সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্মের কথা বলেছেন। এই সগুণ পরিণামী ব্রহ্ম থেকেই জীব ও জগৎ আবির্ভূত হয়েছে। ঈশ্বরই জগতের মূল কারণ এবং ভূতভৌতিক জগতের নিয়ামক। জীবগণ যাতে তাদের কর্মানুযায়ী ফলভোগ করতে পারে তারই জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আবার পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান লাভ করে জীব মুক্ত হয়।[১৩১]

এই ঈশ্বরসিদ্ধির সপক্ষে বেদান্ত দর্শনে বিভিন্ন শ্রুতি-সম্মতি উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্রুতি-সম্মতি অনুসারেই শ্রুতি-প্রামাণ্যবাদী অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন। অদ্বৈত বেদান্তের ঈশ্বর-সিদ্ধির প্রণিধানযোগ্য বিষয় হ'ল, তাদের মতে শ্রুতি-ভিন্ন লৌকিক যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা

১৩০। অবিদ্যাবস্থায়াং কার্যকারণসংঘাতবিবেকদর্শিনঃ জীবস্যাবিদ্যাতিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাৎ আত্মনঃ কর্মাধ্যক্ষাৎ সর্বভূতাধিবাসাৎ সাক্ষিণঃ চেতয়িতুঃ ঈশ্বরাৎ তদনুজ্ঞয়া কর্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধিঃ। তদনুগ্রহহেতুকেন এব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতি। (বেদান্তদর্শন, শাংকরভাষ্য : ২।৩।৪১ ; অদ্বৈতাশ্রম, ১৯১৪, পৃঃ ৬৮০)

১৩১। 'পরাত্তু তচ্ছ্রুতে'। (বেদান্তদর্শন ২।৩।৪১ সূত্র)।

ঈশ্বর-সিদ্ধি সম্ভব নয়। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য নিরীশ্বরবাদী ও ঈশ্বর-কারণবাদী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভিমতগুলো ধারাবাহিকভাবে খণ্ডন করেছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে লৌকিক যুক্তি-সিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করা সম্ভব নয়।

ঈশ্বর-কারণবাদীরা বলেন, ঈশ্বর অন্য কারো ইচ্ছার অধীন না হয়ে নিজের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বলেই নানা সৃষ্টি করেন; ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নন, তিনি জগতের নিমিত্ত-কারণ মাত্র। ঘট নির্মাণের সময় কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুর সাহায্যে ঘটাদি নির্মাণ করেন, ঈশ্বরও তেমনি জড় প্রকৃতির সাহায্যে জগৎসৃষ্টি করেন এবং জীবের উচ্চ-অধমভাব তিনিই বিধান করেন। শঙ্করাচার্য বলেন, এই যুক্তি মেনে নিলে এতে করে ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বময়ত্বই ব্যাহত হয় এবং ঈশ্বরের পক্ষপাতদুষ্টতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এতে করে ঈশ্বরত্বেরই হানি হয় কেননা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সকল ঈশ্বরবাদীরই অভিপ্রেত; কিন্তু জীবেব উত্তম-অধমভাব রাগদ্বেষজনিত বলে ঈশ্বরের চিত্তমালিন্য দেখা দেয় তাতে সর্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধিরই হানি হয়। শ্রুতিতে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩২] কিন্তু রাগদ্বেষমুক্ত না হলে ঈশ্বরের জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ হতে পারে না।

অন্যদিকে জীবের ধর্ম ও অর্ধমকে অপেক্ষা করে ঈশ্বরের জীবসৃষ্টি করতে হলে তিনি একজন সাধারণ প্রযোজক কর্তা মাত্র হয়ে পড়েন। ফলে ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না এবং তাঁর অনীশ্বরত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীব নিজের কর্মানুসারেই যদি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ফলাদি ভোগ করে তাহলে ঈশ্বরকে জীবের যথার্থ কর্মফলদাতা বলা চলে না, কারণ অনুষ্ঠিত কর্ম নিজ-সামর্থ্য অনুযায়ীই যথাবিহিত ফল প্রদান করতে পারে। ঈশ্বর এতে করে খুব বেশী হলে নির্দিষ্ট ফলের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভোগাদৃষ্টের সংযোগস্থাপনকারী একজন প্রযোজক কর্তা হতে পারেন, কর্মফলদাতা হতে পারেন না।

পূর্বোক্ত যুক্তির সূত্র ধরে ঈশ্বর-কারণবাদীরা বলেন, ঈশ্বরই জীবের সমূহ কর্মফলের নিয়ন্ত্রক। ধর্ম ঈশ্বরের অনুগ্রহের এবং অর্ধম তার অসন্তুষ্টিরই হেতু হওয়ায় জীব সেভাবেই ঈশ্বরের কাছ থেকে

১৩২। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ (মুণ্ডক উপনিষদ ১।১।৯)।

যথাবিহিত ফললাভ করে। এক্ষেত্রে অদ্বৈত বৈদান্তিকগণের প্রশ্ন হল, জীব নিজে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, না, ঈশ্বর জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করান তা-ই হল আসল কথা। এ দুটি সম্ভাবনার কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে জীব কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে পারে তবে তাঁর সর্বকর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়; তাহলে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করার কোনো যুক্তি থাকে না; এতে তাঁর ঈশ্বরত্বই ক্ষুণ্ণ হয়। অন্যদিকে জীব যদি ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হয়েই কর্মানুষ্ঠান করে তবে জীবের সৎ ও অসৎ এই উভয়বিধ কর্মের প্রবৃত্তি ঈশ্বর প্রদান করেন তা মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর যাকে ভালো ফল প্রদান করতে ইচ্ছুক তাকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করেন এবং ঈশ্বর যার অমঙ্গল চান তাকে অসৎকর্মে প্রবৃত্ত করেন। স্পষ্টতঃ এতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা রক্ষিত হলেও ঈশ্বরের কল্যাণময়তা বিনষ্ট হয় এবং তাঁর পক্ষপাতিত্ব ও কুটিলতা দোষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা, সর্বনিয়ন্ত্রণ-সামর্থ্য ও পক্ষপাতশূন্যতা সিদ্ধ হয় না এবং কার্যতঃ তাঁর ঈশ্বরত্বই বিনষ্ট হয়। এ ধরনের আপত্তি নিবন্ধে এরমাঝে বহুভাবেই আলোচিত হয়েছে।

ঈশ্বর আগম বা শাস্ত্র প্রমাণ-সিদ্ধ, ঈশ্বরবাদীদের এই বক্তব্যের উত্তরে শংকরাচার্য বলেন, কোনো মনুষ্য-রচিত শাস্ত্রই ঈশ্বরের প্রামাণ্য স্থাপন করতে পারে না। এই শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরোপলব্ধি করে শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন কিনা এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই এখানে ওঠে। যদি ঈশ্বরোপলব্ধি না করেই এই শাস্ত্র রচিত হয়ে থাকে তবে তা ঈশ্বর প্রমাণের ক্ষেত্রে অনধিকারচর্চারই নামান্তর। আর যদি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেই শাস্ত্রকার এই শাস্ত্র রচনা করে থাকেন তবে কোন উপায়ে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি করেছেন তা বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতির সাহায্যে যদি তাঁর এ ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটে থাকে তবে সেই অন্যতর পদ্ধতিকেই ঈশ্বরের প্রমাণ বলে নির্দেশ করা উচিত; শাস্ত্রকে এক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রমাণ বলে দাবী করা চলে না। অনেকে বলেন, ঈশ্বরকে উপলব্ধির উপায় সাধারণ লৌকিক বস্তু নিরূপণের উপায় থেকে স্বতন্ত্র। যোগাভ্যাস ইত্যাদি থেকে যে সমাধি ঘটে তার মাধ্যমে ঈশ্বরোপলব্ধি করে শাস্ত্রকার শাস্ত্র রচনা করে থাকলে শাস্ত্রকারের ঐ সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা শাস্ত্ররূপে ঈশ্বরের প্রমাণ-রূপে গণ্য হতে পারে। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন, সাধনার দ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধি করে পরে শাস্ত্র রচনা করে থাকলে শাস্ত্রপ্রণেতাকে

এই সাধনার পদ্ধতি পূর্বেই অবগত হতে হয়েছে। সেই পদ্ধতি তিনি কিরূপে জেনেছিলেন? তারজন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞ আচার্যের প্রয়োজন হয়। এতে পরম্পরাগত প্রশ্ন এসে যায় বলে সহজেই অনবস্থা দোষ-সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাছাড়া যে ঈশ্বর-সিদ্ধির জন্য এমন কঠোর সাধনা তার আগেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়-সম্মতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঈশ্বরোপলব্ধির কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগেই ঈশ্বরসিদ্ধি সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হতে হয়। এখানে প্রশ্ন, শাস্ত্রকার তা কী করে প্রথমে জেনেছিলেন? তিনি অন্য কারো কাছ থেকে জেনে থাকলে এক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ অনিবার্য। সুতরাং যে কোনো মনুষ্য-রচিত শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব বিষয়ক প্রশ্নাদি আমাদের নিবন্ধাংশে অন্যান্য দার্শনিক অভিমত বিচারের সময় আলোচিত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বর-সিদ্ধি সূচক লৌকিক যুক্তি সমূহের কয়েকটি যেভাবে খণ্ডিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিপাদ্যের অনুকূল বলে আমরা এখানে তার উল্লেখ করেছি মাত্র।

ঈশ্বর লৌকিক প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায় অভ্রান্ত শ্রুতিই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-সিদ্ধির একমাত্র প্রমাণ; এই হল অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। 'যা লৌকিক যুক্তিতে অসিদ্ধ তা শ্রুতি-বিহিত বলেই প্রমাণিত হয় কিনা' এই আপত্তির উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন, অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বিষয় কোনো সময়ই লৌকিক যুক্তিতে সিদ্ধ হয় না। কারণ লৌকিক যুক্তিসিদ্ধির জন্য অপরিহার্য দৃষ্টান্ত অলৌকিক বিষয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তাই অলৌকিক বিষয়কে স্বীকার করতে হলে একমাত্র এমন শাস্ত্রকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে যার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। বৈদান্তিকগণের মতে শ্রুতিই হচ্ছে একমাত্র প্রামাণ্য যা দৃষ্টিবিরুদ্ধ হলেও যথার্থ বলে গৃহীত।[১৩৩]

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ব্রহ্মই সত্য। সুতরাং ঈশ্বর স্বীকার করতে হলে ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলতে হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ; অবশ্য এই

১৩৩। আগমাৎ ঈশ্বরসিদ্ধৌ ন দৃষ্টমনুস্মর্তব্যম্, ন হি স্বর্গাপূর্বদেবতাদিষু আগমাৎ অবগম্যমানেষু কিঞ্চিদস্তি দৃষ্টম্। নহি আগমঃ দৃষ্টসাধর্ম্যাৎ প্রবর্ততে। তেন শ্রুতসিদ্ধার্থমদৃষ্টানি দৃষ্টবিপরীতস্বভাবানি স্ববহূনি অপি কল্পমোনানি ন দোষগন্ধিতামাবহন্তি প্রমাণবত্ত্বাৎ। (বেদান্তদর্শন, ভামতী টীকা, ২।২।৩৭)।

উপাদান বিবর্ত উপাদান মাত্র। মূল বস্তুর প্রকৃত কোনো অবস্থান্তর না ঘটেও একটি পরিবর্তিত অবস্থা আপাত-প্রতীয়মান হলেই এই অবস্থাকে মূল বস্তুর বির্বত বলা হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে মূল বস্তু রজ্জুর প্রকৃত কোনো অবস্থান্তর না ঘটলেও ভ্রমবশতঃ রজ্জুটি সর্প বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং রজ্জু হচ্ছে সর্পের বিবর্ত আবার এই বিবর্ত সর্পের উপাদান রজ্জু না থাকলেও ঐ সর্প দেখা যেত না। অদ্বৈত বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের এরকম একটি বিবর্ত উপাদান মাত্র। মায়া প্রভাবেই নির্গুণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রূপে প্রতীয়মান হন। যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়, যাকে অবলম্বন করে জগতের স্থিতি এবং বিনাশ হলে জগৎ যাতে লীন হয় তা-ই ব্রহ্ম। এই হল ব্রহ্মের লক্ষণ।[১৩৪] সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ অথচ ব্রহ্ম-অতিরিক্ত অন্য কোনো পারমার্থিক বস্তু নেই; তাই নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করলে ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলতে হয়। তাই যাঁরা ঈশ্বরকে পারমার্থতঃ সত্য বলে মনে করেন তাঁদের অভিমত খণ্ডনের জন্যই অদ্বৈত বেদান্তে ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট সগুণব্রহ্ম তথা ঈশ্বর-সিদ্ধি করা হয়েছে। ব্রহ্ম-জ্ঞান উদিত হলে মায়া দূরীভূত হয় এবং ব্যবহারিক জগৎ ও ঈশ্বরের কোনো সত্তা থাকে না। এই দার্শনিক মনোভঙ্গী থেকেই শঙ্করাচার্য জগতের নিমিত্ত-কারণ হিসেবে ঈশ্বরানুমান খণ্ডন করেছেন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ এই মত অবৈদিক— এই হ'ল শংকরের প্রতিপাদ্য। বেদান্ত সূত্রকার সাধারণভাবে ঈশ্বর-কারণবাদ খণ্ডন করেন নি, তিনি শুধু ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ এ মতবাদই খণ্ডন করেছেন। কারণ অন্যান্য বেদান্তসূত্রে ঈশ্বর-কারণত্ব স্বীকৃত হয়েছে।[১৩৫] ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এই সিদ্ধান্তই এই সূত্রে সমর্থিত হয়। ব্রহ্মকে কেবল উপাদান কারণ বা কেবল নিমিত্ত কারণ বলা সূত্র-সম্মত হবে না এই হচ্ছে শঙ্করাচার্যের বক্তব্য। ১।৪।২৪ বেদান্তসূত্রে 'সৃষ্টি বিষয়ক সংকল্পের কথা আছে', তাকেই অভিধ্যা বলা হয়েছে 'অভিধ্যোপদেশাচ্চ'। শঙ্করের মতে এই সূত্র থেকে ব্রহ্মের অভিন্ন-উপাদানতা সিদ্ধ হয় এবং উপাদান কারণ হিসাবে ঈশ্বর স্বীকার

১৩৪। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রত্যয়ান্তাভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ভৃগুবল্লী, ৩।১),

১৩৫। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপবোধাৎ' (বেদান্তদর্শন ১।৪।২৩) 'অভিধ্যোপদেশাচ্চ' (ঐ; ১।৪।২৪)

করাই বেদান্তের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলে মনে করেন তাঁদের অভিমত বেদ-সম্মত নয় বলে শঙ্কর মনে করেন। ঈশ্বর জগতের কর্তা হলে নিমিত্তকারণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ থাকবেই। কিন্তু এই সম্বন্ধ যুক্তিসিদ্ধ নয়। ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপ্ত না হন তবে তাঁর জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নয়। সর্বব্যাপী না হলে ঈশ্বরকে 'পরিচ্ছিন্ন' বা সীমাবদ্ধ বলে গণ্য করতে হয়; আর পরিচ্ছিন্ন হলে ঈশ্বর অনিত্য হয়ে পড়েন। তাই নিত্য-ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী হতেই হবে। আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলে জগতের মূল উপাদানের সঙ্গে ঈশ্বরের বিচ্ছিন্নতা বা অসম্বন্ধ কখনও ঘটতে পারে না; ঈশ্বর তাই সর্বদাই মূল উপাদানের থেকে বিচ্ছিন্ন নন বলে সৃষ্টিও চিরন্তন হতে বাধ্য।[১৩৬]

এই যুক্তিটির সূত্র ধরেই শঙ্করাচার্য একটি কৌতুকাবহ যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা খণ্ডন করেছেন। এই যুক্তিটি হল, ঈশ্বর ও জগতের উপাদান কারণ দুই-ই ভিন্ন এবং দুই-ই অনন্ত; অর্থাৎ ঈশ্বর ও উপাদান কারণের আদিও নেই, অন্তও নেই। যাঁরা এই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাস্য ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ তথা প্রকৃতি বা পরমাণুসমুহের এবং নিজের সংখ্যা ও পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানেন কিনা। যদি জানেন তবে ঈশ্বর ও উপাদান উভয়েরই অনিত্যতা অনিবার্য; কেননা যা সীমিত পরিমাণ-বিশিষ্ট তা-ই জ্ঞাত হতে পারে এবং সীমিত পরমাণযুক্ত হলে অনিত্যতা অপরিহার্য। আবার ঈশ্বর ও উপাদান অনন্ত হলে তা ঈশ্বরের পক্ষেও জানা সম্ভব নয় কারণ যা অনন্ত তা জ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না। তাই লৌকিক যুক্তিতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। অনুরূপ যুক্তিতেই দু'টি বস্তুতে ভেদ থাকলে তা সীমিত পরিমাণ-বিশিষ্ট হতে বাধ্য। তাই তা পরম কারণ হতে পারে না। তাই ঈশ্বর ও উপাদান পৃথক হলে তা নিত্য হতে পারে না।[১৩৭]

বেদান্ত দর্শনের সকল সম্প্রদায়ের মতবাদে শ্রুতি ও যুক্তি এ দুয়ের ওপর নির্ভর করেই ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের সকল মতবাদেই ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়

১৩৬। 'অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ' (বেদান্তদর্শন ২।২।৩৯)

১৩৭। যদ্ধি লোকে ইয়ত্তা পরিচ্ছিনং বস্তু পটাদি, তদন্তবৎদৃষ্টম্। তথা পুরুষেশ্বরত্রয়মপি ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্নত্বাদন্তবৎ স্যাৎ। (বেদান্তদর্শন; শংকরভাষ্য; ২।২।৪১)।

কারণ হিসাবেই স্বীকৃত হয়েছেন। ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ রূপে স্বীকার করার অর্থ মুখ্যতঃ শ্রুতি-নির্ভরতা এবং তারই জন্য বেদান্ত দর্শনের সকল মতবাদেই ঈশ্বর নিত্য, শুদ্ধ ও চেতন এ বিষয় কোনো মতদ্বৈধ নেই। ঈশ্বরকে উপাদান কারণ হিসাবে স্বীকার করতে হলে কেবল মাত্র লৌকিক যুক্তির ওপর নির্ভর করে তা করা সম্ভব নয়। উপাদান কারণ ও ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয় হতে পারে না। মৃত্তিকা-ঘট, সুবর্ণ-কুণ্ডল প্রভৃতি লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কার্যের সঙ্গে উপাদান-কারণ সমজাতীয় না হলে চলে না। সুতরাং জগৎকে অচেতন, অনিত্যরূপে প্রত্যক্ষ করার ফলে ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিজাতীয় একথা অবশ্য-স্বীকার্য। তাই লোকসিদ্ধ যুক্তিতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হতে পারেন না। প্রধানতঃ এই যুক্তির ওপর নির্ভর করেই নৈয়ায়িক প্রমুখ দার্শনিক সম্প্রদায় ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ রূপে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত্ব যুক্তিসিদ্ধ নয় তা এর মাঝেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং অদ্বৈত বেদান্তের অভিমতও তা-ই।

বেদান্ত দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই শ্রুতি-বিহিত ঈশ্বর স্বীকার করেছেন। কিন্তু শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত না হলে কেবলমাত্র দার্শনিক যুক্তিতে ঈশ্বর-সিদ্ধি সম্ভব নয়। শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হলেই শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বেদানুসারী দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদান্ত ও পূর্বমীমাংসা ব্যতীত অন্য কোনো দর্শনে শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত নয়। ন্যায়-বৈশেষিক ও পাতঞ্জল যোগ দর্শনে বেদের পৌরষেয়ত্বই স্বীকৃত কারণ তাঁদের মতে আপ্তবাক্য না হলে শব্দ-প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। এই দার্শনিক অবস্থান থেকে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নানাবিধ অনুমান ও যুক্তি-বিচার উপস্থিত করেছেন কিন্তু নানা দোষ ও অনুপপত্তির সম্ভাবনা রয়েছে বলে তা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য নয়। নিছক যুক্তি বিচারের সাহায্যে ঈশ্বর-সিদ্ধি যে সম্ভব নয় তা এর মাঝেই এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বেদ-শ্রুতিকেই বেদান্ত দর্শনের সকল সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর সিদ্ধির একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির ব্যাপারে বেদানুসারী দার্শনিক সম্প্রদায়ও একমত নন, তাই অপৌরুষেয় বলেই বেদ স্বতঃপ্রামাণ্য একথা সর্ববাদীসম্মত

নয়। বেদের প্রামাণ্য ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধির অধীন, আবার বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত না হলে সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না। তাই এখানে অন্যোহন্যাশ্রয় [১৩৮] দোষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে বেদ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ অনাদি বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এ অনাদিত্ব-স্বীকৃতি বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার অক্ষমতারই প্রকাশ বলে গণ্য হয়।

যাই হোক শ্রুতি-বিহিত যে ঈশ্বর অদ্বৈত বেদান্তমতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিরুদ্ধে শ্রুতির স্বতঃ-প্রামাণ্য বিষয়ক আপত্তি ছাড়াও প্রথম ও প্রধান আপত্তি হচ্ছে এই ঈশ্বরের পারমার্থিক কোনো সত্তাই নেই। একথা অদ্বৈত বেদান্তের নিজেরই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়া বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে জগৎ ও ঈশ্বরের অবসান ঘটে। এই ঈশ্বর তাই পরম সত্তা নন। যতক্ষণ মায়া ততক্ষণই ব্যবহারিক জগৎ ও ঈশ্বর। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল মায়া দ্বারা আক্রান্ত হলে মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং এই প্রতিবিম্বকেই ভ্রমবশতঃ ঈশ্বর বলে গণ্য করা হয়। যখন ভ্রমবশতঃ মায়াশক্তি ব্রহ্মে আরোপিত হয় তখনই ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে গণ্য করা হয়। কাজেই মায়ানাশে ঈশ্বরেরও সত্তা থাকেনা। তাই শংকরের ব্রহ্ম-বিবর্তবাদ অনুসারে ঈশ্বর পরমার্থতঃ সত্য নন। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই অদ্বৈত বেদান্তের ঈশ্বরকে বেদানুসারী বহু দার্শনিক সম্প্রদায়ও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

শংকরের দর্শনের মায়াবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ নির্মম যুক্তিসহকারে ধারাহিকভাবে খণ্ডন করেছেন। শঙ্করের কথিত মায়া তথা অবিদ্যাকে রামানুজ **স্বরূপতঃ অসিদ্ধ** বলছেন কারণ শংকরের মতে মায়া সদসৎ বিলক্ষণা অনির্বচনীয়া অর্থাৎ তা সৎ নয়, অসৎও নয় একথা বলা যুক্তিহীন। শংকরাচার্য ব্রহ্মকে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যারূপী মায়ার আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছেন তাতে 'আশ্রয়ত্বানুপপত্তি' ঘটে বলে রামানুজ বলেছেন। মায়া জীবকে আশ্রয় করে থাকতে পারে না কারণ জীব অজ্ঞানেরই সৃষ্টি। আবার মায়া জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে না। তৃতীয়তঃ মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করলে 'তিরোধানানুপপত্তি' ঘটে কারণ ব্রহ্ম আবৃত

১৩৮। অন্যোহন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষঃ লক্ষণ-নির্ভর দু'টি বস্তুর একটি যখন অপরটির সিদ্ধির ওপর নির্ভর করে তখন সেখানে এই দোষ ঘটে।

হলে তার চিরপ্রকাশমানতা নষ্ট হয়। চতুর্থতঃ মায়া বা অবিদ্যা জ্ঞানের অভাবেরই দ্যোতক। এই অভাবকে জগৎসৃষ্টির কারণ বললে 'প্রমাণানুপপত্তি' ঘটে। পঞ্চমতঃ হল 'অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি' কারণ মায়াকে অনির্বচনীয়া বললে তার সত্তা স্বীকার্য হয় না। ষষ্ঠতঃ অনাদিভাবরূপ অবিদ্যার বিনাশ সম্ভব নয়। রামানুজের সপ্তম আপত্তি হ'ল, মায়া ভাব পদার্থ হলে তার বিনাশ অসম্ভব কারণ যা সত্তাবান তা সনাতন এবং তার বিনাশ নেই। তাই এই অসঙ্গতিকে তিনি 'অবিদ্যানিবৃত্ত্যনুপপত্তি' বলে অভিহিত করেছেন। এই হচ্ছে শংকরের মায়াবাদ-এর বিরুদ্ধে **শ্রীভাষ্য-রচয়িতা** রামানুজের উত্থাপিত সুপরিচিত **'সপ্তধা অনুপপত্তি'**।

সন্দেহ নেই, অদ্বৈত বেদান্ত মতে রামানুজের এইসব যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে মায়াবাদ প্রতিষ্ঠার বহু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মায়াবাদ অবিসংবাদী একথা কোনোমতেই গ্রাহ্য নয়। আবার বিশিষ্টাদ্বৈতের রামানুজ-সম্মত ঈশ্বরও তাতে করে গ্রাহ্য হয়ে যান না। কিন্তু মায়ানাশে ঈশ্বরের সত্তা থাকে না শঙ্করের এ অভিমতের উত্তরে প্রশ্ন জাগে, মায়াতে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হয়েই ভ্রমবশতঃ ঈশ্বর রূপে গণ্য হন; কিন্তু প্রশ্ন হল—ভ্রমটি কার? ব্রহ্মের না প্রতিবিম্বের, না জীবের? তার গ্রহণযোগ্য সুস্পষ্ট উত্তর বেদান্ত দর্শনে মেলে না। তাই অদ্বৈত-বেদান্তের ঈশ্বরকে পারমার্থিক দৃষ্টি থেকে যেমন, তেমনি যুক্তি-গ্রাহ্যতার দিক থেকেও গ্রহণ করা যায় না।

উপসংহার

ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-সাধক ও ঈশ্বর-বাধক মূল যুক্তি ও বক্তব্য সমূহ আমরা নিবন্ধে যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে উপস্থাপনা ও আলোচনা করেছি। আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিসর এমন সুবিস্তীর্ণ, সমস্ত বক্তব্য ও যুক্তি যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চয়ই বিচারের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বিষয়বস্তুর অধ্যয়ন ও অনুধাবনে সততার সঙ্গেই অগ্রসর হয়েছি এবং উপসংহার-মূলক এই বক্তব্য প্রসঙ্গে আমাদের নিজেদের অবস্থান ও বিচার-ধারাকে যথাসাধ্য সুস্পষ্টভাবে এখন উপস্থিত করা প্রয়োজন মনে করি।

অত্যন্ত প্রাথমিক আলোচনা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদী অবস্থান একটি বিশাল ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র বিঘোষিত নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে নয়, তথাকথিত আস্তিক ও বেদানুসারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ বিচার-ধারার মাধ্যমে নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তা রীতিমত বিস্ময় জাগায়। চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায়ের অবস্থান নিয়ে নিবন্ধের 'অবতরনিকাংশে' আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রাচীন ভারতে ভৌতবিজ্ঞানের অত্যন্ত পশ্চাৎপদ বিকাশের যুগের সেই প্রায়ান্ধকারে ভূতচৈতন্যবাদী, বস্তুবাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক অবস্থান তার সমস্ত সবলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের বিস্ময়াপ্লুত করে এবং এ বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদী ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই ভারতের আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকশিত করে তুলতে হবে। তারই সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিক সম্প্রদায়ের ক্ষুরধার যুক্তি-বিচারের মাধ্যমে, তাঁদের নিজেদের মতো করে, নিরীশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার বিপুল প্রয়াস। অবস্থানগত নানাবিধ ঐক্য থাকলেও জৈন বিচারধারাকে নিছক যুক্তিবিচারেই বেশী মনোযোগী মনে হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিক অবস্থানের ও যুক্তিবিচারের বিশালতা ও অনন্য-সাধারণ বলিষ্ঠতাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না। একদিকে সমাজ-মানসে বিপুল প্রভাব এবং অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনে স্বনামধন্য ও সুখ্যাত মননশীল বহু চিন্তানায়কদের বিস্ময়াভিভূত করার

মতো প্রতিভা-কিরণে উদ্ভাসিত এই চিন্তাধারাকে সশ্রদ্ধ-চিত্তে বিচার না করে পারা যায় না।

তারপর আমরা দেখেছি সাংখ্য দর্শনের প্রত্যয়সিদ্ধ ও বিঘোষিত নিরীশ্বরবাদ। দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা হিসাবে এই দর্শনের বিশিষ্ট অবস্থানকে যথোচিত গুরুত্ব না দিলে ভারতীয় মননশীলতার একটি অতুলনীয় অবদানকেই অবহেলা করা হবে [illegible] মনে হয়েছে। ত্রিগুণাত্মক বস্তুবিশ্বের বিশ্লেষণ প্রায় সচেতনভাবেই আধুনিক দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্লেষণ তথা ডায়লেকটিকস-এর অনুধাবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'দ্বৈতবাদী' অবস্থানের জন্য দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে সাংখ্যের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই রয়েছে এবং এই দুর্বলতার জন্য অদ্বৈত অবস্থান থেকে শংকরাচার্য সাংখ্যের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যে অভিযান চালিয়েছিলেন তার কথা সহজেই মনে পড়বে।[১৩৯] কিন্তু মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শনের নিরীশ্বরবাদের মধ্যে যে প্রবল প্রত্যয় ও অসমসাহসিক অবস্থান তাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না। অনুরূপভাবেই বলা চলে মীমাংসা দর্শনের নিরীশ্বরবাদ ও সর্বজ্ঞখণ্ডনের কথা। একদিকে বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি তাঁদের অচলা আস্থা অথচ অন্যদিকে এই অবিচল নিরবীশ্বরবাদ রীতিমতো বিস্মিত করে দেয় আমাদেরকে।

বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর 'সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে' সাংখ্য-দর্শনকে ঈশ্বরবাদী বলে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করেন নি ; কিন্তু মুখ্যতঃ অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়ে অনুসৃত এই প্রয়াস কতখানি কপিল-নির্দেশিত ও সাংখ্য-সম্মত তা বলা শক্ত। মহর্ষি কপিলের অবস্থান ও 'সাংখ্যকারিকার' অবস্থানই যে যথার্থ সাংখ্যপ্রস্থান এতে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। কণাদের বৈশেষিক সূত্রে ও গৌতমের ন্যায়সূত্রে ঈশ্বর-স্বীকৃতির পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো উল্লেখই নেই বা ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধবাদী যুক্তিসমূহের খণ্ডনের কোনো আয়োজন নেই বললেই চলে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মূলতঃ ঈশ্বরবাদী নয় এ কথাকে তাই অতি সহজে

১৩৯। বিশিষ্ট দার্শনিক-পণ্ডিত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনেব নানা শাখায় অগাধ বিদ্যাবত্তাব জন্য সুখ্যাত ডঃ শ্রীহরেন্দ্র কুমাব দে চৌধুবী মহোদয়েব 'বেদান্ত-বিজ্ঞান' গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। তাই সবচেয়ে বেশী বিমূঢ় হতে হয় ন্যায় বৈশেষিক সূত্রের প্রাথমিক অবস্থান এবং পরবর্তী পরিণতির কথা ভাবলে। মৌলিক অবস্থানে ঈশ্বর সম্পর্কে বিচারে যে দার্শনিক ঋজুতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে পরবর্তী ন্যায়াচার্য ও বৈশেষিক দার্শনিকদের ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় বহুলাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হতে দেখি। স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বর-সিদ্ধিসূচক পূর্বপক্ষ হিসাবে ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিক অবস্থানের যথোচিত বিচারের জন্য আমারা নিবন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। উদয়নাচার্যের 'কুসুমাঞ্জলি'-তে আমরা ঈশ্বর-সিদ্ধির যে বিশাল আয়োজন দেখতে পাই তাকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়েই আমরা উপস্থাপিত করেছি। উদয়নের বিচারধারা ও অবস্থানের প্রতি আমাদের প্রতিকূল মনোভাব আমরা গোপন রাখিনি এবং পূর্বতন ন্যায়াচার্যদের অবস্থানের 'পুনরুক্তির দূষণীয়' কাজটির যে কঠোর সমালোচনা মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন করেছেন তার প্রতিই যে আমাদের সম্মতি রয়েছে তা আমরা অকপটে স্বীকার করেছি। এই প্রসঙ্গেই উদয়ন-পরবর্তী নব্য-নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা যেভাবে বেশী বেশী করে ঈশ্বর-সিদ্ধির ব্যাপারে বাক্য-বিশ্লষণাত্মক আলোচনার আশ্রয় নিয়েছেন তার কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। নব্য-নৈয়ায়িক আচার্যগণ তত্ত্বগত আলোচনাকে যেভাবে সূক্ষ্ম ভাষাগত বিচার-বিশ্লেযণে পরিণত করেছেন তা নিরীশ্বরবাদের নিরাকরণ করতে পেরেছে এবং তাতে করে ঈশ্বর-সিদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে একথা যে আমাদের মনে হয়নি তাও আমরা বলেছি।

বেদান্ত-দর্শনের, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তের, ঈশ্বর যে পরমার্থতঃ সত্য নন তাও আমরা সযত্নে আলোচনা করেছি। এক কথায়, ভারতীয় দর্শনের পরিচিত পরিসরের মধ্য থেকে নিরীশ্বরবাদী অবস্থানকে আমরা চিহ্নিত করে তুলতে চেয়েছি। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ এক বিপুল মর্যাদা, স্বকীয় অবস্থান ও বিশাল ঐতিহ্যই রচনা করেছে। বিচিত্র দার্শনিক ও সম্প্রদায়গত অবস্থান সত্ত্বেও এই সত্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু যে প্রশ্নটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা হচ্ছে এই বিপুলতা সত্ত্বেও নিরীশ্বরবাদ ভারতে যথোচিত সামাজিক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে তেমন করে সমর্থ হল না কেন। আমরা দেখেছি নিরীশ্বরবাদী যুক্তি ও অবস্থান এমন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে 'নাস্তিক' ও 'আস্তিক' শব্দ দু'টি তার প্রাথমিক

ঈশ্বর-অস্বীকৃতি বা স্বীকৃতি-সূচক গৃহীত ও স্বীকৃত অর্থবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতীয় দর্শনে বেদ-বিরোধিতা ও বেদানুসারিতায় পর্যবসিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এই 'অর্থ'-পরিবর্তন ছাড়া ঈশ্বরবাদী অবস্থান সমূহের পক্ষে নিজেদের সুচিহ্নিত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। কিন্তু নিরীশ্বরবাদের প্রবল শক্তিমত্তা সত্ত্বেও কার্যতঃ ঘটল উল্টোটা। নিজেদের সম্প্রদায়গত বিভেদ জৈন ও বৌদ্ধদের দুর্বল করে তুলল, সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরবাদের আশ্রয়ে স্বস্তির জন্য আকুল হল বিজ্ঞানভিক্ষুর 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যের' মধ্যদিয়ে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অবস্থান পুরোপুরি ঈশ্বরবাদে পরিণত হল। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় 'পরমাণুবাদের' স্বীকৃতির জন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে যথার্থ বৈদিকদর্শন বলা চলে কিনা সেই প্রশ্নও উঠেছিল। আর যে ''পরমাণুবাদ'' ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের স্বীকৃত প্রস্থান, সেই পরমাণুবাদকে বেদ-সম্মত বলে স্বীকার করে নেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিল। অথচ শঙ্করাচার্য অকপটেই পরমাণুবাদকে চিহ্নিত করেছেন 'অবৈদিক' বলে।[১৪০] এভাবে ঈশ্বরবাদকে মেনে নেওয়ার একটি প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হল এবং কালক্রমে সুচিহ্নিত নিরীশ্বরবাদী অবস্থানকেও ঈশ্বর-সাধক বলে উপস্থাপনের একটি প্রয়াস দেখা দিল।[১৪১]

এখানেই হচ্ছে আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা। একমাত্র চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই ক্রমে ক্রমে নানাভাবে আচার-অনুষ্ঠানের নিগড়ে বাধা পড়ে ধীরে ধীরে নিজেদের সুচিহ্নিত দার্শনিক অবস্থান থেকে সরে যেতে শুরু করে। এমন কি চার্বাক দর্শনের সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেও একটি আচার-প্রধান অধ্যাত্মবাদী ঝোঁক দেখা দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে – এটা কেন হল? উত্তরে বলতে হয় এটা না হয়ে বুঝি উপায়ও ছিল না।

১৪০। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় 'পরমাণুবাদ'কে শ্রুতি-মূলক বলে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। তাঁর **'ন্যায় পরিচয়'**-এর পরমাণুবাদ সম্পর্কিত আলোচনাংশ দ্রষ্টব্য।

১৪১। 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি'-কার উদয়নাচার্য কার্যতঃ ভারতীয় দর্শনের সমস্ত দার্শনিক অবস্থান ও সম্প্রদায়কেই শেষবিচারে 'ঈশ্বরবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন! (**'কুসুমাঞ্জলি'**–১/২ দ্রষ্টব্য।)

আসলে, সুপ্রাচীন সমাজেব পশ্চাৎপদ জীবনে জীবন-সংগ্রামের জটিলতায় বস্তু-বিশ্বকে যথাযথভাবে অনুধাবনের ও গ্রহণের যে প্রাথমিক বলিষ্ঠতা দেখা দিয়েছিল ক্রম-প্রসারিত জন জীবনের সমস্যায় ও সংকটে বিব্রত জনসাধারণকে তা দৈবশক্তির ভাবনায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্ররোচিত করে তুলেছিল। শ্রেণীবিন্যাসের সেই আদিম পটভূমিতেও সুবিধাভোগী সামাজিক স্তরগুলো এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছে, লালন করেছে। তারই ফলে 'পশ্চাদপসরণ' ঘটেছে অনেকটা অনিবার্যভাবেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরশ্রমভোগী সম্পত্তিবান অংশের স্থিত-স্বার্থের ঐহিক প্রয়োজনে 'পরলোক ও অধ্যাত্মবাদের পরম আশ্রয় হিসেবে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান' আধুনিক সমাজতত্ত্বের কাছে আদৌ অপরিচিত মনে হবে না। তা না হলে আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে বিব্রত আপামর সাধারণ মানুষ দার্শনিক মননশীলতার থেকে বহু দূরে নির্বাসিত থেকে যে শূদ্রোচিত জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা কেন এমন প্রবল আগ্রহে বৌদ্ধ অবস্থানকে গ্রহণ করেছিলেন সে কথার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হয় না। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে ঈশ্বরানুভূতি সৃষ্টি হয় সাধারণ মানুষের কাছে নিশ্চয়ই তা অনায়াস-লভ্য হতে পারে না। ঠিক একই কারণে চার্বাক দর্শনের সমস্ত সম্ভাব্য 'জনপ্রিয়তা' সত্ত্বেও, ভূতচৈতন্যবাদী অবস্থানকে আমরা যতই 'লোকায়ত' বলে চিহ্নিত করিনা কেন তা কস্মিনকালেও ব্যাপক জনসমষ্টির অন্তরের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ এই বিচার-সিদ্ধ, যুক্তিগ্রাহ্য ভূতবৈজ্ঞানিক অবস্থান উপলব্ধির জন্য যে সাংস্কৃতিক মান প্রত্যাশিত তা সাধারণ মানুষের কাছে আদিম ও পশ্চাৎপদ ভারতীয় সমাজ-জীবনে নিশ্চয়ই আশা করা চলে না। উভয় ক্ষেত্রেই গোষ্ঠী-জীবনের অভ্যাসের ও অনুকরণের একটা বড় ভূমিকা থেকেই যায়। আমাদের নিবন্ধের সমস্ত দার্শনিক যুক্তি সমূহকে নানা দিক থেকে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত অনেকটা অনিবার্যই হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক কালে আদিম সমাজের ভাবসংঘাতের ক্রমবিকাশের আলোচনায় জর্জ টমসন-এর নাম সহজেই মনে পড়ে। তাঁর একটি উক্তি এখানে স্মরণ করছিঃ ''প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আদিম মানুষের দুর্বলতা যেমন রূপ নিয়েছে ইন্দ্রজালের, ঠিক তেমনি সমাজের অগ্রগতির সামনে সভ্যমানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ধর্ম

বিশ্বাসে।"[১৪২] সরল আদিম আত্মবিশ্বাস বাস্তব জীবনযাত্রার পথে সঞ্চিত ব্যর্থতার ভারে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে নানাভাবে ধর্ম, দৈব ও ঈশ্বরের মধ্যে স্বস্তি খুঁজেছে। আর যখন একবার অত্মবিশ্বাস শিথিল হয়েছে তারপরই শুরু হয়েছে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের সপক্ষে যুক্তিজাল রচনার। নিজেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত অথচ অতীন্দ্রিয়, অশরীরী আত্মার মতো যে সব ভাবনা তাঁদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তারই সপক্ষে যুক্তিজাল রচনায় আদিম দার্শনিকদের অগ্রসর হতে হয়েছে।[১৪৩] ফলে আদিম সমাজের প্রাথমিক প্রত্যয়ী বস্তুবাদকে ভাববাদের নিরাপদ আশ্রয়ে স্বস্তির জন্য যুক্তি খুঁজতে হয়েছে। স্বভাবতঃই কালক্রমে 'গতর খাটাবার' দায় যাদের কম বা আদৌ নেই এমন একটি সামাজিক স্তরকে 'মাথা খাটাবার' জন্য নিশ্চিত অবসর এনে দিতে হয়েছে। সমাজ বিকাশের ধারা অনুসরণ করে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের এই পার্থক্যকে উপলব্ধি করা তাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের নিবন্ধে এই যুক্তি-বিচারের ধারা অনুসরণ করেই আনুপূর্বিক আলোচনা করে আমাদের প্রস্থান হিসাবে আমরা এই দৃষ্টভঙ্গী গ্রহণ করেছি। নিরীশ্বরবাদী বা ঈশ্বরবাদী যে অবস্থানই হোক না কেন শুধু শুধু যুক্তি-তর্ক দিয়ে এ ব্যাপারে মীমাংসা কার্যতঃ অসম্ভব। কেননা প্রশ্নটা মূলতঃ সামাজিক অবস্থানগত এবং যুক্তিবিচারের তীক্ষ্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে তার পারিপার্শ্বিকতা অর্থাৎ যুগ-পরিবেশ থেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কোনোমতেই চলে না। তাছাড়া যুক্তির 'অকাট্যতা'ও তার যুগের সাময়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বস্তু বিশ্বের জ্ঞান-নিরপেক্ষ অবরোহাত্মক যুক্তিবিচারে 'নিশ্চয়তার' একটা আভাস মিলে মাত্র, তার বেশী নয়; কারণ সামান্য ধারণার জন্য 'আরোহাত্মক' একটা ঝুঁকির প্রশ্ন তো থেকেই যায়। কার্যকারণতত্ত্ব বা প্রকৃতির একরূপতার নীতিকে ভিত্তি না করলে আরোহানুমান সাধারণ সত্যের কোনো সূত্রের নাগালই পায় না। 'নিশ্চয়তা' তাই শেষ পর্যন্ত অ-লভ্যই থেকে যাবে। 'আবশ্যিকতা' ও 'প্রায়িকতার' এই সমস্যা সর্বাধুনিক তর্কবিজ্ঞানীকেও

১৪২। ধর্ম ও সমাজ : জর্জ টমসন; পৃঃ ১১; ন্যাশনেল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-১২; চতুর্থ মুদ্রণ, জুন-১৯১৪।

১৪৩। "... men have constantly made up for themselves false conceptions about themselves, about what they are and what they ought to be...The phantoms of their brains have gained the mastery over them. They, the creators, have bowed down before their creatures." (Karl Marx: German Ideology: Preface; P. 1).

তাই বিব্রত করছে। স্বভাবতঃই ভারতীয় দর্শনে যুক্তি-বিচারের পর্যালোচনা কালেও এই সমস্যাকে ভুলে থাকলে চলে না। একটা কিছু ধারণাকে হাজির করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না; তার জন্য অবশ্যই চাই 'ধারণা'কে সুপ্রতিষ্ঠ করা। এই 'নিছক ধারণা' (Conjecture) আর 'ধারণাকে প্রতিষ্ঠার' (Confirmation) দ্বন্দ্ব আধুনিক তর্কবিজ্ঞানীদের নিশিদিশি যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে। ভাষাগত বিশ্লেষণেও অজস্র বাধা প্রতিপদে সত্য প্রতিষ্ঠাকে দুরধিগম্য করে রাখছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নিরলস প্রয়াসের ফসল হিসাবে সাম্প্রতিককালে ঈশ্বরসিদ্ধি ও ঈশ্বর-খণ্ডনাত্মক আলোচনা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নূতনভাবে শুরু হয়েছে। নিবন্ধের 'অবতরণিকায়' আমরা বলেছি সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রণিধানযোগ্য। এটা নিছক পশ্চাৎমুখী অতীত-চারণ নিশ্চয়ই নয়!

কেন না, সেই আদিম কালের গোষ্ঠি জীবনের অভ্যন্তরীণ একান্ত-সাম্যের যুগের সমাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেণী ও স্বার্থে বিবদমান বিভক্তির পরিবেশ যেখানে আমরা রয়েছি তার মাঝে একটি অন্তর্নিহিত মিল রয়েছে মূলগত দিক থেকে। পরিবর্তন যতখানি চোখ ঝলসায় আসলে তা ততখানি মূলগত নয়। সমস্যা তাই অনেক গভীরে। মানব-প্রকৃতি (human essence) ও সামাজিক-ভাবাদর্শ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা সমাজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, সমাজের ভিত্তি ও উপরিসৌধের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনায় আর উপেক্ষণীয় মনে হয় না। কিন্তু মানব-সত্তা বা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি কোনো বিশুদ্ধ 'সত্তা' মাত্র নয়; ''মানব সত্তা প্রতিটি একক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নির্বিশেষ সার মাত্র নয়; বস্তুতঃ তা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কেরই একত্রীভূত সামূহিক রূপ।''[১৪৪] আমাদেরকেও তাই নিবন্ধের ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাধক ও সাধক যুক্তিগুলোকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও যুগের পটভূমিতেই বিচার করে দেখতে হবে। বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখলে নৈয়ায়িক বিচারের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম যুক্তির বিন্যাসে শুধু চমৎকৃত হওয়াই সার হবে; যুক্তি ও বাস্তবকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে এই পরিণতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্ব ও বাস্তবের, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে ঐক্য না থাকলে উভয়তঃ একদেশদর্শী চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

১৪৪। Karl Marx: as quoted by George Thomson in his "Human Essence" in the title page as a motto.

আমরা বলেছি, ভক্তিতে যাকে মানি যুক্তিতে তিনি সিদ্ধ নন এই বোধ বড় যন্ত্রণা দেয়, দগ্ধ করে। ভক্তি ও বিশ্বাসকেও তাই বারে বারে যুক্তির পথ গ্রহণ করতে হয়। তারই পরিণতি হিসাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাধক যুক্তিজালের অবতারণা নানা ভাবে করা হয়েছে। মানুষের চিন্তাজগতে মনন ও বিচারশীলতার উদ্ভবের সময় থেকে ভারতে ভাববাদী বিভিন্ন দার্শনিক অবস্থানের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের পক্ষ থেকেও ঈশ্বরকে বস্তুবাদের আক্রমণের জবাবে যুক্তি-প্রমাণসিদ্ধ হিসাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চলে এসেছে এবং বিভিন্ন নিরীশ্বরবাদী বস্তুবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে নানাভাবে যুক্তিজাল বিস্তার করতে হয়েছে। মধ্যযুগ থেকে এবং স্পষ্টতঃ সেণ্ট টমাস আকুইনাস-এর সময় থেকেই পাশ্চাত্যের মননের জগতের এই প্রয়াস চলে এসেছে। তার পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে তা আমাদের অজানা নয়। ঈশ্বর-সাধক সমস্ত যুক্তিবিচার শেষপর্যন্ত ''বিশ্বাসের সপক্ষে উত্থাপিত'', যুক্তিবিচারের পরিশীলিত মানদণ্ডে গ্রহণের-অযোগ্য, ''কিছু উক্তি মাত্র'' বলে চিহ্নিত হয়েছে।[১৪৫] ভারতীয় দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সিদ্ধিসূচক অনুরূপ যুক্তিসমূহ সেই অভিযোগ থেকে রক্ষা পায় না। তবে ভারতীয় দর্শনের বিচার ধারার একটি বলিষ্ঠতার দিক সহজেই নজরে পড়ে। পূর্বপক্ষ খণ্ডনের সূত্রে নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের আলোচনা, প্রত্যাশিত অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও একটি বিচারশীলতার মনোভাবকেই সমৃদ্ধ করেছে। তারই জন্য মানবীয় বিচার ধারার আত্মকল্পতা (anthropomorphism) সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণ একদেশদর্শী হয়ে পড়েনি। কিন্তু তা অন্য প্রসঙ্গ ; কোনো মানুষের পক্ষেই মানবীয় সীমাবদ্ধতাকে পুরোপুরি অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। যে কোনো চিন্তাশীল ও ভাবুক মানুষের চিত্রকল্পতায় যে মনুষ্যোচিত আত্মকল্পতার (anthropomorphism-এর) ছায়া থাকে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদ জেনোফেনিস (Xenophanes) এর কথাগুলো নিশ্চয়ই মনে পড়বে ঃ

১৪৫। **Hermann Lotze : Outlines of A Philosophy of Religion; P. 9; Indian Edition, Cal 12; 1954.**

"Mortals deem that gods are begotten as they are, and have clothes as theirs, and voice and form... yes, and if oxen and horses or lions had hands and could paint with their hands, and produce works of art as men do, horses would paint forms of gods like horses, and oxen like oxen, and make their bodies in the image of their several kinds."[১৪৬] অর্থাৎ দেবদেবী ও ঈশ্বরানুকৃতি মানুষের আত্মপ্রতিচ্ছবিরই প্রলম্বিত, মহিমামণ্ডিত ও আরোপিত রূপ। মানুষ আর ঈশ্বর কে যে কার অনুকৃতিতে গড়া সেটা একটা মৌল অবস্থানগত প্রশ্নই হয়ে দাঁড়ায়। তাই নিছক মানবীয় আত্মকল্পতা ও আত্মানুকৃতি কোনো যুক্তির পক্ষেই চরম দোষ বলে গণ্য হয় না। প্রশ্নটা হচ্ছে যুগগত পরিমণ্ডলে পরিপূর্ণ বিচারের, ত্রুটি দেখা দেয় মুখ্যতঃ সেখানেই।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা ভারতের বিভিন্ন নিরীশ্বরবাদী যুক্তিসমূহের মূল্যায়ন করতে চেয়েছি। অন্যান্য সকল পারিপার্শ্বিক ও যুগগত সীমাবদ্ধতার বিচার এই প্রসঙ্গে আমরা আভাসে ইঙ্গিতে অবশ্যই করেছি। সকল সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই আমরা আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা, বৌদ্ধ, জৈন এমনকি চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অংশতঃ পরবর্তীকালে নানাভাবে ভাববাদী ও ঈশ্বর-স্বীকৃতি সূচক যে সব প্রবণতা ও ঝোঁক দেখা দেয় তা তৎকালীন সমাজ-বিন্যাসে প্রবল বেদ ও ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের প্রভাবজ বলেই মনে হয়। একদিকে প্রবল সামাজিক চাপ, অন্যদিকে সামজিক স্বীকৃতি ও কৌলীন্যলাভের বাসনা তার পেছনে সক্রিয় ছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের মধ্যেও নানা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ ও কলহ এই পরিণতির জন্য বহুলাংশে দায়ী বলেই মনে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধ দার্শনিকদের অবস্থানের কথাও এখানে মনে পড়ে। বৌদ্ধদের নিজেদের সম্প্রদায়গত ভেদ-বিভেদ এবং দার্শনিক অবস্থানের নানা মূলগত বিভিন্নতা ও সীমাবদ্ধতা বৌদ্ধ অবস্থানকে শেষপর্যন্ত দুর্বল করে ফেলে। চরম বিজ্ঞানবাদ বৌদ্ধ অবস্থানকে সাধারণের কাছে একান্ত দুরধিগম্য করে

১৪৬। **Bertrand Russell : A History of Western Philosophy, George Allen** Unwin Ltd, London, 1946. P. 59; also, **Burnet: Greek Philosophy, Macmillan;** London 1950, P. 35.

তোলে। ভারতে চরম ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য একদিকে বৌদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে প্রভাবিত ও দুর্বল করে দেয় এবং এই পটভূমিতে বৌদ্ধ দার্শনিক অবস্থানকেও পিছু হটতে হয়, যদিও ব্রাহ্মণ্য চণ্ড-অভিযানের ভূমিকাকেও এক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলে না।

কিন্তু আমাদের আলোচনার এই প্রতিকূল পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিবেশের কথা ছাড়াও আমরা মূলগত কয়টি দার্শনিক অবস্থান-মূলক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। চার্বাক ভূতচৈতন্যবাদী অবস্থানকে যথোচিত স্বীকৃতি ও মূল্য দিয়েও আমরা বলেছি চার্বাক দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী একদিকে তৎকালীন ভূতবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় যেমন সংকুচিত ছিল, তেমনি **বস্তু-বিশ্বের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তাঁদের ধারণাটি ছিল একান্ত অস্বচ্ছ এবং নানাভাবে যান্ত্রিকতায় আড়ষ্ট।** পৃথিবীর যে কোনো সুপ্রাচীন দার্শনিক বস্তুবাদী আবস্থানের মতোই এই ত্রুটিকে অতিক্রম করা ছিল তাদের পক্ষে অসাধ্য। তবু আমরা বলেছি ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের পথিকৃৎ হিসাবে অগ্রপথিকের সম্মান তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য। অনুরূপভাবেই সাংখ্য ও বৌদ্ধ অবস্থানের সবলতা ও দুর্বলতা সমূহের প্রতিও নিবন্ধের 'অবতরণিকা' থেকে শুরু করে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রেই আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সাংখ্য দর্শনের দ্বন্দ্বাত্মক উপলব্ধি ত্রিগুণাত্মক বিশ্ববস্তুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি একান্ত প্রণিধানযোগ্য দার্শনিক অবস্থান হিসাবে স্বীকৃতির দাবী রাখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলার চেষ্টা করেছি যে জগৎসংসারের ক্রমাভিব্যক্তির ও গতির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদানে তা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা সাংখ্যদর্শন নূতনের উদ্ভবের ও স্বকীয়তার কোনো সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। অন্যদিকে বৌদ্ধ অবস্থান তার অতুলনীয় গতিময়তার উপলব্ধি থেকে প্রবহমান জগৎ-বিশ্বের ব্যাখ্যার যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছে তা বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অবস্থানেরই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দাবী করে। কিন্তু গতির অন্বেষণে এই তন্ময়তা ক্ষণপ্রবাহকে স্বীকৃতি দান করেও 'ক্ষণ'-কে কার্যতঃ অস্বীকারই করেছে এবং এই ক্ষণধারা একটি 'নিরন্বয় সমষ্টিমাত্র' হয়ে উঠেছে। আসলে বৌদ্ধ অবস্থান শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ও গতির একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে এবং তা অমূর্ত শূন্যবাদে ও নিরন্বয় ক্ষণবাদেই পর্যবসিত হয়েছে। **মূলতঃ এসব সীমাবদ্ধতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গভীরভাবে উপলব্ধি না করলে ভারতীয়**

দর্শনের নিরীশ্বরবাদের যুক্তিসমূহের যথার্থ দার্শনিক বিচার ও মূল্যায়ন সম্ভব হয় না ; এমন বিপুলতা ও প্রবল নৈয়ায়িক নিশ্চয়তা সত্ত্বেও নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের পক্ষে যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভ কেন শেষপর্যন্ত সম্ভব হল না তাও বোঝা যাবে না। সন্দেহ নেই, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাচীন সমাজের বিকাশের আরো তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু তা' অর্জিত হতে পারে।

কিন্তু সামগ্রিক বিচারে '**শ্রুতি ও শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ দার্শনিক যুক্তিবিচারের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়**'-সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদী এই অভিমতের বিপুল প্রসার ও নৈয়ায়িক নিশ্চয়তা ভারতীয় দর্শনের একটি শ্রেষ্ঠ ও জীবন্ত ঐতিহ্যেরই সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। বস্তু ও চৈতন্যের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে, বস্তু ও চৈতন্যের মধ্যে কোনটি মুখ্য তার নিঃসংশয় নিরূপণের ক্ষেত্রে, গতি ও পরিণামের দ্বন্দ্বমূলক উপলব্ধির ক্ষেত্রে যুগগত ও কালগত এবং পারিপার্শ্বিক যে সব সীমাবদ্ধতা ছিল তা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী ভাবনার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনের নিরীশ্বরবাদী যুক্তিবিচারের বলিষ্ঠতা ও প্রাগ্রসর বিচার-মনস্কতার বিরাট অবদান অনস্বীকার্য।

ভারতীয় দর্শনের মূল্যায়নের নানা ক্ষেত্রে যে কোনো অগ্রসর ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে যে প্রবাদ-কল্প চিরায়ত উক্তিটি চিরকাল মননশীল মানুষকে নিত্যনূতন প্রেরণা দিয়ে যাবে তা স্মরণ করে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করছিঃ

'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্'॥

প্রাচীন হলেই বরণীয় হবে আর নূতন বলেই তা দূষণীয় হবে, এমন কোনো কথা নেই।